ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের

রচনা-সংগ্রহ

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর ১৯৫৭

প্রকাশক :
সমীরণ চৌধুরী
কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
১৩, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
আনন্দ প্রিণ্টার্স
৩/১ সি, মোহন বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

উৎসর্গ

শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রসূন বসু
শ্রীসুপ্রিয় সরকার
শ্রীসমীরণ চৌধুরী

সাহিত্যরসিকেষু
বা. ব. ঘো.

সূচীপত্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

একজন স্বদেশপ্রেমী মনীষী ও ভারত সংস্কৃতির অন্যতম ধারক, একজন চিন্তাশীল জাতীয় শিক্ষক, একজন নির্ভরযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, একজন সংগ্রামশীল ধর্মনেতা এবং একজন রসিক-মননশীল সাহিত্যিককে যদি বাঙালী জীবন থেকে বেছে নিতে বলা হয়, নির্দ্বিধায় আমি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম উচ্চারণ করবো। এমন একটি সমন্বয়ী ব্যক্তিত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে খুব কমই আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর কোনো উত্তরাধিকার আমাদের মধ্যে বর্তমান নেই। প্রবল ব্যক্তিত্বের এটাই একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য—তাঁদের সমতুল ব্যক্তিত্বের উত্তরাধিকার তাঁরা রেখে যেতে পারেন না। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটে। আমাদের দেশে মতিলাল নেহরু এবং বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত এই ব্যতিক্রমের তালিকাভুক্ত।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর পিতৃদত্ত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও, ব্রহ্মবান্ধব নামেই তিনি সুপরিচিত। ভবানীচরণের প্রপিতামহ 'কুলীন' মদনমোহন তাঁর শেষতম তথা পঞ্চাশতম বিবাহটি করেন হুগলী জেলার খন্যান গ্রামের (এখন এখানে একটি রেল স্টেশন হয়েছে) অনতিদূরবর্তী গ্রাম হোয়েড়ায়। পরে তাঁর পিতামহ হরচন্দ্র খন্যান গ্রামে বাড়িঘর করেন। দেবীচরণ, কালীচরণ ও তারিণীচরণ—তাঁর এই তিন পুত্রের মধ্যে ভবানীচরণ ছিলেন দেবীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর অগ্রজেরা ছিলেন হরিচরণ ও পার্বতীচরণ। খুল্লতাত কালীচরণ প্রথম জীবনে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও পরে জাতীয়তাবাদী নেতা হন।

জন্মের এক বছরের মধ্যে মাকে হারিয়ে পিতামহী চন্দ্রমণির কাছে লালিত ভবানীচরণের শৈশব এবং উত্তর জীবন তাঁরই প্রত্যক্ষ

প্রভাবে গ'ড়ে ওঠে। তাঁর সাহিত্য জীবনে চন্দ্রমণির প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়।

গ্রামের গুরুমহাশয়, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, জেনারেল অ্যাসেমব্লী ইনস্টিটিউশন এবং পুনশ্চ হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষিত ভবানী-চরণের মেধা শুধুমাত্র পুথিপত্রেই আবদ্ধ ছিল না। সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাষ্টিক, কুস্তি তাঁর দৈহিক গঠনকে করে তুলেছিল মজবুত। অতএব ইচ্ছে হল তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য। সবে এনট্রান্স পাশ করে কলেজে ঢুকেছেন। লেকচার শুনে শুনে উন্মাদ—'লেকচার না শুনিলে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিত কিন্তু লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া যখন বাড়ি ফিরিতাম মনে হইত প্রাণটা যেন খালি খালি—ভরে নাই।' শেষে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন—'গোয়ালিয়রে গিয়া সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব।' অতএব একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য পুঁজি সম্বল করে গোয়ালিয়রে গিয়ে হাজির হলেন—উদ্দেশ্য 'ভারত উদ্ধার।'

খোঁজ করে অভিভাবকেরা ফিরিয়ে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিলেন মেট্রোপলিটন (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজে। মন বসে না পড়াশুনোয়। তবুও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের অনুপ্রেরণায় প্রতিজ্ঞা করলেন—'বিবাহ করিব না, বি. এ., এম. এ, পাশ করিব না—প্রাণপণ ভারত উদ্ধার করিব।'

অতএব পুনশ্চ গোয়ালিয়রে। বয়স উনিশ ছুঁই ছুঁই। কাজের কাজ কিছু হল না। সাধুসঙ্গ মানসে কিছুকাল ভ্রমণ করে ফিরে এলেন পুনশ্চ স্বগ্রামে।

২

ফিরে এসে খন্যানের অদূরবর্তী মেমারি স্কুলে শিক্ষকতা নিলেন। কিন্তু একটা অস্থির প্রাণাগ্নি তাঁকে ক্রমাগত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে—জীবন থেকে জীবনান্তরে—কর্ম ও ধর্ম থেকে

কর্মান্তর ও ধর্মান্তরে। পুনশ্চ ভ্রমণ ও সাধু সঙ্গ করে কলকাতায় ফিরে এলেন এবং বছর খানেক সেখানে ফ্রী চার্চ ইন্‌ষ্টিটিউশনে শিক্ষকের কাজ নেন। এখানেই ছাত্র হিসেবে পান পরমপ্রিয় ও তাঁর উত্তর কালের কর্মসহায়ক কার্ত্তিকচন্দ্র নানকে।

আসলে ভবানীচরণ ছিলেন একজন জাত-শিক্ষক, একজন জাতীয় শিক্ষকও। কলকাতায় থাকতে থাকতেই তিনি ফরাসী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষাকে ভালভাবে শিখে নিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রবর্তিত বাইবেল ক্লাসে যোগ দেন। কৃষ্ণবিহারী সেনের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'ঈগল্‌স্ নেষ্ট'-এ তিনি পড়াতেন সংস্কৃত। এই সূত্রেই যুক্ত হন কনকর্ড ক্লাবে এবং তার মুখপত্র 'The Concord'-এর সম্পাদনা কর্মেও। এখানে শুধু সংস্কৃত পড়ানো নয়, শরীর চর্চারও তিনি ছিলেন শিক্ষক।

এরপরে ভবানী চরণের জীবনে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল এলেও শিক্ষকতার বৃত্তিকে তিনি বরাবরই পবিত্র ভেবে এসেছেন। তাই সিন্ধুদেশবাসী বন্ধু হীরানন্দের সঙ্গে সিন্ধু প্রবাসে গিয়ে সেখানেই 'ইউনিয়ন একাডেমী' স্কুলে সংস্কৃত পড়ানো ও খেলাধূলো শেখানোর ভার নেন। সেই বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর হায়দ্রাবাদেরই C.M.S স্কুলে শিক্ষকতা করেন কিছুকাল।

পরবর্তী শিক্ষাদানের জীবন তাঁর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বিশেষ। কারণ এই পর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন। কলকাতায় ফিরে সিমলা ষ্ট্রীটে যে 'আয়তন'-এর তিনি শিক্ষক হন সেখানেই আসতেন রবীন্দ্রনাথ এবং এখানে বসেই 'শান্তিনিকেতন আশ্রম আবাসিক বিদ্যালয়' স্থাপনের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার সুযোগ পান। ব্রহ্মবান্ধব আগেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন এবং সে বিষয়ে আপন লিখিত অভিমতাদি প্রকাশ করে রবীন্দ্রানুরাগ প্রকাশ করেছেন। তাই

যে মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ক সংকল্প জানলেন, সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। জাত-শিক্ষকের এটাই জীবন-ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তিনি (ব্রহ্মবান্ধব) আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কাজে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখন আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার ছিল উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ—তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ—বহন না করতেন তাহলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। ...তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। ...এই সঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।'

'বিদ্যায় বুদ্ধিতে, তেজে বীর্যে চরিত্রে' এবং ব্যক্তিত্বে ব্রহ্মবান্ধব ছোটদের মনকে একেবারে অভিভূত করে রাখতে পারতেন। একদা একবার এই গেরুয়াধারী প্রাণবন্ত দেহীর ব্যক্তিত্বের কাছে এক পাঞ্জাবী পালোয়ানের হার স্বীকারের কৌতুককর কাহিনী রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে সরসভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এই 'তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী' ব্যক্তিত্বের ধীশক্তিতে আকৃষ্ট রবীন্দ্রনাথ কতোদিন 'আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ' করতে করতে কত 'দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন' ঘটাতে দেখেছেন তা সবিস্ময়ে বিবৃত করে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি বেশিদিন থাকেন নি। এমন মানুষ কোথাও স্থিরভাবে থাকতেই পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অমর করে গেছেন তাঁর গোরা উপন্যাসের 'গোরা' চরিত্র এবং চার অধ্যায়ের বিপ্লবপন্থী ইন্দ্রনাথের কঠিন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে।

'চার-অধ্যায়ে'র দুঃখজনক বিতর্কে আমরা অনুপ্রবেশ করতে চাই না। (দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয় অংশ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড)। কিন্তু একথা ভুলি কেমন করে যে পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে আলমোড়ার উদ্বেগজনক দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গ। আলমোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন—'উপাধ্যায়-মশায় কি ফিরেছেন? একবার আলমোড়ায় যদি আসেন তাহলে তাঁর দিগ্বিজয় কাহিনী একটু শুনে নি'।

একথাই বা ভুলি কেমন করে, ব্রহ্মবান্ধব শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' অভিধাটুকুই সূত্রপাত করেননি, তিনিই রবীন্দ্রনাথকে, পরিচিত হবার আগেই প্রথম 'বিশ্বকবি' বিরুদে অভিহিত করেছিলেন। সাপ্তাহিক Sophia পত্রিকার ১ সেপ্টেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় 'The World-Poet of Bengal' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অনুপম মূল্যায়ন, বিশেষত 'স্রোত' কবিতা পাঠে তাঁর উপলব্ধির কথা নিবেদন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন বিশ্বকবি—'World Poet'. তাঁর সেই সশ্রদ্ধ নিবেদনই তো এখন রবীন্দ্রনাথের সাধারণ পরিচয়।

আমরা শিক্ষক ভবানীচরণের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের কিছু কথা নিবেদন করার সুযোগ করে নিলাম। ইতোমধ্যে ব্রহ্মবান্ধবের বিলাত-ভ্রমণ পর্ব সমাপন হয়েছে। ফিরে এসে নানা কাজের মধ্যে নিজের সারস্বত আয়তন-এর সমৃদ্ধির কাজে লাগলেও শেষ পর্যন্ত এটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারলেন না। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, নিজের অধ্যাত্ম-সংগ্রাম এবং দেশপ্রেমের চাহিদা তাঁকে কর্মান্তরে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল National Council of Education এবং National College. দুটির জন্যই ব্রহ্মবান্ধব প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কাছে যথার্থ

শিক্ষালয় ছিল না, ছিল 'গোলদীঘির গোলামখানা'। দাঁতে দাঁত চেপে বলতেন—'ঐ গোলামখানা চুরমার করে ফেল।' অতএব একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মারাঠী ভাষায় সুপণ্ডিত মানুষ স্বভাবতই এক স্বতন্ত্র মুক্ত শিক্ষার কথা চিন্তা করবেন। বিবেকানন্দের মত তিনিও জাতীয় শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করতেন।

৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ক্ষীণ হয়ে এলেও সমাজকে শিক্ষিত ও অবহিত করার ব্রতে তাঁর কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা দেয়নি। কংকর্ড ক্লাবের মুখপত্র-'ইয়ংম্যান' পত্রিকার রূপান্তর The Concord সাপ্তাহিক পত্রের পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা। মাঝে 'The Harmony (১৮৯০) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে আপন ধর্মবোধ ও কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মমতের যে প্রচার তিনি করছিলেন তার কিছু পরিবর্তন ঘটল সিন্ধু প্রবাস কালে 'Sindh Times' নামে একটি সংবাদপত্র পরিচালনার দ্বারা (১৮৯১)। কিন্তু এসব কোন পত্রিকাই যেন তাঁর মনের ক্ষুধা মেটাতে পারছিল না। মূলত ধর্মবিষয়ক পত্রিকা হলেও Sophia (১৮৯৪) পত্রিকা সম্পাদন-সূত্রে সামাজিক ও নৈতিক কিছু দায় পালনে তিনি সমর্থ হন। কিন্তু এখানেও খৃষ্ট ধর্ম প্রচার মুখ্য হয় এবং বিদেশীয় ক্যাথলিকদের প্ররোচনায় এই পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

'সোফিয়া' বন্ধ হ'ল কিন্তু ১৯০১ সালে প্রকাশিত হল বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের যুগ্ম সম্পাদনায় 'Twentieth Century' পত্রিকা। এতে লিখতে শুরু করেন মোহিতচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, উইনটারনিজ প্রমুখ কৃতবিদ্য লেখকেরা। আসলে এটি সোফিয়ারই উন্নত সংস্করণ ভেবে আবার ক্যাথলিকেরা বাধা দিলেন—পত্রিকা উঠে গেল।

আসলে এ-সব পত্রিকার জন্য ব্রহ্মবান্ধব স্মরণীয় হয়ে নেই। স্মরণীয় হয়ে আছেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজপত্র' প্রকাশের কারণে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে তিনি দৈনিক সন্ধ্যা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। জাতিকে আত্মস্থ করা, তাঁকে স্বদেশপথে পরিচালিত করা, পরানুকরণের পরিবর্তে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী করাই উদ্দেশ্য ছিল এই একপয়সা মূল্যের দৈনিকের। এটিই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যেটি সর্বসাধারণের মধ্যে; সহজবোধ্যরূপে রাষ্ট্রীয় চিন্তা প্রচারে ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে সমাজের সেই স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল সন্ধ্যা যার দ্বারা গণশক্তির জাগরণ ঘটে। তিন বছর ধরে সহজ এবং রসপূর্ণ ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে জাতির সঙ্গে একটা নতুন আত্মীয়তা গড়ে নিলেন ব্রহ্মবান্ধব। ফলে "দোকানের দোকানী-পশারী, জমিদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরু-শিষ্য, রাস্তার মুটে, গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুরনারী বালক-বালিকা, যুবকবৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিত। কখন 'সন্ধ্যা' আসিবে, আজ 'সন্ধ্যা'য় কি লিখিয়াছে, এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।' (প্রবোধচন্দ্র সিংহ, 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব') আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্রভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা।' সজনীকান্ত দাস ঠিকই বলেছেন, 'সন্ধ্যা' ছিল 'বাংলার নবজাগরণের প্রত্যূষ'। 'করালী' নামে সন্ধ্যার একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণের প্রকাশও করা হত এসময়ে যাঁরা নিয়মিত 'সন্ধ্যা' পড়ার সুযোগ পেতেন না, তাঁদের জন্য।

এখানে ব্রহ্মবান্ধব ১০ মার্চ ১৯০৭ তারিখ থেকে 'স্বরাজ নামে' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এর ভাষা ছিল উঁচু দরের—সন্ধ্যার ভাষার মতো সহজবোধ্য ছিল না (দ্রষ্টব্য, গ্রন্থমধ্যে 'স্বরাজে'র অনুষ্ঠান-পত্র)। এটি ছিল বিদগ্ধ মানুষের পাঠ্য। শিরোদেশে ছত্রপতি শিবাজীর আবক্ষচিত্র নিয়ে এই পত্রিকা আবির্ভূত হত। এটিই কি প্রথম চিত্রশোভিত স্বাধীনতা-পত্রিকা ?

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য—'স্বরাজ' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন দাদাভাই নৌরজী। একথাই এযাবৎ আমরা জেনে এসেছি। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব তাঁর স্বরাজ-এর মধ্যে 'বিলিতি সুগন্ধি' পেতেন। ব্রহ্মবান্ধব পূর্ণ স্বাধীনতা—রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্মকর্ম-শিক্ষা-সমাজ সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা বুঝতেন। তাই তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—'আর সংশয় করিও না, সন্দেহ করিও না—সংবাদ আসিয়াছে ভারত স্বাধীন হইবে—বিলম্ব আর নাই।'

৪

আসলে ব্রহ্মবান্ধবের জীবন ছিল এই সার্বিক স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর ধর্মাচরণ আমাদের মধ্যে আপাত-বিস্ময় সৃষ্টি করে। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন। সিন্ধু প্রবাসে গিয়ে দীক্ষিত হন প্রোটেস্টাণ্ট মতে এবং গির্জায় যেতে অসম্মত হন। শেষে বেদান্ত ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একজন Vedanti-Catholic-এ পরিণত হন। শেষে আবার প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। কিন্তু একে ধর্মোন্মত্ততার লক্ষণ বলা ভুল হবে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঠিকই বলেছেন "দেশের জন্য প্রায়শ্চিত্তই তাঁকে বার বার ধর্মান্তরিত করেছে।"

জীবনের সূচনায় নরেন্দ্রনাথের (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে বন্ধুত্ব, দুজনে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত, কেশবচন্দ্র সেনের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ, রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য, সিন্ধুপ্রবাসে বাইবেল ক্লাসে যোগদান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ সব কিছুই ছিল তার কাছে সত্যানুসন্ধান। অবশেষে

হিন্দুধর্মের মধ্যেই পরম প্রাপ্তির সন্ধান তাঁর জীবনকে সত্য পথে পরিচালিত করেছিল। বেদান্ত তাঁর আশ্রয় হয়। শাঙ্কর ভাষ্য তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়। ফলে তিনি **'Brahmin by birth'** এবং **'Christian and Catholic by faith'** হয়েও আত্যন্ত উন্নতশীল হিন্দু। এবং স্বাদেশিক হিন্দু।

কারণ ইতিমধ্যে তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন এবং ইউরোপীয় সব কিছু সম্পর্কেই একটা বিতৃষ্ণা নিয়ে এসেছেন। ফলে তাঁর স্বদেশকে ভালবাসা আরও খাঁটি হয়ে উঠেছে। বিপিনচন্দ্র পাল এই 'কটকটে স্বদেশী' ও ভাববিপ্লবী সম্পর্কে বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা স্বাদেশিকতার সূত্রপাত ব্রহ্মবান্ধবের ধারণা থেকেই প্রসূত। দেশপ্রেমে পাগল এই মানুষটি বীডন স্কোয়ারের একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন—'আমি আবার জন্মাব, আবার এই দেশে ফিরবো এবং আবার দেশের কাজ করবো।'

৫

এই দেশের কাজ করতে করতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'সন্ধ্যা' সিডিশান মামলা শুরু হয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে। মামলা শুরু হবার আগেই ব্রহ্মবান্ধবের উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেছিল— জনগণের মনে সরকারের বিরুদ্ধে যেটুকু ক্ষোভ ও ঘৃণা সঞ্চারের প্রয়োজন 'সন্ধ্যা' তা করতে সমর্থ হয়েছিল। মামলার প্রথম দিনেই ব্রহ্মবান্ধব বিচারকের সামনে যে বিবৃতি পাঠ করেন, স্বামী অণিমানন্দ রচিত **'The Blade'** বই থেকে তা উদ্ধার ক'রে দিই :

I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the newspaper Sandhya and I say that I am the writer of the article, Thake Gachi Premer Dai which appeared in the Sandhya of the 12th August 1907, being

one of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission cf Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in this way of our true national development'.

প্রকৃতপক্ষে 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' (১৩ আগষ্ট ১৯০৭) ছাড়াও 'সিডিশনের হুড়ুম হুড়ুম ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' (২০ আগষ্ট ১৯০৭) এবং 'বাছা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন' (১৩ আগষ্ট ১৯০৭) প্রবন্ধ দুটির জন্যেও রাজদ্রোহের মামলা খাড়া করা হয়।

ব্রহ্মবান্ধবের এই বিবৃতি পাঠের পর চিত্তরঞ্জন দাসের পক্ষে আর তার কৌঁসুলি থাকার প্রয়োজন থাকল না। অকৃতদার ব্রহ্মবান্ধব এসময়ে হার্নিয়াতে ভুগছিলেনই। মামলা চলার সময় ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থেকে রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে লাগল। একদিন রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হল। তাঁর অসুস্থ থাকাকালীন পুনশ্চ 'সন্ধ্যার' অফিসে খানাতল্লাসী হল ও দ্বিতীয়বার ২৬ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাজদ্রোহের মামলা হল। কিন্তু ২৭ অক্টোবর মাত্র ৪৬ বছর ৮ মাস বয়সে সকল পার্থিব মামলার উর্ধ্বে তিনি চলে গেলেন। বিপিনচন্দ্র পালের কাছে এই সংবাদ গেলে তিনি চমকে উঠে বলে উঠেছিলেন—'উপাধ্যায় মশাই মরেন নি—তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন।' স্বাদেশিকতা তো অমরই। দশহাজার লোক নিমতলা ঘাট পর্যন্ত তাঁর শবানুগমন করলেন।

৬

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একটি নিত্যস্মরণীয় নাম হওয়া উচিত বাঙালীর কাছে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙালী তাঁকে ততখানি মনে রাখেনি। ফলে ইংরাজিতে এবং জার্মানী ভাষায় তাঁর দুখানি জীবনী লেখা হলেও বাংলায় প্রবোধচন্দ্র সিংহ ও যোগেশচন্দ্র বাগল (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) ছাড়া তাঁর আত্মজীবনী কেউ লিখে যাননি এবং এ দুটিও যথাসংক্ষিপ্ত। অথচ তার পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত্র বঙ্গীয় স্বাধীনতা আন্দোলনেরই এক উজ্জ্বল পর্ব মাত্র। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় এবং বলাই দেবশর্মার বই দুখানি কোনো ক্রমেই জীবনী মাত্র নয়।

উপাধ্যায়ের সমগ্র জীবনের ধ্যানধারণা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। থিওফিলিস (থিও=ব্রহ্ম, ফিলি=বন্ধু) 'ব্রহ্মবান্ধব' যে আসলে দেশবান্ধব ছিলেন একথাটা বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন আছে। তাঁর জীবৎকালে একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়— 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' (সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। ব্রহ্মবান্ধব লেখেন 'এই পুস্তিকায় যে কয়খানি চিঠি প্রকাশিত হইল তাহা আমি বিলাত হইতে বঙ্গবাসী পত্রে লিখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি যে চিঠিগুলি সাধারণের ভাল লাগিয়াছিল। তাই ঐগুলিকে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ২০ শ্রাবণ ১৩১৩।'

তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দুর পালপার্বণ নিয়ে 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত কয়েকটি রচনা নিয়ে 'ব্রহ্মামৃত' প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শনের বৈশাখ, শ্রাবণ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩০৮ সালের সংখ্যা থেকে 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা', 'তিন শত্রু', 'হিন্দু জাতির অধঃপতন ও 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' প্রবন্ধ চতুষ্টয় সংকলিত হয় 'সমাজ-তত্ত্ব' (১৯১০) পুস্তকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযত্নে। বইটি পরে 'সমাজ' নামেও পুনর্মুদ্রিত হয় (১৯২৬)। ব্রহ্মবান্ধবের বাল্য জীবনের অসমাপ্ত স্মৃতিকথা 'স্বরাজ' পত্রের ১২ ও ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে সেটি প্রকাশিত হয় 'আমার ভারত উদ্ধার' নামে (১৯২৪)। কয়েকটি স্বদেশী পূজা-পার্বণের রচনার সংকলন 'পাল-পার্বণ' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। অনেক-কাল পরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং হাউস 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা' নাম দিয়ে তাঁর 'আমার ভারত উদ্ধার', 'বিলাত-প্রবাসীর চিঠি' এবং 'বাংলার পার্বণ' গ্রন্থত্রয় দুই মলাটের মধ্যে আবদ্ধ করে একালের পাঠকদের ব্রহ্মবান্ধবের রচনা বিষয়ে পুনশ্চ অবহিত করার প্রয়াস পান। তাঁদের সে প্রয়াস সার্থক হয়। সে বইও এখন দুষ্প্রাপ্য।

অথচ এই সব রচনা ছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব আরও অনেক লিখে-ছিলেন। সেগুলি আরও দুষ্প্রাপ্য, এমনকি অপ্রাপ্য বললেও দোষ হয় না। 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজে'র সংখ্যাগুলি সব চোখে দেখা যায় না। অন্যত্রও তাঁর বাংলা রচনা যা প্রকাশ হয়েছিল তার অনুসন্ধানও সহজ নয়। তবুও আমরা অনেক খুঁজে পেতে ব্রহ্মবান্ধবের একটি প্রায়-সম্পূর্ণ রচনা সংগ্রহ একালের কাছে উপস্থিত করে দিলাম তাঁর মৃত্যুর ঠিক আশি বছর পর—এই আশায় যে ব্রহ্মবান্ধব যে বিস্মৃতি-যোগ্য নন, তা বাঙালীর মধ্যে আবার উচ্চারিত হোক এবং স্বদেশী ইতিহাস—রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক—তা পূর্ণতর হোক।

দীর্ঘকাল ধরে এই সংগ্রহ কর্মটি প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার প্রবল ছিল। আমাকে একাজে আনুকূল্য করেন 'কলেজস্ট্রীট প্রকাশন' সংস্থার কর্তৃপক্ষ। তাঁদের উৎসাহেই আমি দীর্ঘ পরিশ্রমে ব্রহ্মবান্ধবের লুপ্তপ্রায় রচনাবলী সংগ্রহ করি। অনেকগুলি রচনার সংবাদ দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন বন্ধুবর অশোক উপাধ্যায়। 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা' এবং বলাই দেবশর্মা রচিত 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' বই দুটি আমাকে দেন বলাই দেবশর্মার পুত্র সুজন বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সমাজ তত্ত্ব' বইটি সংগ্রহ করে জেরোক্স

কপি করিয়ে দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত বন্ধুবর শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন, বড়া বয়েজ ক্লাব প্রভৃতির সহায়তাও এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। গ্রন্থ মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দুষ্প্রাপ্য রচনার সন্ধান পেতে শুরু করি বলে যতোখানি সুবিন্যস্ত করা উচিত ছিল, বইখানি ততখানি সুবিন্যস্ত করতে পারিনি। পাঠকবর্গ এজন্য ক্ষমা করে দেবেন। তবে একসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে তাঁরা খুসিই হবেন—এ ভরসাও এই সম্পাদকের আছে।

ব্রহ্মবান্ধবের বহুতর ইংরাজী রচনা ও পত্রাবলী এখনও সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে। উন্নতমনা কোনো প্রকাশক পেলে সেগুলিও একত্রে প্রকাশ করা যেতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা রচনাবলীকে একখণ্ডে একত্রিত করা। সে উদ্দেশ্য কিছুটা সাধিত হল। এই গ্রন্থে সংগৃহীত রচনাবলীর কোনো কোনোটির পরিচয় একালের পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আছে। যথাসংক্ষেপে আমরা সেই কাজটি সমাপ্ত করছি।

৭

এই সূত্রে একেবারে শেষের কথায় আসি। উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮) উপাধ্যায়ের শিষ্য মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে বলেন 'উপাধ্যায়ের সমস্ত লেখা সংগ্রহ করে মুদ্রিত করুন, আমি সমস্ত খরচা দেব।' কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই মানবেন্দ্রনাথ এবং যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু হয়। ফলে একাজ আরব্ধই হয়নি।"

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আক্ষেপ করে পরবর্তীকালে বলেছিলেন— 'উপাধ্যায় মহাশয় বাংলা সাহিত্যে কি দিয়ে গেছেন তা আজকালকার

লোক উপলব্ধি করে না।' তিনিও চেয়েছিলেন 'উপাধ্যায়জীর লেখাগুলি সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ইহা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।' বাস্তবিকই তাঁর ব্যক্তিগত সত্যানুসন্ধান ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজ ও বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক সৎসাহস তাঁকে 'ধানী লঙ্কা' অভিধা এনে দিয়েছিল। সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যে শুধু দেশ সেবকের নয়, সত্যানুসন্ধকেরও ছিল, তা স্মরণ করার জন্য তাঁর সাহিত্য কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর কর্মকীর্তির নিচে তাঁর যে সাহিত্য পরিচয়, তা উদ্ঘাটনেরও প্রয়োজন।

তাঁর 'বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' বা 'আমার ভারত উদ্ধার' পড়লে স্বতই মনে হয় বঙ্কিম-রবীন্দ্র পরিবেশে প্রতিপালিত একটি লেখক কোন্ গুণে ভূষিত থাকলে এমন প্রসাদগুণসমন্বিত রসিক গদ্য ও ওজস্বী ভাবুকতার সংমিশ্রণ ঘটাতে পারেন।

তাঁর চলতি ভাষার সঙ্গে সাধু গদ্যের মিশ্রণকে কেউ বলতে পারেন 'হুতোমী ঢঙ'। কেউ বা বলতে পারেন গুরু-চণ্ডালী। বলুন, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু লেখাগুলি যে পাঠকদের টেনে রাখে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় যখন 'বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' প্রকাশিত হত; পাঠকেরা পরের কিস্তির জন্যে যে হা-পিত্যেশ করে থাকতেন—তা থেকেই এসব রচনার রোসিক্ত্যতা বোঝা যায়। শুধুমাত্র ধর্মেতিহাস বা সমাজেতিহাসের দিক থেকেই নয়, সাহিত্যেতিহাসের দিক থেকেও ব্রহ্মবান্ধবের রচনাবলী অবশ্য পাঠ্য। উজ্জ্বল কৌতুকরস এবং অন্তর্ভেদী মত-বিশ্বাসের এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কদাচিৎ বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। একটা প্রবল নির্লিপ্ততা ব্রহ্মবান্ধবের গদ্য-ভাষাকে একাল পর্যন্ত আকর্ষণীয় করে রেখেছে।

পুস্তকাবলী ছাড়া সংগৃহীত অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'অনুষ্ঠান-পত্র : স্বরাজ' ও 'স্বরাজ গড়'—'রামকৃষ্ণ কথা : অবতরণিকা', 'স্বামী

বিবেকানন্দ' এবং 'বিবেকানন্দ কে'—'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (এই গ্রন্থের ৫০–৬১ পৃষ্ঠায় মধ্যবর্তী প্রবন্ধাবলী)। 'বেদান্তের প্রথম কথা' প্রকাশিত হয়েছিল নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শনের' আষাঢ় ১৩১১ সংখ্যায়। 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' প্রবন্ধটি। 'সন্ধ্যায়' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে চারটি প্রবন্ধ আমরা পর পর সংকলন করে দিলাম। এগুলি 'দে কালীবাড়ী একশ পাঁঠা' (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬), 'কোন কালে নাই মনসা পূজা, একেবারে দশভূজা' (১৩ মার্চ ১৯০৬), 'কবে আঁখি ফুটিবে'? (১৬ মার্চ ১৯০৬) এবং 'অমৃতং মতি ভাবিতম্' (২৯ মার্চ ১৯০৬)। এই প্রবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য বাংলা ব্যাপী আন্দোলন যখন বৃটিশ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয় তখন মর্লিকে দিয়ে এর পুনর্বিচারের জন্য গোখলে বিলাত যান। এই সব আবেদন-নিবেদন ব্রহ্মবান্ধবের কাছে নিতান্ত ঘৃণ্য বিষয় ছিল। তাই স্বদেশবাসীদের সচেতন করার জন্য একটু ভিন্ন সুরে এই ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন।

আবার পুলিশি হাঙ্গামার ভয়ে সে সময়ে যে সব ধনী ব্যক্তিরা কারিগরি শিক্ষার অজুহাতে সন্তানদের বিদেশে পাঠাতে আরম্ভ করেছিলেন এবং যা নিষ্ফল শিক্ষায় মাত্র পর্যবসিত হচ্ছিল তাঁদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের জন্য বেসুরো তালে ব্রহ্মবান্ধব গেয়ে বসলেন, 'কোনো কালে নেই মনসা পূজা একেবারে দশভুজা'। হিউম-কটন-ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি তথাকথিত ভারত প্রেমিকদের নিয়ে যখন বাংলাদেশের তৎকালীন নেতারা উন্মাদপ্রায়, ব্রহ্মবান্ধবের লেখনী তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে কসুর যে করেনি, তার প্রমাণ 'কবে আঁখি ফুটিবে' প্রবন্ধটি। চতুর্থ প্রবন্ধটিতে সংবাদপত্রের সম্পাদককে স্বদেশী আন্দোলন প্রচারে সতর্ক করে দিয়েছেন এক 'ধানী লঙ্কা' সম্পাদক।

'আনন্দ বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত ও পুনর্মুদ্রিত রচনাবলীর সংকলন পাঠক পাবেন ইতু পূজা, শ্রীপঞ্চমী, দোল-লীলা, ভালবাসা কি মুখের কথা, স্বদেশ প্রীতি ও বিশ্ব প্রেম এবং দোলযাত্রা প্রবন্ধাবলীতে। বাংলার পাল-পার্বণের সঙ্গে এগুলির কোন কোনটিকে সংযোজন হিসেবে গ্রহণ করে পাঠক পড়তে পারেন। তাঁর আরও একটি রচনা—'নবান্ন' এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। এটিকে আমরা এই গ্রন্থের একেবারে শেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে মুদ্রিত করে দিয়েছি।

শেষে সংকলিত প্রবন্ধত্রয় আমরা 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা' পুস্তকের পাঠ-অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছি। তাঁর সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে এই অংশ পাঠে পাঠককের পরিতৃপ্তি সম্ভবত চরম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পরিশিষ্টেও ২টি রচনা সংযুক্ত করে দিয়েছি।

এতোগুলি রচনা একত্রে সংকলিত করার পরও ব্রহ্মবান্ধবের আরও বহুতর রচনা সংগৃহীত যে হ'ল না, সে বিষয়ে আমি অবহিত। কিন্তু আমরা উপায়হীন। সম্পাদিত পত্রিকাগুলি দুষ্প্রাপ্য, এমনকি অপ্রাপ্যও। তাছাড়া কোনো প্রস্তুত সূচী না থাকায়, তিনি কোন্ কোন্ পত্রিকায় লিখেছিলেন, তা জানাও প্রায় অসম্ভব। পাঠক ও গবেষকগণ সহায়তা করলে পরবর্তী সংস্করণে সন্ধান পাওয়া আরও কিছু রচনা আমরা সংযুক্ত করতে পারবো। এজন্য পাঠক সমাজের কাছে আমার আবেদন করা রইলই।

সমাজ-তত্ত্ব

হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা

"হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্ব চরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি। যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরল প্রাণ বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে,
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ।"

করতল-চট্‌চটাধ্বনি-মুখরিত সভাগৃহে হিন্দুজাতির মহিমা, সময়ে অসময়ে, পরিকীর্ত্তীত হইয়া থাকে। চাটুবাদলোলুপ বাগ্মিগণ "আমরা হিন্দু", আমরা "আর্য্য", "আমরা শ্রেষ্ঠ" এবম্বিধ জাতীয় গৌরববচনমধু শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্য্যদিগের গৌরব কোন্ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ মন্ত্রে পরিরক্ষিত, তাহা হইলে কেবল একটা কাণ্ডনিষ্পত্তিবিহীন মস্তককণ্ডূয়নসূচনা দৃষ্ট হয় মাত্র।

কোন বিষয় বলিতে গেলে, দুই প্রকারে বলা যায়। "নেতি" "নেতি" ইহা নয়, উহা নয়, তাহা নয়, ইহাকে বলে বস্তুর নঞ্-সংজ্ঞক পরিচয়। পাবার বস্তুটি এইরূপ, ইহাকে বলে স্বরূপ পরিচয়।

হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা অগ্রেই বলা যাউক। হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ধর্ম্মমতের অপেক্ষা করে না। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথাচ সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু ঋষি। বৈষ্ণবচূড়ামণি রামানুজ বেদান্তের অদ্বৈতবাদী আচার্য্যদিগকে মায়াবাদী ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে কোন বৈষ্ণব শিবমন্দিরের ছায়াস্পর্শ এবং শৈবদিগের সহিত আহারাদি করেন না। মাধ্বাচার্য্য আবার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চমকার সাধক ছাগমহিষহননকারী শাক্তের সহিত নিরামিষাশী জৈনের এত প্রভেদ যে বর্ণনায় কুলাইয়া উঠে না। কিন্তু শৈব ও হিন্দু, বৈষ্ণব ও হিন্দু এবং জৈনকেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। যদি মতামত লইয়া হিন্দুত্ব গঠিত হইত তাহা হইলে হিন্দুসংজ্ঞা অনেক দিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুর হিন্দুত্ব আহারপান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহামাংস ভক্ষণ ব্যতীত খাদ্যাখাদ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। শিখেরা শূকর মাংস ভক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পঞ্জাবের অধিবাসীরা কুক্কুটমাংস ভোজন করে। শিখেরা তাম্রকূট সেবন করে না কিন্তু মদিরা পান করে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মৎস্যাশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলকে পতিত ও ভ্রষ্ট মনে করে। এমন কি পুরাতন সংহিতা-কারগণ মহামাংস ভোজনেরও বিধি দিয়াছিলেন। এখন কাহাকে হিন্দু বলিব এবং কাহাকে হিন্দুত্ব হইতে অপসারিত করিব? মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বা শিখদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুজাতি যে অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যদি হিন্দুত্ব ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধিসাম্যের উপর নির্ভর না করে

তবে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কোন্ আলম্বে হিন্দুর জাতীয়তা আলম্বিত আছে?

হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা। এই প্রবন্ধে হিন্দুর একনিষ্ঠা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু কিরূপে সেই একমুখীন আর্য্যবুদ্ধি বর্ণাশ্রমবিভাগে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে তাহা যথাসময়ে পর্য্যালোচিত হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে বলে, মানুষ নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে চিন্তা করে। সেই সকল অপরিবর্ত্তনীয় বিধি অতিক্রম করিলেই ভ্রম প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক দর্শনচিন্তাবিধি একই। এই নির্দ্ধারণ একান্ত শিরোধার্য্য। তথাপি হিন্দুচিন্তাপ্রণালীর বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে বিধিগত পার্থক্য নাই বটে কিন্তু প্রণালীগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দুইটী পক্ষী এক নীড়ে বাস করিত। একটি পক্ষপুট বিস্তার করিয়া উর্দ্ধে অনন্তের দিকে উঠিল, মেঘাকাশ ছাড়াইয়া গ্রহতারকামণ্ডিত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া ছায়া পথে পঁহুছিল। এই দিগ্বিহীন শূন্যে আনন্দের গভীরতায় ডুবিয়া বলিল, অনন্তপরমব্যোমে ভূমানন্দ, অসঙ্গানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আর একটি পক্ষী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দিগ্ দিগন্তর পরিক্রম করিল, অনন্তের আবাস অনুসন্ধানে। কত সৌন্দর্য্য, কত সম্বন্ধ, কত কার্য্যকারণঘটিত সুষমা দেখিল। প্রকৃতির মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্থির করিল—অনন্তের অখণ্ডত্ব সমন্বয়ে, সংশ্লেষে, সঙ্গমে নিহিত আছে। প্রথমটি আর্য্য ঋষি, দ্বিতীয়টি যুনানী বা গ্রীক দ্রষ্টা।

দুইটি মৎস্য জলধির স্বরূপ নির্ণয়োদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিল। একটি ডুবিল, গভীরতা হইতে গভীরতায় প্রবেশ করিল। শেষে অতল-তলদেশে আগত এবং তুষ্ণীভূত। অপরটি পারদৃশ্বজ্ঞানলাভবাসনায়

ক্রমবর্দ্ধন করিল। প্রখরস্রোতপ্রতিরোধী বলের সহিত উত্তাল তরঙ্গাঘাতকে তুচ্ছ করিয়া সন্তরণ করিতে করিতে অকূল পাথারে হারাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া অনন্তের বিস্তারহীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। প্রথমটি প্রাচ্য হিন্দু, দ্বিতীয়টি প্রতীচ্য জর্ম্মণ।

কোন একটি বস্তুর অবলম্বনে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা হিন্দুর বিশেষত্ব। আর একের সহিত অপরের সম্বন্ধ জানা এবং সম্বন্ধের ভিতর দিয়া একত্বা দর্শন করা য়ুরোপীয় দর্শনের বিশেষত্ব। প্রথমের লক্ষণ একনিষ্ঠতা বা অন্তর্দ্ধান, দ্বিতীয়ের বহুনিষ্ঠতা বা সমাধান। হিন্দু, সূর্য্যের স্বর্ণকবাট উদঘাটন করিয়া সূর্য্যের সারভূত নিষ্কল বিরজ হিরণ্ময় পুরুষকে দেখেন। আর য়ুরোপীয়েরা সূর্য্যের সহিত গ্রহের উপগ্রহের সম্বন্ধ দর্শন করিয়া বহুত্বনিহিত সুষমা অবলোকন করেন।

অনেকে হিন্দু-চিন্তার সহিত হিন্দু-ধর্ম্মমতসমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ য়ুরোপীয় চিন্তা বলিতে য়ুরোপে প্রচলিত ধর্ম্মমত বোঝেন। এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। য়ুরোপীয় চিন্তা-প্রণালীর প্রভবস্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তাপ্রণালী ধর্ম্মমত হইতে পৃথক্। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে ;—

বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাশৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং—

কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় যে একই চিন্তাস্রোত, সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠচিন্তার গতি নির্দ্ধারণ করা যাউক।

বৈদিক কালে যখন যজ্ঞশালায় কালীকরালীমনোজবা প্রভৃতি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশন আহুতি ভোজন করিত তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের মধ্যস্থিত জাতবেদা পুরোধা অগ্নিদেবকে

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঋষিরা পূজা করিতেন। যখন মহাবিক্রমশালী প্রভঞ্জন ধরিত্রীকে আলোড়িত করিত তখন পবনদেবকে "শংনো বায়ু" বায়ু আমাদের মঙ্গল করুন—এবম্প্রকারে স্তুতি করিতেন। গভীর নির্ঘোষী ওজস্বান্ সিন্ধুনদের বীচিবিক্ষোভে বরুণদেবের ক্রীড়া দেখিতেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, বালক যেরূপ চলনশীল জড়বস্তুতে জীবন আরোপ করে সেইরূপ ঋষিরা জড়শক্তি ও চৈতন্যের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চভূতকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। আর্য্য ঋষিদের আধ্যাত্মিকদর্শনে একনিষ্ঠতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্য্যকারণ পরম্পরার সুদীর্ঘ সূত্র ধরিয়া আদিকারণে উপনীত হইতেন না। কোন শক্তিশালী বা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে প্রকাশ-কর্ত্তাকে দেখিতে পাইতেন। ঘোরকৃষ্ণ-জলদজালের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে যদি বলা যায় যে তপনতপ্ত জলকণায় সমবায়ে এই পয়োবাহের জন্ম হইয়াছে তাহা হইলে মীমাংসার কোন ব্যবস্থা হয় না। প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যাহা ছিল না তাহা কিরূপে হইল। মেঘ ছিলনা মেঘ হইয়াছে, মেঘের উৎপাদক পূর্ব্ববর্ত্তী জড় প্রক্রিয়া ছিলনা, হইয়াছিল; এইরূপে যতই আমরা পশ্চাদ্ভাগে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাই না কেন অসতের হাত হইতে এড়াইতে পারিবনা। যদি কোটি যোজন ভ্রমণ করি বা কোটি যুগকে অতিক্রম করি তথাপি নাস্তির রাজ্য অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে-ই বলে আমি ছিলাম না হইয়াছি, আমি আদিতে অসৎ অন্তেতে অসৎ কেবল মধ্যেতে সদ্রূপে প্রতিভাত। কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলিলে এক মহতী অব্যবস্থার মধ্যে হারাইয়া যাইতে হয়। অন্ধকে চলিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান্ চালকের অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অন্ধের সমষ্টিতে চক্ষুষ্মতার উৎপত্তি হয় না। অসৎ, জঙ্গম, অস্থাবর, নামরূপসমন্বিত প্রপঞ্চের অন্তরেই সৎ, স্থির, স্থাবর, অনাম, অরূপ, সারতত্ত্ব বাস করে। ঋষিরা

ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের অপেক্ষা না করিয়া দৃশ্য বস্তুর গর্ভে একেবারেই অদৃশ্য হিরণ্যগর্ভকে দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে একনিষ্ঠতা বলে। আর্য্য-একনিষ্ঠতার আর একটি গভীরতর লক্ষণ আছে।

অগ্নির দেবতা অগ্নিনামে কেন অভিহিত হইল? বায়ু বরুণ তপনাদিদেবতা কর্ত্তা হইয়াও কার্য্যের নামে সংজ্ঞিত কেন হইল? কার্য্যেরও যে নাম কর্ত্তার ও সেই নাম। এই সমনামতা দেখিয়া অনেকে মনে করেন আর্য্য ঋষিরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতিপূজক ছিলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নতার দ্রষ্টা ছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে ঋষি (দৃশি) বলা হইত। কর্ত্তা কোন অপূর্ব্ব মায়াশক্তি বলে কার্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, কার্য্যকারণে ব্যবহারতঃ ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ তাহারা অভিন্ন—এই অভেদতত্ত্ব সমগ্র বেদ গাথায় গীত হইয়াছে। কর্ত্তা এবং কার্য্যের অভেদভাব বিশ্বরূপী স্রষ্টার প্রতিবিম্বরূপী সৃষ্টিতে প্রতিভাতি অদ্বিতীয়ের মায়িক বহুত্ব, বৈদিক ঋষিদিগের একমুখীন অন্তর্দৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই একনিষ্ঠ দর্শন ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈত-বাদে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাংখ্য দর্শনে দেখা যায় যে সমস্ত ভূততত্ত্ব এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হিন্দু চিন্তা অগ্রসর হইতে হইতে এই প্রকৃতিবাদের একত্ব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা যে অভেদ দেখিয়াছিলেন তাহা সাংখ্যে পূর্ণতা লাভ করে নাই। সাংখ্যের একত্ব দ্বৈতান্ধকারাবৃত। প্রকৃতি এক পুরুষাতিরিক্ত বস্তু, আপনাতে আপনি অবস্থিত, অস্তিত্বের জন্য সদ্রূপী পুরুষের অপেক্ষা করে না। সমগ্র ভূতপ্রপঞ্চকে সত্ত্বরজস্ত-মোময়ী প্রকৃতিতে একীভূত করা একনিষ্ঠার ফল বটে, কিন্তু দ্বৈতাপত্তি ইহাতে মেটে না। পুরুষ ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, এই বহুত্ব হিন্দুজাতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আজ হিন্দুস্থানে সাংখ্যমতের পোষক একেবারেই নাই বলিলে হয়।

প্রকৃতিবাদের একত্ব অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একত্ব গভীরতর।

ব্রহ্ম একমাত্র জগতের কারণ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের একতার মধ্যেই অনেকতা নিহিত। যেমন বৃক্ষ এক, কিন্তু মূল ও শাখা প্রভেদে বহু; সমুদ্র এক, কিন্তু লহরীলীলা বহুত্বময়; মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘট শরাবদৃষ্টে বহু; সেইরূপ ব্রহ্ম এক, অথচ বহু। রামানুজের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যের ত্রকত্ব হইতে উচ্চতর সন্দেহ নাই, তথাপি আর্য্য একনিষ্ঠার উচ্চতম বিকাশ নহে। ব্রহ্মের স্বরূপে যদি বহুত্ব অন্তর্নিহিত থাকে তাহা হইলে একত্বের কেবলতা বা শুদ্ধতা থাকেনা। ব্রহ্মের সত্তায় যদি বহুতার অপেক্ষা থাকে, অনেকতার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সম্বন্ধের প্রয়োজন থাকে; যদি ভূমানন্দে কামনা থাকে, তবে সেই অপেক্ষার সিদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, কামনার পরিতৃপ্তি কে করিবে? আবার যদি বহুত্বের বীজ পূর্ণব্রহ্মে পারমার্থিকভাবে নিহিত থাকে তাহা হইলে সেই বীজের ক্রমবিকাশ হইলে সদ্বস্তুর পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী ব্রহ্ম ইহা এক অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম যদি পরিণামী হন, তাহা হইলে সেই পরিণামের কারণ কোথায়? ব্রহ্মের বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মই আপনার পরিণামের আপনি কারণ। কিন্তু কারণের যোজনা হইলে ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে ব্রহ্মপরিণাম যতদূর হইবার সম্ভাবনা ততদূরই হওয়া ন্যায্য। ক্রমান্বয়ের স্থান থাকিতে পারে না। অধিকন্তু পরিণামের চূড়ান্ততাই পূর্ণতা বা অপরিণামিতা। তবেই সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম যদি নিজের স্থিতির নিজে কারণ হন তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বহুত্ব পরিণামের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈত একনিষ্ঠতা আছে কিন্তু ঋষিপ্রণোদিত হিন্দুর একমুখীন বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। হিন্দুস্থানে শতকরা দশজনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দুষ্প্রাপ্য।

শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে হিন্দুর একনিষ্ঠতার চরমতৃপ্তি হইয়াছে। বস্তু একভিন্ন পরমার্থতঃ দুই হইতে পারে না। এবং সেই বস্তুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অখণ্ড, অপরিণামী, আপ্তকাম; সম্বন্ধনিরপেক্ষ, আত্মরত, অসঙ্গ, শুদ্ধ, কৈবল্যময়। তিনি

জগতের কারণ বটেন কিন্তু সেই কারণবীজ তাঁহার সত্তাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জগৎকারণত্ব বা স্রষ্টৃত্ব স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপ কেবল সচ্চিদানন্দময়। তিনি চিদ্বিহীন হইলে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যান, কারণ চিৎ এবং অস্তিত্বে কোন ভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব বা কারণত্ব একটা বাহুল্য বা ঐশ্বর্য্য মাত্র, তাঁহার স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্রষ্টৃত্বকে অপসারিত করিলে তাঁহার সত্ত্বার উপচয় বা অপচয় হয় না। বাস্তবিকই বেদান্ত একত্বের উচ্চতম আকাশে আরোহণ করিয়াছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, যতদিন ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব জ্ঞানদৃষ্টিতে অপগত না হয়, ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই জগৎ মায়াময়, অনৃত, অলীক, সদ্রূপে প্রতিবিম্বিত মাত্র। ইহার অস্তিত্বের ভিত্তি কোথাও দেখা যায় না। বিবর্ত্তনশীল ভূতগ্রাম নিজেতে ত অবস্থিত নহেই আর ব্রহ্মসত্ত্বা মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা গন্ধর্বনগরের ন্যায় এক অঘটঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। সেই মায়াশক্তির ব্রহ্মতে অবস্থিত কিন্তু স্বরূপতঃ নহে, বাহুল্যভাবে ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে। একই বহু হইয়াছে, কিন্তু কেবল ব্যবহারতঃ। একের পরিবর্ত্তন হয় না, পরিণাম হয় না, অথচ বহুরূপে প্রতিভাত হয়। ঋষিরা যে অগ্নিদেবতাকে অগ্নি বলিতেন, কার্য্যের নামে কারণকে অভিহিত করিতেন, সেই একত্বের পরাকাষ্ঠা বৈদান্তিক মায়াবাদেই দৃষ্ট হয়।

একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্বদর্শন, কর্ত্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে ইহার পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্যে। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন। আজ কোথায় সেই একনিষ্ঠতা। পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য্য

সন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে যতদূর উৎকর্ষ হইতে পারে হইবে. কিন্তু অস্থিমজ্জাগত উন্নতি হইবে না।

একনিষ্ঠায় অভ্যুদয়চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা যেন য়ুরোপীয় বহুনিষ্ঠার বিরোধী না হই। এই বহুনিষ্ঠা আমাদের জাতীয়তাকে পোষণ করিবে। যেমন আমাদের দেশে বৃক্ষ সকল য়ুরোপীয় বিজ্ঞান প্রভাবে পরম শ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের চিন্তাপ্রণালী প্রতীচ্য চিন্তা সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন ও তেজ শুষ্ক হইয়া যাইবে। অশ্বত্থকে ইংলণ্ডে রোপণ করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা তাহার কোন কাজে আসে না। হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহ পরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অ-প্রতিষ্ঠ হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও। তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্দ্ধিত হইবে, এবং সুফলসম্পন্ন হইবে।

তিন শত্রু

কথায় বলে, "তিন শত্রু দিতে নাই।" কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকোপে আমাদের জাতীয়-জীবনলীলার শেষপালা সমাসন্নপ্রায়। যেমন ত্র্যহস্পর্শের তিথিগুলি একে একে ভাল, কিন্তু সংস্পর্শবশতঃ গড়ে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহারা দেশ-কালভেদে নিজে নিজে ভাল হইলেও সম্মেলন-সংঘর্ষহেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কারা?

প্রথম।—বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-'হিন্দু রব-নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতনে ও নূতনে, আর্যে ও অনার্যে, ভগবদ্গীতায় ও মনসা-ঘেঁটুর গীতে কোন প্রভেদ নাই। অনুষ্টুপ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইলেই, তাহাতে যাহাই থাকুক না কেন—আচার, অনাচার বামাচার—তাহা বেদ। বেদগাথা যদিও ইহাদের কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইহারা শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেদে বাষ্পযান ও ব্যোমযানের কথা উল্লিখিত আছে—নহিলে রেলগাড়ী চড়িয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না। একজন মহাদেবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল,—"কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।" ভোলানাথ মহেশ ধুতুরার ঘোরে এ নিন্দাবাদকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কোন গুণ নাই' অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য নির্গুণ ব্রহ্ম, আর কপালে আগুন' ত শিবের বিশেষ বৈভব। গোঁড়া মহোদয়েরা তেমনি স্বদেশগৌরবের নেশায় আমার নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাকে ধন্য মনে করিব। তাঁহারা এক কথা জানেন, আর কিছুই জানেন না, শোনেন না। 'হিন্দু' 'হিন্দু' এই তাঁহাদের বুলি। দর্শনবিজ্ঞানশিল্পবাণিজ্যে হিন্দুজাতি উৎকর্ষ্যের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। য়ুরোপীয়েরা তলদেশে বসিয়া গায়ের জোরে কেবল আস্ফালন করে। হিন্দুর সবই ভাল। শাঁসও ভাল, খোসাও ভাল

তণ্ডুলও ভাল, তুষও ভাল। আহা! গোঁড়ামির এই ত প্রকৃত লক্ষণ।

"সকণ্টক কইমাছ করয়ে ভক্ষণ।
গোঁড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ॥"

এখন ইহাদের গলায় কাঁটা বিঁধিয়া কোন্ দিন না প্রাণটা যায়। এই গোঁড়ারাই দেশের গোঁড়ার শত্রু।

দ্বিতীয়। ইংরাজিনবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষীভক্ষীর দল। ইহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। "রাধাকৃষ্ণ" বলাও, তা-ও বলেন, "কালীকল্পতরু" ভজাও, তা-ও ভজেন। ইংরাজি সভ্যতার প্রথমাবেগে শ্বেতাঙ্গ গুরুদেবেরা শিখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকালই ইষ্টক কাষ্ঠ পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু তাহারা জানিতও না, জানেও না। অমনি তথাস্তু বলিয়া হ্যাট্‌কোট্‌রূপ চূড়াধড়া পরিধান করিয়া কাঁটাচামচ বাজাইয়া সাহেবী পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই শ্বেতঙ্গদেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্ম-দর্শনের অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারবিদ্যায় তাঁহারা বড় একটা মন দিতেন না। ধর্ম্মমতে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে য়ুরোপীয় হওয়াই উচিত। য়ুরোপীয়েরা অধ্যাত্মদর্শনের বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাণিজ্যবিদ্যায় তাহারা জগদ্‌গুরু। হিন্দুরা 'জগৎ মিথ্যা' এই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছিল, তাই পার্থিব ব্যাপারে তারা বড় উদাসীন ইহার প্রমাণ কি? দেখ আমরা এমনি আধ্যাত্মিক যে লড়াই করি না এবং করিতে আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না। আমরা কেমন শান্ত সমাহিত, স্থির, ধীর, অলসগতি! আর য়ুরোপীয়েরা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—এক মাসের পথকে একদিনের করে, সমুদ্রলঙ্ঘন করে, অভেদ্য গিরিকে ভেদ করে—কেবল উদ্যমশীলতা ও ব্যস্ততা। ভীরুতা ও আলস্য কি আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে? যেমনি প্রতীচ্য বুধগণ এই কথা প্রচার করিলেন, অমনি ইংরাজিনবীশ

সংস্কারকেরা তার-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বচন!" সত্য বচন!!" আমরা ধর্ম্মে হিন্দু—অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ে কোন মতামত রাখি না—কিন্তু পার্থিব বিষয়ে আমরা য়ুরোপকে আদর্শ করিব। এই ইংরাজি শিক্ষিত সভ্যদলটি যথেচ্ছাচারী—না স্থলচর, না জলচর। উভচর কি?

তৃতীয়!—সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একভূত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকীর্ণ 'কিঞ্চিৎ'-গুলা জড় করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গীন সত্য লাভ করা যায়। হিন্দুরা বলে, জগৎ অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হারবার্ট্ স্পেন্সর বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা জানা যায় না। এস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া দাও এবং পূর্ণসত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম সৎপদার্থ বটে, কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূত ও সৎ ও তাঁর চিরসঙ্গী। আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালবাসি, সদাই স্তিমিতলোচন, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল দৌড়ঝাপ করে; এস আমরাও দৌড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর ম্লেচ্ছেরা সংসারভক্ত; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তবে ঈশ্বর ও সংসার, দুই সমান মাত্রায় বজায় রাখ। আমরা কদলীপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবেরা টেবিলে খায়; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিৎ, কাহাকেও ছোটবড় করা ভাল নয়। দুই জমিদার সমান ঘুষ দেওয়াতে কোন এক ন্যায়বান্ মুন্সেফ রায় দিয়াছিলেন—এক পক্ষের অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্মিস্, অপর পক্ষেরও অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্মিস্। পুরাতন সভ্যতা উপহার লইয়া উপস্থিত, নূতনও ভেট পাঠাইয়াছে, এখন কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে ফেলি। দু'জনেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পূরা-সভ্যতা গঠন করা চাই। তুফান হইতেছে। মুসলমান মাঝী আল্লার দোহাই দিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিল। ঝড় আল্লাও মানিল না, দুর্গাও মানিল না। ইহা দেখিয়া ইংরেজী-সংস্কৃত-

পড়া একজন বাবু "দুর্গা আল্লা" "দুর্গা আল্লা" বলিতে আরম্ভ করিল। এই সমম্বয়ের প্রভাবে নৌকা ভরাডুবি হইল, কি ঘাটে পঁহুছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, আমাদের উদার সমন্বয়বাদী ভ্রাতৃগণ ওঁকার-ববম্‌বম্‌-হালেলুয়া-আমেন-সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন,—যাহার প্রভাবে স্বদেশ-নৌকাটি সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্রপ্রণেতারাই প্রতিষ্ঠাবিহীন, সর্ব্বনাশী সংস্কারক।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তিন প্রকার উদারতা তিনটি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রস্ফুত হইয়াছিল। যুনানী বা গ্রীক সদৃশপ্রিয়তা, রোমক বিসদৃশযোগশীলতা ও হিন্দু সমন্বয়প্রতিষ্ঠা।

গ্রীকেরা সকল মতের ও ভাবের অসমান, বিসদৃশ অংশ ত্যাগ করিয়া সমান, সদৃশ অংশ গ্রহণ করিত। তাহাদের নৈসর্গিক গুণসকল ভিন্নজাতির সদৃশগুণের সহিত মিশিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল! গ্রীক-দর্শনকারগণ জগতে বিকশিত দেবত্বের ও মনুষ্যত্বের সাধারণভূমি অধিকার করিতে যত্ন করিতেন।

রোমীয়েরা বিসদৃশ পদার্থের একীকরণে পটু ছিল। কোন দেশে রোমের জয়পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র বন্দীদের সহিত তদ্দেশস্থিত দেবতারাও রোমে চালান হইত। রোমবাসীদের বিদেশীয় দেবদেবীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ছিল না। তাহাদের সম্মেলন করা বড় ভাল লাগিত। মিলুক আর না মিলুক, সংখ্যা ও আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইলেই তৃপ্তি হইত। তাহাদের দেবতাদের তালিকা রঙ্‌বেরঙের তালি দেওয়া আউল-ফকিরদের আঙ্‌রাখার মত। এইরূপ উদারতায় বিসদৃশের মিলন হয় বটে, কিন্তু শ্রীসৌষ্ঠব হয় না।

হিন্দুর উদারতা প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট। একটা মূলতত্ত্ব তাহারা গ্রহণ করে এবং পরে সেই মূলতত্ত্বকে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মতের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্র ঐ প্রতিষ্ঠামূলক উদারতার সুমহৎ দৃষ্টান্তস্থল। বেদান্তের সারতত্ত্ব—এক বই দুই বস্তু পরমার্থিক

হইতে পারে না—ইহাই গীতার মৌলিক শিক্ষা। কিন্তু বহুবাদি-সাংখ্যদর্শন, দ্বৈতবাদি-ভক্তিশাস্ত্র, কঠোর যোগসাধন—সমস্তই সেই সারতত্ত্বে গ্রথিত হইয়াছে। গীতা কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণথালের ন্যায়। দুইটি মিলাইয়া এক করা হয় নাই, কিন্তু একেরই ঐশ্চর্য্য-বৈভব বৃদ্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিরোধ মিটান হইয়াছে। গ্রীকেরা বিভিন্ন মতের ভিতর হইতে সাধারণ ভাবটি গ্রহণ করে, রোমীয়েরা অসমানকে পাশাপাশি বসাইয়া ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা একটি মৌলিক দেশ-কালাতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যান্য সারকথা সেই মূলের মুষায় ঢালিয়া গ্রহণ করে। আমার একটি নৈসর্গিক সুর আছে। বেহালা বা এস্রাজের সুরের সহিত আমার সুর মিশাইয়া মিষ্টতা ও বল বৃদ্ধি করি; কিন্তু পাঁচটা যন্ত্রের সংযোগে আমার সুর প্রস্তুত করি না। হিন্দু গ্রহণ করে, সংযোগ করে, কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি ছাড়ে না। এই একনিষ্ঠ উদারতা হিন্দু জাতির বিশেষ গুণ। আজ হিন্দুসন্তানেরা সেই একনিষ্ঠতা—সেই উদারতা হারাইয়া, তেজোহীন ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

একজন 'হিন্দু'-শব্দের অর্থ করিয়াছে—"হীন" ও "দূরপলাতক"। বাস্তবিকই হিন্দুস্থানের হীনতার অবধি নাই। হিন্দু নিঃসত্ত্ব হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার প্রতীকার আবশ্যক। পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া যায় না এবং দাঁড়াইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে। অগ্রসর হইতেই হইবে। এখন কোন্ প্রণালীতে আমাদের গতিবিধি নিয়মিত করা উচিত?

প্রথমে আত্মমর্যাদাজ্ঞান আবশ্যক। আমাদের কিছু আছে, আমরা অসার নহি, এইরূপ বোধ হওয়া চাই। আধ্যাত্মদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, বেদান্ত শাস্ত্র এক অপূর্ব, অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বকথা হিন্দুজাতিকে শুনাইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন গবেষণা যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সেই বেদান্ততত্ত্ব পরিপুষ্ট ও কার্য্যকরী হইবে না। য়ুরোপে অধ্যাত্মদর্শন নাই—ইহা এক ঘোর প্রমাদ। আপ্লাতুনের (Plato) মত আত্মদর্শী কয়জন জন্মিয়াছে? কান্ত (Kant) ও

হেগেলের ন্যায় অদৃশ্যদর্শী অতি বিরল। যদি আমরা দর্শনবিদ্যায় অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে প্রতীচ্যদর্শনকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু আদান করিতে গিয়া যেন বেদান্তভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাস্থানীয় চিরকালই থাকিবে। কিন্তু জর্মণদর্শনের সহিত সংস্পর্শ ঘটাইয়া তাঁহাকে বিকশিত ও স্ফুটীকৃত করিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, বেদান্ত ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে আংশিক সত্য বলিয়াছে এবং জর্মণ হেগেলও আংশিক কথা বলিয়াছে—দুটা মিলাইয়া পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—', তাঁহারা সত্য যে কি বস্তু তাহার আভাস পর্যন্ত বোধ হয় দেখেন নাই। আর যাঁহারা, বেদান্তেই সব আছে, ম্লেচ্ছদিগকে ঘরে ঢুকাইবার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা সংস্পর্শজনিত ক্রমবিকাশবিধি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না।

সমাজসংস্কারবিষয়ে এইরূপ আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ান উচিত। বর্ণাশ্রমধর্মই সেই ভিত্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম বলিলে কেহ যেন বর্ত্তমান কর্মভ্রষ্ট শত বিভাগচূর্ণ সামাজিকতা মনে না করেন। য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত য়ুরোপীয় প্রথা বর্ণধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলকরী হইবে, নহিলে বিষফল ফলিবে।

রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রণালী। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে, আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না। য়ুরোপ হইতে ইহার আমদানি করা আবশ্যক। য়ুরোপে যেমন লোকের ভোটের উপর রাজ্যশাসন নির্ভর করে, সেইরূপ আমরাও এদেশে ভোট চালাইব। কিন্তু অবহিত হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে য়ুরোপের রাজতন্ত্র অর্থোন্নতি-সাপেক্ষ। ব্যবসায়ী বণিকেরা রাজাকে অর্থের লাভ বা হানি দেখাইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি করতে বাধ্য করিতে পারে। কোন বিধান বা ব্যবস্থা ধনাগমের সহায় না হইলে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। য়ুরোপের রাজশক্তি তন্তুবায় ও সুরাজীবীদিগের অর্থলালসার দ্বারা চালিত। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু

আমাদের দেশের রাজনীতি যদি অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। যাহার ধন আছে, যে রাজস্ব দিতে পারে, সে-ই ভোটের উপর হিন্দুস্থানের রাজতন্ত্র স্থাপিত হইলে, বড়ই এক গোলযোগ বাধিবে। হিন্দুর রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্ত্রজীবী কর্ত্তৃপক্ষ এবং বণিক সম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তির বা শাসনবিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী অথচ অর্থহীন, যাঁহারা অস্ত্রসঞ্চালন করিতেন না, ক্রয়বিক্রয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এইরূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের অধিকার ভোট হইতে উদ্ভূত হইত না বা ভোটে বিনষ্ট হইত না। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসনবিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলদৃপ্ত নৃপতি ও অর্থলোলুপ বৈশ্য ঐ সুধীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই পুরাতন হিন্দু শাসন-প্রণালীই য়ুরোপীয় প্রণালী অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, তাহা আপাততঃ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যদি আমরা জাতীয়তা-ভ্রষ্ট হইতে না চাহি, তাহা হইলে আর্য্য-রাজনীতিপ্রথাকেই আমাদের নূতন রাজতন্ত্রের ভিত্তি করতে হইবে। তাহার উপর যত ইচ্ছা ভোট চড়াও, ক্ষতি হইবে না।

ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে কিরূপে আত্মমর্য্যাদা রাখিয়া উদারভাবে প্রতীচ্য আদর্শ সকল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

হিন্দুজাতির অধঃপতন

ভারতবর্ষের একখানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। কতদিনে যে হইবে, তাহা বলা যায় না। জাতীয় জীবন বৈজ্ঞানিক-ভাবে দেখা আমাদের প্রকৃতিগত নহে। ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিলেই আমরা পুরাণ গড়িয়া ফেলি। কাজে কাজেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্যতীত "নাস্তি গতিরন্যথা।" কিন্তু যে দেবতাদিগের উপর আমাদের ষোল-আনা নির্ভর, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় স্বচ্ছ ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া এক বিপুল প্রমাদচ্ছবি অাঁকিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? য়ুরোপীয় রাজসিক রঙীন লাল চশ্‌মার দ্বারা হিন্দুর সত্বশুভ্র কার্য্যকলাপ ও রীতি-নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বরূপের পরিবর্ত্তে বৈরূপ্যই প্রতিভাত হইবে। যতগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে, সকলগুলিই যেন জোড়া-তাড়া দেওয়া। অনেক অসম্বদ্ধ ঘটনাবলীকে প্রতীচ্যস্বভাবসুলভ কল্পনাডোরে জোর করিয়া কার্য্যকারণভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে। যখন আমাদের ইতিবৃত্তের এইরূপ দুরবস্থা, তখন ভারতের অধঃপতনবিবরণী যথাযথ লিখিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এই প্রবন্ধে দুই-একটা কথার অবতারণা করা যাইবে, যাহা ভবিষ্যতে তথ্যনিরূপণকার্য্যে লাগিতে পারে।

য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মবিপ্লবের পর হইতে অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, পূর্ব্বতন মত বা প্রথার বিরুদ্ধে যত সংগ্রাম ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তাহা সকলই ন্যায্য ও বীরোচিত। 'বিদ্রোহ' শব্দটি তাহাদিগকে একেবারে মাতোয়ারা করে। এই য়ুরোপীয় বিদ্রোহিদল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ঘোর বিরোধী; ইঁহাদের দৃষ্টিতে বেদবিপ্লাবী বৌদ্ধমত অত্যন্ত উচ্চ; কেন না, ইহা পুরাতনকে ভাঙ্গিয়াছে। ক্রমভঙ্গপ্রবণ য়ুরোপীয় বিবেক বেদবিহিত বর্ণধর্ম্মকে মানবকুলের বৈরী বলিয়া ঘৃণা করে, বেদান্তের নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ও মায়াবাদকে পরিহাস

করে, কিন্তু নাস্তিকবৌদ্ধমার্গকে স্বর্গে তোলে। এই বিদ্রোহবিকৃত দৃষ্টিই আমাদের পুরাতন ইতিহাসে অলীকতার আরোপ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মই হিন্দুস্থানের অধঃপতনের মূল কারণ—এই ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্তে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৌদ্ধদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারত কি অন্ধকারময় ছিল না এবং তাহাদিগের তিরোভাবে ভারত কি আবার অজ্ঞানতমিস্রায় আচ্ছাদিত হয় না? ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য ঠিক বটে, কিন্তু তাহারা কার্য্যকারণশৃঙ্খলায় সংবদ্ধ নহে।

হিন্দুত্ব দুইভাগে বিভক্ত;—ধর্ম্ম এবং জ্ঞান। ধর্ম্ম ব্যবহারিক; ইহা বিধিনিষেধব্যবস্থাপক। জ্ঞান পারমার্থিক; ইহা চিরপরিনিষ্ঠিত নিত্যবস্তুর পরিচায়ক। বেদ ও সংহিতা ধর্ম্মের আধার। বেদান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধর্ম্মজ্ঞানবিরহিত হইলে সমাজ ক্ষীণপ্রাণ ও অধোগামী হয়; বাহ্যাড়ম্বর ভাবকে মারিয়া ফেলে; স্থূল সূক্ষ্মের উপর আধিপত্য করে; জড়প্রকৃতি চিদাত্মাকে পদদলিত করে। দুর্দ্দমকালপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জ্ঞানচ্যুতি ঘটিয়াছিল; যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াছিল। জ্ঞানের আদর্শ—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা—যাহাতে কর্ম্মের বন্ধন ঘুচিয়া যায়। এই মহান্ আদর্শে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় হয়। কিন্তু এই আদর্শভ্রষ্ট হইলে কর্ম্মচক্রের পেষণে পিষ্ট হইতে হয়। ফলসম্ভোগও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। বুদ্ধের আবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে হিন্দুসন্তানেরা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গের এষণাতে মুগ্ধ হইয়া মোক্ষবিমুখ হইয়াছিল। পরমার্থবিয়োজিত রসবিবর্জ্জিত সকামবেদবাদরতি তাঁহাদিগকে তেজোহীন করিয়াছিল। এই হীনতার কারণ কি? য়ুরোপীয়েরা বলিবেন—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। যত দোষ নন্দঘোষ। অন্ধকারে ঢিল মারিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। যে আদর্শের কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহা অনিন্দনীয়। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে প্রবৃত্তির বহ্নিকে নির্বাপিত করিয়া অদ্বৈতশান্তিসাগরে দ্বৈতকে নিঃশেষ করাই

সমগ্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যদি লক্ষ্য এত বড়, তবে লোকে ইহা ছাড়ে কেন? অবিদ্যাপ্রসূত কর্ম্মনিয়ন্ত্রিত কালকে জিজ্ঞাসা কর। এই প্রবন্ধবহুলভাবে স্থিতির ভঙ্গ আছেই আছে। সংসারে থাকিয়া কালকে এড়াইয়া কতদিন থাকা যায়। যত বড়ই সমাজ হউক না কেন, কালবশে তাহা নিস্তেজ অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। আর্য্যসন্তানেরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কালের তরঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া অনন্তের দিকে অনগ্রসর হইয়াছিল। এই উদ্যমের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ বলিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ নহে, কিন্তু কর্ম্মফলবিমুখ। তাহারা কর্ম্মকে ভালবাসে, কিন্তু কর্ম্মসঞ্চিত ঐশ্বর্য্যকে পরিবর্জ্জন করে। কোন্ দেশে বিশাম্পতি চক্রবর্ত্তী রাজা রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্যে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিতেন? কর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যা-ই জয়লাভ হইত বিত্ত সঞ্চিত হইত, বিনা সংসারচেষ্টায় ফলভোগের সময় আসিত, অমনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আর্য্যগৃহস্থ বনে প্রয়াণ করিত। এই ত যথার্থ কর্ম্মানুরাগ। কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পিতৃ-পিতামহাগত ঐশ্বর্য্যের উপর আপনার সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইত, তাহা হইলে সেই কাপুরুষ লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হইত। অন্যান্য দেশে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কর্ম্মগত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মের উপরে পদমর্য্যাদা আলম্বিত ছিল। এ কথা সত্য বটে যে, ফলকামনা ত্যাগ করিলে উদ্যমের উষ্ণতা কমিয়া যায়। অহেতুক প্রেম কিছু শান্ত-দান্ত হয়। অলঙ্কারের জন্য পতিকে ভাল বাসিলে প্রেমের আলোড়নটা অধিক হয় বটে, কিন্তু মঙ্গলভাবপ্রণোদিত প্রণয় স্থির ও গম্ভীর হইয়া থাকে। আমাদের কর্ম্মানুরাগ অহেতুক তাই আমরা স্থিত ও শান্তিপ্রিয়। আর যাহারা ঐশ্বর্য্যের জন্য কর্ম্মকে ভালবাসে, তাহাদের উদ্যমের জ্বালায় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ক্ষুব্ধ ও প্রপীড়িত। আমরা

কর্ম্মকেই ভালবাসি। ভালবাসিয়া তাহাকে জয় করিব। যে স্থিরতা ও শান্তিতে কর্ম্মবন্ধ টুটিয়া যায়, তাহাই অবলম্বনীয়। ঐশ্বর্য্যবাসনাসম্ভূত দুর্দ্দান্ত প্রতাপে আমাদের কাজ নাই।

উপরি-দর্শিত হিন্দু-প্রকৃতি, প্রতীচ্য সজ্জনেরা বুঝেন না বলিয়াই বেদ-বেদান্তের উপর তাদের এত রোষ; গভীরভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, নিষ্কাম কর্ম্মেই হিন্দুজাতির মহত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়ে নহে। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মসাধন, বিত্তত্যাগপূর্ব্বক কুলগত কর্ম্মরক্ষা, বার্দ্ধক্যে বনপ্রয়াণ, দুর্ব্বল মানবের পক্ষে সহজ নহে। তত্রাচ আর্য্যসন্তানগণ ভীত হয় নাই;—প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই ফলত্যাগের ফল কি হইয়াছে? বেদান্ত-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানববুদ্ধি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরমসীমা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কাল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। ধীরে ধীরে অসীম চেষ্টার ভিতরে অবসাদ আনিয়াছিল। অবসাদগ্রস্ত হিন্দুসন্তান উচ্চজ্ঞানের পথে আর চলিতে পারেন নাই। অবশেষে কালের জয় হইয়াছিল।

বেদান্তের নিষ্কামধর্ম্ম ও নিগুর্ণব্রহ্মজ্ঞান যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহার অন্য এক কারণ আছে। কালক্রমে আর্য্যে ও অনার্য্যে, দ্বিজে (আর্য্য) ও শূদ্রে সংমিশ্রণ হইয়া বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইয়াছিল; আর্য্যরক্ত দূষিত হইয়াছিল। বর্ণধর্ম্ম ভিন্নকে অভিন্ন করে। প্রথমে দুই এর মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া দেয়; পরে তাহারা যেমন সম্মেলনের অনুকূল অবস্থা লাভ করে, অমনি ব্যবধানটি তুলিয়া দেয়। প্রথমে দ্বিজে ও শূদ্রে কঠোর প্রভেদ ছিল। ক্রমশঃ তাহারা মিলিয়া গেল; কিন্তু এই মিলনে ভালই হইল, মন্দও হইল। বর্ণসঙ্করগুলি নিষ্কামধর্ম্মের মর্ম্ম তত বুঝিতে পারিল না। আর্য্যসমাজ নিবৃত্তির অনুশাসনে শাসিত ছিল। এই অনুশাসন অভ্যাগতদিগের একটা বোঝা বলিয়া মনে হইত। তাহারা মিশিয়াছিল বটে, কিন্তু আর্য্যনীতির অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিতে পারে নাই। এই আগন্তুক অজ্ঞ নিবৃত্তিবিরোধী সঙ্কর-জাতিসকল আর্য্যসমাজের বক্ষে একটা গুরুভারের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই উন্নতির পথ শীঘ্র শীঘ্র রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদারতাই আর্য্যজাতির পতনের কারণ। অনুদার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের জন্য হিন্দুজাতি হীন হইয়া গিয়াছে—এইরূপ নিন্দা কাল্পনিক। আর্য্যেরা যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা আছে কিনা, সন্দেহ। এমন সাদায়-কালোয় মিলন আর কোথাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

যখন হিন্দুজাতি সংসারসংগ্রামে অবসন্ন হইয়াছিল,—বিষমসম্মেলনে ক্ষীণচেষ্ট হইয়াছিল,—লক্ষ্যবিহীন হইয়া কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, তখন বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। তিনি কর্ম্মচক্র হইতে সংসারকে রক্ষা করিবার সংবাদ ঘোষণা করিলেন। ভেদবাদী বৈদিকধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মৈত্রী স্থাপন করিতে, ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর দূর করিয়া মনুষ্যজাতিকে যথার্থ ধর্ম্মভাবাপন্ন করিতে, কল্পনাপ্রসূত বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানের স্থানে ব্যক্তিগতসাধনাসম্ভূত নির্ব্বাণশান্তি দান করিতে, বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই সংবাদ গুরুভারগ্রস্ত আর্য্য-জাতির অতি মিষ্ট লাগিয়াছিল। জ্ঞানহীন কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদিগের প্রতিবাদ যে ন্যায়সঙ্গত, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহারা প্রাচীর ভাঙিতে গিয়া অন্তঃপুর ভাঙিয়া ফেলিল। ভেদভাব দূর করিতে গিয়া হিন্দুর সার ধন আস্তিক্যবুদ্ধি ও বর্ণধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিল। তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে "বৈনাশিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈনাশিক-বৌদ্ধবিদ্রোহ অবসাদের শীতলতাকে উষ্ণ করিয়া তুলিল। বিশেষত নিম্নস্তরস্থ সঙ্করজাতিরা মৈত্রীতত্ত্বসংবাদটি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিল। তাহাদের শূদ্রত্ব গিয়াছিল বটে, কিন্তু যথার্থ আর্য্যত্ব লাভ হয় নাই। তজ্জন্য আর্য্যসংহিতাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে তাহাদের আগ্রহাতিশয্য হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বিশুদ্ধবর্ণ

আর্য্যেরাও অনেক পরিমাণে বিচলিত হইলেন। অবসাদের আবল্যে প্রপীড়িত হইলে পুরাতনের উপর কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মে, কেমন একটা নূতন পন্থার জন্য প্রাণটা কেমন করে। তাই তেজোহীন আর্য্যরাও বৌদ্ধমত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের আর একটা বিশেষ কারণ আছে। বৌদ্ধদিগের বৈনাশিকতা ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিল। বুদ্ধ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া উপাসিত হইতে লাগিলেন। শ্রমণেরা আচার্য্য হইয়া বসিলেন—সংহিতার পরিবর্ত্তে ধম্মপদ প্রতিষ্ঠিত হইল। শঙ্খঘণ্টাধূপদীপসমন্বিত গৈরিকবাসাবৃত শূন্যবাদ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিল। হিন্দুরা ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মের আকার দেখিয়া ভুলিয়া গেল। আর সেই যোগীবাঞ্ছিত নির্ব্বাণমুক্তির কথা কোন্ হিন্দুকে মুগ্ধ না করে? কিন্তু নির্ব্বাণমুক্তির ভিতর হইতে যে শুদ্ধাদ্বৈতরস ব্রহ্মজ্ঞান ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা আর্য্যেরা বুঝিতে পারেন নাই। না বুঝিয়া বাগ্‌জালে জড়িত হইয়াছিলেন। য়ুরোপের বৈনাশিকতা (Nihilism) ভারতে কখনই স্থান পাইতে পারে না। ইহা আসুরিক ভাবে পরিপূর্ণ। ইহা ধর্ম্মকে পদদলিত করে, ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। বৌদ্ধবাদ নাস্তিকতা হইলেও ধর্ম্মের আকারে আসিয়াছিল বলিয়া গ্রহণীয় হইয়াছিল।

যদি বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকতার পরিপোষক তবে ভারত কেমন করিয়া বৌদ্ধপ্রভাবে জাতীয় মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল। মগধরাজ্যের মহিমা দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়? রাজনীতির পরিপুষ্টি, বাণিজ্যের বৃদ্ধি, সমুদ্র পার হইয়া বিদেশযাত্রা, আরোগ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়স্থাপন, শিল্পবিজ্ঞানে উন্নতি, বৌদ্ধভারতেই হইয়াছিল। নাস্তিকতার কি এত শুভ বল আছে?

সুবিচারদৃষ্টির সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাস্তিকতার বা উচ্ছৃঙ্খলতার শুভ বল নাই—মঙ্গলকারিতা নাই, কিন্তু

একটা রাজসিক তেজ—উদ্দাম চেষ্টা আছে ;—যাহার নিকট আস্তিক্য-বুদ্ধিজনিত ধর্ম্ম বিধিনিয়মিত স্থির গম্ভীর মঙ্গলভাব পার্থিব ব্যবহারে হার মানিয়া যায়। গৃহত্যাগী স্বেচ্ছাচালিত বিধিবহির্ভূত বালক গুরুজনবশগ বালকের অপেক্ষা সাহসে, উদ্যমে, ক্ষিপ্রকারিতায়, বিঘ্ন-বাধাজয়ে ব্যবহার পটুতায়, নানাগুণদক্ষতায় নিশ্চয়ই গরীয়ান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কর্ম্মকুশলতার আতিশয্য, বুদ্ধিকে স্থূল ও পাশব করিয়া ফেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানকে নাশ করে। আর কুলশীলবান্ বালক অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠে ও অবশেষে সুদৃঢ় আত্মস্থিতি লাভ করে। স্বৈরিণী শক্তির মধ্যে বিনাশবিষ নিবিষ্ট থাকে। তাই তাহার মত্ততা ও আস্ফালন অধিক। কিন্তু আস্ফালন মরিবার জন্য। সুনিয়মিত শক্তির ঘটা ও আড়ম্বর অল্প, কিন্তু স্থায়িত্ব অমর। আজ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। কোথায় বা সেই মগধরাজ্য, কোথায় বা ধম্মপদ ও ত্রিপিটক!—সব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু নিপীড়িত, অবসন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার জাগিয়া উঠিয়া আপনার প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছে। যেরূপ শীতপ্রধান দেশে তুষারগর্ভে পুষ্পলতার বীজসকল হিমের অত্যাচার হইতে রক্ষিত থাকে ও বসন্তসমাগমে পুনরঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর্য্যপ্রকৃতিগর্ভে রক্ষিত হইয়াছিল। শঙ্করপ্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের আহ্বানে আবার জাগরিত হইয়াছে।

জাগরিত হইল বটে, কিন্তু সে পুরাতন তেজ ফিরিয়া আসিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যজাতির ঊর্দ্ধদৃষ্টিকে নীচগামী করিয়া দিয়াছিল। শূন্যবাদের কচ্‌কচিতে উপনিষদের গভীর জ্ঞান একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছিল। হিন্দুর নিবৃত্তির দিকে আর মন ছিল না। আস্তিক্যবুদ্ধি-বিরহিত হইয়া আর্য্যসন্তানেরা প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য যখন তাঁহার বেদান্তের ভেরী বাজাইলেন, তখন মৃতকল্প ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সঞ্জীবিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণশক্তির সঞ্চার হইল না। হিন্দুসমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অসাড় হইয়াছিল। জীবন প্রবাহ বহিল, কিন্তু অতি ক্ষীণধারে। বেদান্তের জ্ঞান পুনরুদ্ধৃত হইল, কিন্তু

জনসাধারণে তাহা বুঝিল না। বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুর চরিত্রকে এত কলঙ্কিত করিয়াছিল যে, কামনাবিবর্জিত সাধন তাহাদের নিকট অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। নিবৃত্তিমার্গ আর তাহাদের ভাল লাগিল না। শত শত সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তিমার্গ দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হিন্দুরাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর একতা রহিল না। যখন জ্ঞানে ঐক্য নাই, লক্ষ্যে ঐক্য নাই, তখন ব্যবহারে কিরূপে থাকিতে পারে? ঐক্যবিহীন হইয়া যবনদিগের পদানত হইতে হইল।

রাজনৈতিক অনৈক্য অপেক্ষা পারমার্থিক অনৈক্য হিন্দুজাতিকে অধিকতর হীন করিয়াছে। আর্য্যমাত্রেরই বেদাধ্যয়নের অধিকার ছিল। সকলেই একমেবাদ্বিতীয়ের তত্ত্ব শিক্ষা করিত। বেদগাথা গাহিত, উপনিষদের মন্ত্র অভ্যাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে সংসারের কর্ম্মে, ব্যবহারে, পদমর্য্যাদায় প্রভেদ ছিল, কিন্তু পরমার্থবিষয়ে সমানাধিকার ছিল। পিতার সহিত সকল সন্তানেরই—জ্ঞানী বা অজ্ঞানীর, সুশ্রী বা বিশ্রীর, ধনী বা দরিদ্রের—তুল্য সম্বন্ধ। পুত্র অজ্ঞানী বলিয়া ভৃত্য বা কোন ইতর পুরুষকে পিতৃত্বে বরণ করে না; পিতাকেই পিতা বলে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, ঋষিবংশসম্ভূত নবীন হিন্দু উপনিষদের সরল-গম্ভীর তত্ত্ব আর বুঝিতে পারে না। কেবল জনকতক লোকে বুঝে। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। আর যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নূতন প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্রোহভয়ে অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়াছিলেন। অজ্ঞজনের হস্তে বেদরূপ খনিত্র দেন নাই, পাছে আবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় ধর্ম্মের মূল খুঁড়িয়া ফেলে। এই ব্যবস্থার ফল বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক ভেদবাদী ও প্রবৃত্তিমার্গের উপাসক হইয়া যাইতেছে। যতদিন না আর্য্যসন্তানেরা পূর্ব্বের ন্যায় পরমার্থবিষয়ে এক হয়, ততদিন ভারত অধোগামী থাকিবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ

তিনটি—(১) অহৈতুককর্ম্মজন্য নৈসর্গিক অবসাদ; (২) আর্য্যানার্য্যের অত্যুদার সম্মেলন; (৩) বৌদ্ধবিদ্রোহ। য়ুরোপীয়েরা ঠিক ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুজাতির কর্ম্মবৈমুখ্য, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুদারতা ও বৈদিক আশ্রমধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব—এই তিন কারণে ভারতবর্ষ পতিত হইয়াছে। এই বিদেশীয় সিদ্ধান্ত আমাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে। আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, আমরা কর্ম্মবিমুখ। তজ্জন্য আমরা আর্য্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য আদর্শ গ্রহণে উৎসুক হইয়াছি। সঞ্চয়ের জন্য কর্ম্ম না করিলে বিজিগীষা (Competition) হয় না; আর বিজিগীষা না হইলে হুড়োহুড়ি, মারামারি, কাটাকাটি হয় না,—কর্ম্মের ভূমি প্রসারিত হয় না,—ঐশ্বর্য্যলাভ হয় না। বেদবিহিত আশ্রমধর্ম্মে বিজিগীষার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, অতএব বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া বর্ণধর্ম্মকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও। এই ভয়ানক ম্লেচ্ছভাব আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়াছে। বৌদ্ধবিদ্রোহে হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; এইবারকার বিদ্রোহে হিন্দুজাতি একেবারে বিনষ্ট না হয়। এই ঘোর সঙ্কটে আর্য্য আদর্শ পুনরুদ্ধৃত না করিলে নিশ্চয়ই কালকবলে পড়িতে হইবে। আশ্রমধর্ম্ম সেই আদর্শে গঠিত। কুলগত কর্ম্ম ও সঞ্চয়ে অনাসক্তি, বর্ণধর্ম্মপালনে পরিপুষ্ট হয়। বর্ণধর্ম্মভঙ্গেই জাতীয় হীনতা আসিয়াছে। যতদিন হিন্দুসন্তান আশ্রমী হইয়া কর্ম্মফললিপ্সা পরিবর্জ্জন করিয়া কর্ম্মনিষ্ঠ না হয়, ততদিন ভারতের উত্থান দুরাশামাত্র। আশা করা যায় যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই একটা চিরপ্রচলিত ঐতিহাসিক ভ্রম দূর হইতে পারে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিলেই ভ্রাতৃভাবাপন্ন নব্য সভ্যেরা নাসিকাগ্র আকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। আজকাল জাতিভেদ-সমর্থন চেষ্টা অঙ্গলীভূত (anglicised) হিন্দুর নিকট ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদবিহিত বর্ণধর্ম্ম এক্ষণে হাস্যপরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

ইদানীন্তন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব রায়মহাশয়ের বংশদণ্ডবিপণীই উপজীবিকা। কিন্তু পংক্তিভোজনকালে তিনি তাঁহার বংশমর্য্যাদারক্ষণে অতিশয় পটু। লক্ষপতি বসুজাই হউন, আর বেদান্তজ্ঞ দত্তজাই আসুন—সাধ্য কি যে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সপিষ্টক কদলী-পত্র অধিকার করেন। অর্থ বা বিদ্যার বলে বংশদণ্ডপ্রহারবেদনার অতীত হওয়া যায় না। আহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কি প্রভাব!

স্থূলকায় স্বেদস্রাবী হস্তিমূর্খ—মারিলে কোঁক করে না, পাছে "ক" উচ্চারণ হয়—ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভক্ষণে বর্ণধর্ম্ম সম্মানিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু গৌরতনু শুভ্রবাসা সুবিদ্বান্ অংগলদেশবাসীর সহিত একটু শ্যামপর্ণিরস (চা) পান করিলে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়।

এই ত তোমার বর্ণধর্ম্ম। ধিক্ হিন্দুত্বকে, যাহা এই বিষমবাদ পোষণ করে।

সাম্যবাদী সভ্যদলের এইরূপ নিন্দাবাদ সাদরে স্বীকার করি। স্বীকার করি বলিয়াই সাহসের সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, বংশদণ্ডব্যবসায়ী রায়মহাশয় ও হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণবর ও নব্য হিন্দুসন্তান—তিনজনে মিলিয়া মিশিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মনাশে বদ্ধপরিকর হওয়াতে ভারতের পুনরভ্যুত্থান একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমি গত বৈশাখমাসে—হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা—এতচ্ছীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা হিন্দুত্বের ভিত্তি। একনিষ্ঠতা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সমষ্টির

ভিতর দিয়া ব্যষ্টিকে দেখা—একের গর্ভে বহুত্বের সমাধান করাই একনিষ্ঠতা। কিন্তু কি প্রকারে এই একনিষ্ঠতা বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়াছিল, তাহাই এই প্রবন্ধে পর্য্যালোচিত হইবে।

কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে গেলে অল্পসল্প ধৈর্য্যের প্রয়োজন। তবে ধৈর্য্যেরও ত সীমা আছে। য়ুরোপীয় বেশধারী কালা বাঙালী প্রকৃতপক্ষে সাহেব হইতে পারে কি না, অথবা দাঁড়কাক ময়ূর হইতে পারে কি না—এবম্প্রকার প্রশ্ন কেহ যদি উত্থাপন করে তাহা হইলে প্রশ্নকারীকে সাহেবী-ভাষায় দুই-একটা গালি না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেইরূপ বর্ণধর্ম্মকে ঘষিয়া মাজিয়া খাড়া করা যায় কি না, আর কালাকে সাদা করা যায় কি না—এ দুই একই কথা। জাতিভেদটা আগাগোড়া অত্যাচারে ভরা। অত্যাচারে ইহার জন্ম, অত্যাচারে ইহার পূর্ত্তি। মনুস্মৃতি যতদিন থাকিবে ততদিন ভ্রাতৃবিদ্বেষজনিত বৈষম্যের ছবি হিন্দুধর্ম্মকে কলঙ্কিত করবে। শূদ্রকে পশুর অপেক্ষা নীচ করা, আর ব্রাহ্মণকে দেবতার অপেক্ষা বাড়ান—ইহাই ত বর্ণধর্ম্মের সারতত্ত্ব। বড় বড় য়ুরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও দিগ্‌গজ দেশী সংস্কারকেরা যাহার অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার বিপক্ষে বলিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এতটা যখন অধীরতা, তখন পর্য্যালোচনা চলা বড় শক্ত কথা। তজ্জন্য প্রথমে ধৈর্য্যের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

শূদ্রজাতিবিদ্বেষী বলিয়া যে বর্ণধর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহা অমূলক। পুরাকালে কৃষ্ণকায় কাষ্ঠপ্রস্তরভূতপ্রেতাদিপূজক অনার্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত। তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে পাছে আর্য্যরক্ত দূষিত হয় ও সঙ্করজাতির উৎপত্তি হয় ও বেদধর্ম্মের বিঘ্ন হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে দূরে দূরে রাখিতে হইয়াছিল। কোন উচ্চজাতির সহিত বিরুদ্ধধর্ম্ম ও নীচজাতির সহসা সম্মেলনে ক্রমোন্নতির পথ বন্ধ হইয়া

যায়। গরীয়ান্ অংশ লঘু হইয়া পড়ে ও লঘীয়ানেরও স্বাভাবিক তেজ অবসন্ন হইয়া যায়। সঙ্করসৃষ্টিবিভ্রাট নিবারণের জন্যই সংহিতাকারেরা শূদ্রজাতিসংস্পৃষ্ট অন্নপানীয় পর্য্যন্ত পরিহর্ত্তব্য বলিয়া বিধি দিয়াছেন। আমাদের স্বভাব এই যে, যাহাদের সহিত আমাদের আহারপান, তাহাদের সহিত আমাদের আদান প্রদান হইয়া থাকে। আমাদের নিকট আহারসংসর্গ সামাজিক সমতার পরিচায়ক। এই প্রাচ্য সহৃদয়তার বেগ বিধিনিষেধাদি দ্বারা সুনিয়ত হওয়াতে, আর্য্যজাতির বর্ণ ও ধর্ম্ম ও শুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছিল। যদি দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের সহিত আচার ব্যবহার সুদৃঢ়রূপে বিধিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের যেটুকু আর্য্যত্ব অবশিষ্ট আছে, তাহাও থাকিত না। বীরপ্রসূ রাজপুতানা আজ চেপ্টা নাক আর পিঙ্গলাক্ষিতে ভরিয়া যাইত। কমলমুখী হিন্দুরমণীর স্থানে টিপ্‌কপালী ও উনানমুখীরা কাব্যকানন শোভিত করিতেন। ইহুদি-বিধিপ্রবর্ত্তক মূশা অনীশ্বরো-পাসক ইতরজাতিগণকে যত কঠোররূপে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছেন মন্বাদি সংহিতাকারগণ বোধ হয় তত কঠোরতার পরিচয় দেন নাই। সাধারণতন্ত্র সভ্য মার্কিনদেশে শ্বেতচর্ম্ম কৃষ্ণচর্ম্মে এখনও যে কঠিন ব্যবধান আছে, পুরাকালে আর্য্যে ও অনার্য্যে তত প্রভেদ ছিল কিনা সন্দেহ। এরূপ সামাজিক ব্যবধান ত অনেক সময়ে মঙ্গলপ্রদ। মেলনপ্রবৃত্তি যদি স্বৈরিণী হয়, আর কোন প্রকার বিধি না মানে, তাহা হইলে ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা চলিয়া যায়। অংগলদেশে সেদিন যে নবঘনশ্যাম স্থূলোষ্ঠ কাফ্রিরাজকুমার শ্রীমান লবঙ্গুলকে পূর্ণচন্দ্রপ্রভা বিম্বোষ্ঠা ইংরেজ-কুলোদ্ভবা কোন শ্রীমতী বরণ করিবেন বলিয়া ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কি বিশেষ নিন্দার বিষয়? আজ যদি ইংরেজরা এইরূপ বিবাহের প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহাদের জাতীয় হীনতা ও বিকৃতি কি হইবে না? বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানত বর্ণসঙ্করসৃষ্টিভয়েই এই আর্য্যানার্য্যের মধ্যে আহারপানাদিসম্বন্ধীয় ব্যবহারগত ভেদ করিয়া

দেওয়া হইয়াছিল। পরমার্থহানিরও ভয় ছিল। কেন না, অনার্য্যেরা সংস্কারহীন প্রবৃত্তিপ্রণোদিত মার্গের উপাসক ছিল। যেমন আধুনিক মার্জ্জিতমতাবলম্বীরা কুসংস্কারবশতাপন্ন পরিবারে কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হন, তদ্রূপ আর্য্যেরাও পারলৌকিক ইষ্টহানির ভয়ে শূদ্রগণের সহিত আদানপ্রদান করিতেন না।

কিন্তু এই ভেদজন্য কঠোরতা ক্রমশঃ শ্লথ হইয়াছিল। যেমন অনার্য্যেরা আর্য্যসহবাসে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল, তেমনি তাহাদের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতা বাড়িতে লাগিল। মনুর বিধি-অনুসারে—যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে তাহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করিয়াছে তাহারও অন্ন ভোজন করা যায় (মনুসংহিতা—৪, ২৫৩)। দাস, গোপালক, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত এক জমিতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়), নাপিত এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য (যাজ্ঞবল্ক্য—১৬৫)। পরাশরসংহিতাতেও একাদশ অধ্যায়ে শূদ্রের অন্ন ভোজ্য এইরূপ বিধি আছে। শূদ্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মণসংহিতায় যে অনুদারতা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক। য়ুরোপীয়ের নিকট কালো রংই শূদ্রবর্ণ। আমাদের বর্ণধর্ম্মবিদ্বেষী ভ্রাতৃভাবাপন্ন সংস্কারকদের দল থেকে খুব কালো কালো জনকতক বাছাই করিয়া যদি একটা একটা বিলাতে উপনিবেশ (colony) স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সাহেব-মহোদয়দিগকে আগন্তুক ভ্রাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাস রোধ করিবার জন্য দুই চার খানি মনুসংহিতা অপেক্ষা কড়াকড়ি শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে হয়। তখন আমাদের সংস্কারকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, সাহেবদের বাচনিক ভ্রাতৃভাবের চোটে হিন্দুজাতির হীনতা স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষদিগের নামটা ডুবান বড় ভাল কাজ হয় নাই।

আরও দেখা যায় যে, এই আহারপাননিষেধ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মুসলমানের জল পর্য্যন্ত ছুঁইতে নাই—এইরূপ কঠোর বিধি যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটা জাতিবিভ্রাট ঘটিয়া যাইত। শনি যেমন স্নানের জলের ছুতা করিয়া শ্রীবৎস রাজাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তেমনি মুসলমানেরা পানীয় জলের ছুতা করিয়া তাহাদের হিন্দুরমণীপরিণয়লিপ্সা চরিতার্থ করিয়া ফেলিত। আগেই বলা হইয়াছে যে, অন্নভোজন আমাদের কাছে সামাজিক নৈকট্য অথবা মিলনের প্রবর্ত্তক ও পরিচারক; সাহেবদের নিকট তাহা নহে। তাহারা তাহাদের জুতাবরদারদের হাতে খাইতে পারে। আমাদের নেতারা তাই গোড়া মারিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমানের সব লওয়া হইল—পোষাক, ব্যবহার, বিদ্যা, রীতিনীতি, কিন্তু জলটা বন্ধ। এই কঠোরতা আমাদিগকে বাঁচাইয়াছে। আজকাল আবার য়ুরোপের প্রভাব। এখন আমাদের কেহ নেতা নাই। তাই সাহেবি খানা খাইবার বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয়েরা বড় গর্ব্বিত জাতি, তজ্জন্য আমাদের বড় একটা গ্রাহ্য করে না। আমাদের সভ্যদলের তাহাদের উপর যেরূপ টান, তদ্রূপ যদি তাহাদের আমাদের প্রতি টান হইত, তাহা হইলে আজ কত শত শ্রীমতী হেমলতা ও মৃণালিনী, মিসেস্ ফক্স্ (Mrs. Fox) ও মিসেস্ হগ (Mrs. Hogg) হইয়া যাইত, আর দেশটা জবরজঙ্গী জাত্ ফিরিঙ্গিতে ভরিয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপীয়েরা একলষেঁড়ে, তাই রক্ষা। কিন্তু কি জানি কোন্ দিন বা তাহাদের ভ্রাতৃপ্রেমের উদয় হয়। তাই আগে থাকিতে পঞ্চগব্যের ভয় দেখাইয়া খানাটা বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়।

এইত গেল আর্য্যানার্য্যের ভেদবৃত্তান্ত। মিলনে উন্নতি হয়, কিন্তু মিলন ঘটিবার পূর্ব্বে মেলনীয় বস্তুর কতকটা পরিপুষ্টি আবশ্যক। সেই পরিপুষ্টির জন্য ভেদব্যবধানের প্রয়োজন হয়। একথাটা সত্য বটে। কিন্তু বংশগণ্ডব্যবসায়ী আর মহাশয়কে বা

হস্তীমূর্খ ব্রাহ্মণসন্তানকে যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়, তাহা কি ঘোর অন্যায় নহে? ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই হইল। তাহার কর্ম্ম দেখিবার আবশ্যক নাই, জন্ম দেখিলেই হইবে। ইহা কে অস্বীকার করিবে যে, জন্মগত মর্য্যাদাই বর্ণভেদের মূল? এই অসঙ্গত অন্যায্য প্রথা যে মানব সমাজে কখন চলিয়াছে বা চলিতে পারে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইরূপে বর্ণভেদ-বিধি কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিলে ভাল হয় না?

স্থিরোভব ঃ

সকল সংহিতার এই বিধি যে, কর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই বর্ণমর্য্যাদা নষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন—চোর, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূন্য প্রতিমা-পরিচারক দেবল, মাংসবিক্রয়ী, বাণিজ্যজীবী, রাজভৃত্য, কুসীদজীবী, পশুপালক, মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টিকর্ত্তা, নিষ্ঠুরভাষী, সোমলতাবিক্রয়ী, ও মদ্যপ প্রভৃতি আচারহীন ও উন্মার্গগামী ব্রাহ্মণগণকে দৈব ও পৈত্র উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবে। (মনুসংহিতা—৩,১৫০ হইতে ১৮৩)। পরাশরসংহিতানুসারে উপাসনাবর্জ্জিত বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণকে বৃষল বলে। আর্য্যসন্তানদিগের নিকট কুলগত কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা অধিকতর কাপুরুষতা আর কিছুই ছিল না। কোন দ্বিজ যদি কৌলিক ধর্ম্মকর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া উপায়ান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিত না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ—এই বাক্য শ্রবণ করিলে কোন্ হিন্দুর শোণিতপ্রবাহ খরতর না বহিতে থাকে? বর্ণধর্ম কর্মকে অবহেলা করিয়া মর্য্যাদাকে কেবল কুলেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠা কেবল কুলগত ছিল, কর্মগত ছিল না, এরূপ মত ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি কর্ম ছাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা হইতে পারে না, তবে কেবল গুণ বা প্রবৃত্তি বা নৈসর্গিক পটুতা দেখিয়া কর্ম-

বিভাগ কেন করা হয় নাই? কর্মকে কেন কুলানুযায়ী করা হইয়াছিল? কুলের গুণদড়ি দিয়া গুণকে বাঁধিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? এই বাঁধা-বাঁধিতেই আর্য্যদিগের প্রতিভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুলগত কর্মরক্ষাতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে!—এই অপবাদ সত্য নহে। বেগবতি স্বৈরগতি কর্মনদীকে কুল দিয়া বাঁধিয়া রাখাতে ভারত ডুবিয়া যায় নাই, কিন্তু সমৃদ্ধিশালীই হইয়াছিল। বরং কুলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে ভারতের শ্রী ভাসিয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মকে কেন কুলগত করা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

হিন্দুত্বের ভিত্তি একনিষ্ঠতা। হিন্দুর চিন্তা-প্রণালী, হিন্দুর দর্শন, বেদ, বেদান্ত স্মৃতি, সংহিতা পুরাণ—সমস্তই একমুখীন। বস্তু একই, দুই নহে। একই বহুরূপে প্রতিভাত হয়—ইহাই হিন্দুদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমগ্র বেদগাথায় একেরই মহিমা বর্ণিত আছে। অগ্নির দেবতা অগ্নি, বায়ুর দেবতা বায়ু, সূর্য্যের দেবতা সূর্য্য। কর্ত্তাই কার্য্যরূপে প্রতিবিম্বিত, স্রষ্টাই সৃষ্টিরূপে প্রতিফলিত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, দাতা, গ্রহীতা ও দান—এই তিনের পারমার্থিক একত্ব বেদমন্ত্রে আভাষিত হইয়াছিল, আর বেদান্তের আনন্দ-জ্যোতিঃতে বিলীন হইয়া ব্যবহারিক ত্রিত্ব-সমূহ বস্তু-ঘটিত একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আজকাল য়ুরোপীয় বিদ্যা শিখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কাজ করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হিন্দুর পরম আদর্শ। প্রতিষ্ঠা,—স্থিতি,—টিঁকিয়া থাকাই, অস্থির স্বরূপ। প্রতিষ্ঠার অভাবে,—স্থিতির অপূর্ণতা-পূরণে,—টিঁকিয়া থাকার বিঘ্ন-অপসারণে, কর্ম বা চেষ্টা বা সাধনার উদ্ভব হয়। কার্য্য অভাবসূচক, অপূর্ণতার পরিচায়ক। যেখানে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা,—যেখানে আত্মস্থিতি, সেখানে কার্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন—অস্তিত্ব কি তবে স্বার্থেই

পূর্ণতা লাভ করে? প্রেমহীনতায় কি অস্তিত্বের চরম বিকাশ? যদি প্রেম ছট্‌ফট্‌ করাতেই হয়,—শান্তিতে না হয়, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে হয়,—মিলনের পর্য্যাপ্তিতে না হয়, তবে প্রেমের অভাবই অস্তিত্বের সার। আর যদি ভিন্নতাকে একতার মধ্যে সমাহিত করিয়া স্থিতির নাম প্রেম হয়, তাহা হইলে অস্তিত্ব প্রেমময়, শিবময়, আনন্দময়। বাসনার বহ্নিকে প্রশমিত করিয়া, চেষ্টাকে পূর্ণস্থিতিতে পরিণত করিয়া, দ্বৈতকে নিঃশেষ করিয়া, অদ্বৈতানন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর্য্যদিগের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈতপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে কর্মবন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন। সকাম কর্ম করিলে দ্বৈতচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতে হয়, আর নিষ্কাম কর্ম করিলে কর্মবন্ধন শিথিল হয়,—আত্মস্থিতির দ্বার উন্মুক্ত হয়,—অদ্বৈতব্রহ্মপদ নিকট হয়। এজন্যই গীতাশাস্ত্রে নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্যসমাজকে ধীরে ধীরে এই আদর্শমুখীন করা আশ্রমধর্মের উদ্দেশ্য।

নিষ্কাম কর্মসাধনের নিমিত্ত চতুরাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে ভোগবাসনা সুসংযত হইত, দৈন্যভার বহন করিয়াও কুলধর্মরক্ষণে জিগীষা-প্রবৃত্তি সুশমিত হইত, বার্দ্ধক্যে পুত্রকলত্রবর্জ্জন করিয়া,—কষ্টসাধ্য বিত্তৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রয়াণে কামনার গ্রন্থি ছিন্ন হইত, স্বর্গসুখ তুচ্ছ হইত, ভূমানন্দে ডুবিবার জন্য আয়োজন হইত। বানপ্রস্থাশ্রমের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া হর্ষশোকের তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া, মানাবমানের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রপীড়িত হইয়া, জয়পরাজয়ের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যেই ঐশ্বর্য্য-সঞ্চিত হইল, অমনি সকল সুখভোগে বিরক্ত হইয়া আর্য্যগৃহস্থেরা বনে প্রস্থান করিতেন। তাঁহারা কর্মের অধিকারী ছিলেন, ফলের অধিকারী ছিলেন না। গীতার উপদেশ —কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এই গীতানির্দ্দিষ্ট

আদর্শে সমস্ত আর্য্যজীবন সুনিয়মিত ছিল। বর্ণাশ্রমও এই কর্ম-ফলত্যাগব্রত-উদ্‌যাপনের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছিল।

সমাজ ব্যক্তিগণের সমষ্টি। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তি মরণশীল, সমাজ অমর। যদি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা মরণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারে আসিত, তাহা হইলে সমাজের স্থায়িত্ব নষ্ট হইয়া যাইত। ব্যক্তি মরে, কিন্তু তাহার যদি কোন প্রতিষ্ঠা বা সঞ্চয় থাকে, তাহা মরে না। তাহার উত্তরাধিকারীরা তাহা পায়। এই সামাজিক নিয়ম বিশ্বজনীন।

আর্য্যগৃহস্থ যখন বনর্গমনকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কর্মোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার অলন্ত—জীবন্ত ত্যাগের উদাহরণ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিত যে, কর্ম্মেতেই প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা অবস্থিত; —কর্ম্মফলভোগে নয়। এই বানপ্রস্থাশ্রমবিহিত ঐশ্বর্য্য-ত্যাগে কর্ম্মের প্রতি এক মঙ্গলময় অভিমান জনিত হইত। যে-সে কর্মে অভিমান জন্মে না। যে কর্ম্মের দ্বারা আমার পিতৃপুরুষেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, যে কর্ম্ম পালনে সমস্ত ঐশ্বর্য বর্জ্জন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। ধন যায়,—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তত্রাপি কৌলিক কর্ম্ম ছাড়িব না। যদি কর্ম্মকে ফললিপ্সা-সঙ্গদোষ-বিবর্জ্জিত করিয়া কুলগৌরবে গরীয়ান্ না করা হইত, তাহা হইলে সমগ্র সমাজকে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠ করা অসম্ভব হইত। মর্য্যাদার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে পরমার্থে লইয়া যাইতে হয়। আত্মমর্য্যাদা না হইলে পরমার্থদৃষ্টি ফুটে না। ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ উপদেশ দিয়া সাধারণ লোককে সুপথে লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। তজ্জন্যই দূরদর্শী ঋষির কুলমর্য্যাদা ও জাতিগত প্রতিষ্ঠার তেজোময় অভিমানবলে আর্য্যসমাজকে চালিত করিয়াছিলেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনেও সেই কর্ম্মাভিমানবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে আজও শত শত ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা দৈন্যভারগ্রস্ত,—উদর-জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে

অপক্ক রম্ভার উপদ্রব এড়াইয়া ক্ষীরসরনবনীত ভোজনে পরিতুষ্ট হইতে পারেন, তথাপি পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। গৃহে ব্যঞ্জন নাই; গৃহিণী তিন্তিড়ীপর্ণ রন্ধন করিয়া দেন; আপনারা তাহা আনন্দের সহিত ভোজন করেন ও শিষ্যদিগকে ভোজন করান। মরিয়া যাইবেন, সেও ভাল তবু বিত্তগ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করিবেন না। আসুন সকলে মিলিয়া চোগাচাপ্‌কানধারী পরধর্মী ব্রাহ্মণদিগকে দূর হইতে সম্মান দিয়া, সেই কুলধর্ম্মপালক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করি। তাঁহারা দীন বটেন, কিন্তু হীন নন। তাঁহাদিগের সম্মানে;—তাঁহাদিগের গৌরবে আর্য্যঋষিদিগের সম্মান ও গৌরব হয়। আজও শতসহস্র ক্ষত্রিয় দেখা যায়, যাঁহারা অন্নের জন্য লালায়িত কিন্তু তরবারি ছাড়িয়া জীবিকার্থে লেখনী ধারণ করিতে ঘৃণা করেন। আর আজ যদি আমাদের বণিকেরা কুলধর্ম ছাড়িয়া দু-চার-পাতা ইংরাজি উল্টাইয়া উকিল-ডেপুটি হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িত। এখনও কুলগত কর্ম্মাভিমান হিন্দু-জাতির গৌরবকে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছে, ভারতকে অশেষ দৈন্য হইতে বাঁচাইয়াছে।

ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মকে ভালবাসা, নিষ্কামকর্ম্ম সাধনে কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন করাই, হিন্দুর হিন্দুত্ব। যাহারা নিষ্ক্রিয় পূর্ণ অদ্বৈতানন্দে ডুবিতে চান, তাঁহারাই এই উচ্চ আদর্শের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

কর্ম্মনদীর চঞ্চলপ্রবাহ জ্ঞানসাগরে মিশিয়া না গেলে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় না। আবার কামনা থাকিতে কর্ম্মের ঘূর্ণীপাক শেষ হয় না। কর্মবিতাড়িত সংসারোর্ম্মি হইতে রক্ষা পাইবার কর্ম্মই প্রশস্ত উপায়—যদি তাহা কামনাদুষ্ট না হয়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে পুত্রবিত্ত ও স্বর্গের এষণা পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। চেষ্টা, সাধনা, কার্য্য প্রাণপণে করিবে, কিন্তু ফলের অধিকারী হইবে না। এরূপ বাসনাবিরহিত উত্তম সহজ কথা নহে। এতটা ভালবাসা চাই যে, কর্ম্মকে কোন অবান্তর বস্তুর সংমিশ্রণ

হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক অভিমানের বেড়া দিয়া বেষ্টন করিতে পারা যায়। আর্য্যসমাজ সেই অভিমান কুলমর্য্যাদা হইতে, পিতৃপুরুষদের গৌরব হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এই কুলমর্য্যাদারক্ষণ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই প্রীতিপূর্ণ বংশাভিমানের জোরে পূর্ব্বপুরুষ ও ভাবী সন্ততিগণ যথাযয়ে বদ্ধ আছে। শোণিতের টান মৃত, জাত ও অজাত ব্যক্তিগণকে কৌলিক বা জাতীয় একত্বে আকৃষ্ট করে। এই শোণিতগত,বংশগত, জাতিগত, মর্য্যাদাপরিপুষ্ট, অভিমানসংরক্ষিত একতাই মানবসমাজের ভিত্তি। আর্য্যেরা এইভাবের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া কুলকর্ম্মসূত্রে সমাজকে বাঁধিয়াছিলেন। সভ্য য়ুরোপেও এই বংশমর্য্যাদায় যথেষ্ট পরাক্রম আছে, কিন্তু তথায় জিগীষা, প্রতিযোগিতা, ঐশ্বর্য্যলিপ্সা, প্রাবল্য পাইয়াছে। ভূতপ্রপঞ্চকে জয় করা, প্রকৃতিকে বশ করা, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দমনীয় সংসারে প্রভুত্ব লাভ করা য়ুরোপের আদর্শ। এই আদর্শ যে মহান্ ও প্রশংসার্হ তাহার সন্দেহ নাই। প্রকৃতিকে ব্যবহার ক্ষেত্রে জয় করা পরমার্থলাভ আর এক প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এই আদর্শ ঈশার আদর্শ নহে। ইহা য়ুরোপীয় স্বভাবসুলভ, কিন্তু ঈশা-প্রণোদিত নহে। ইহা ঈশার আদর্শে একটা কার্য্যভূমি মাত্র। অনেক সময়ে দুই আদর্শে ভয়ানক বিরোধ ঘটিয়াছে। কখন য়ুরোপের জয় হইয়াছে, কখন ঈশার জয় হইয়াছে। য়ুরোপের ক্রমোন্নতির ইতিহাস এই জয়পরাজয়ের ইতিহাস। এই দুই আদর্শের প্রভেদ জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা না হইলে য়ুরোপীয় ইতিহাস-তত্ত্ব বুঝা কঠিন হইবে। ভারতের আদর্শ কর্ম্মজয়, ঐশ্বর্য্যলাভ নহে। তাই এখানে কর্ম্মের এত অভিমান, বর্ণধর্ম্মের প্রতি এত ভালবাসা, জিগীষার অনাদর, শান্ত ভাবের আদর। য়ুরোপের আদর্শ জয়, তাই সেখানে শান্তভাবের এত অভাব, প্রতিযোগিতার এত বাহুল্য। হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা ভেদপ্রসূ কর্ম্মবীজকে নাশ করিয়া অভেদানন্দ লাভ করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মসাধন অবলম্বন করিয়াছিল, আর এই একনিষ্ঠতাই বর্ণবিভাগক্রমের প্রণোদনা করিয়াছিল।

অদ্বয়াত্মা মায়াপ্রভাবে অন্নময়াদিপঞ্চকোষে প্রবিষ্ট হইয়া অহম্প্রত্যায়ী জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পঞ্চকোস আছে, তদ্রূপ সমাজেরও পঞ্চকোষ আছে। জীবের অন্নময়কোষ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় সমাজের শ্রমসেবাজীবীদিগের অনুরূপ; প্রাণময়কোষ বাণিজ্যজীবীদিগের সদৃশ। কেন না, ক্রয়বিক্রয়জন্য আদান-প্রদানে সমাজ বাঁচিয়া থাকে। সমাজের শাসন রক্ষণকারী-দিগের দল মনোময় কোষের তুল্য। মন ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া চালন করে; ক্ষত্রিয়েরাও প্রজাদিগকে শাসন করে। ব্রাহ্মণেরা বিজ্ঞানময় কোষপ্রতিম; কারণ বিজ্ঞানময়-বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী। তাঁহাদিগের বিশেষ কার্য্য অধ্যাপন ও যাজন, তাঁহারা শিষ্যদের অন্তঃকরণকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যান, অন্তর্দৃষ্টি উদ্ঘাটিত করেন, মনের সঙ্কল্পবিকল্পকে এক-মুখীন করেন। সন্ন্যাসীরা আনন্দময় কোষপ্রতিম। তাঁহারা অত্যাশ্রয়ী বিধিনিষেধাদির অতীত, যদৃচ্ছাগতি; সংসারের পরমার্থগতির মুখ্য ভার তাহাদেরই উপরে ন্যস্ত। আনন্দ হইতেই সৃষ্টি, আনন্দতেই স্থিতি, আনন্দতেই বিশ্ব সংসারের পর্য্যবসান। তাই যাঁহারা ত্যাগানন্দভুক্, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রভু, জগদ্গুরু।

ঋষিরা একমেবাদ্বিতীয়ের কৌষিক পঞ্চীকরণ অনুসারে সমাজকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়াছেন; আর ব্যক্তিরও যে সাধন, সমাজেরও সেই সাধন ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সপ্রাণ জ্ঞানে-ন্দ্রিয়ের বশে আনিতে হয়; তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে মনের অধীন করিতে হয়; বহির্মুখী মনকে আবার অন্তর্মুখী বিবেকের শাসনে রাখিতে হয়, তবে আনন্দের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নহিলে বিরোধ, বিদ্রোহ ও বহুলতার উপদ্রবে জীব ক্লিষ্ট ও মঙ্গলভ্রষ্ট হয়। আর্য-সমাজেও সেইরূপ ছিল। চতুর্ব্বর্ণের পারস্পর্য্য ও সম্বন্ধ জীবকোষানুযায়ী ছিল। ব্রাহ্মণেরা সকলকে জ্ঞান শিক্ষা দিত, ক্ষত্রিয়েরা সকলকে রক্ষণ করিত; বৈশ্যেরা সকলের জন্য আহরণ ও উপার্জন করিত ও শূদ্রেরা সকলের সেবা করিত। যেমন প্রত্যেক

আর্য্যবর্ণের এক একটি বিশেষত্ব ছিল, তেমনি নির্ব্বিশেষত্বও ছিল। সকল আর্য্যেরই বর্ণনির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন ও যজন করিবার অধিকার ছিল। সত্যযুগে মনু, ত্রেতায় গোতম, দ্বাপরে শঙ্খ, কলিতে পরাশর সকল যুগে সকল সংহিতাকার এই সমান অধিকার দিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। অনার্য্য শূদ্রেরা যে কেন সমানাধিকার পায় নাই, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ বর্ণবিভাগে কর্ম্মের আদর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পিতার স্বভাবত ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার উপার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা সন্তানদিগের দান করিয়া যান। হিন্দু সন্তানকে কর্ম্মের অধিকারী করিয়া যাইতেন। কোন ক্ষত্রিয় বনপ্রয়াণকালে পুত্রদিগকে এই বলিয়াই আশীর্ব্বাদ করিতেন—সম্মুখ সমরে প্রাণ দিও, সমাজকে বিন্দু বিন্দু শোণিতদানে শত্রুনিগ্রহ হইতে রক্ষা করিও, কিন্তু দেখিও যেন ঐশ্বর্য্যলিপ্সামোহে ক্ষত্রিয়ধর্মভ্রষ্ট হইয়া পিতৃপুরুষদিগের নামে কলঙ্ক আনিও না। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরাও এইরূপ গৌরবান্বিত আশীর্ব্বচন দানে কুলমহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। আর সন্তানেরাও আশৈশব পূর্ব্বপুরুষদের ক্রমভঙ্গরহিত বর্ণধর্ম্মরক্ষণকীর্ত্তি শ্রবণ ও মনন করিয়া মর্য্যাদাপূর্ণ হইত। যদি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে বালকদিগের অল্পবয়স হইতেই সেই শিক্ষা আরম্ভ না করিলে কর্ম্মঠতা জন্মে না। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ বা অন্য কোন বিশেষ বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিতে গেলে, যৌবনের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সাধন আবশ্যক। বিংশতিবর্ষীয় যুবকের পক্ষে সূত্রধরের ব্যবসায়শিক্ষা বড়ই কষ্টকর। অত বয়সে তাহার হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা চলিয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া আজ কাল আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের সন্তানদের কি শিখাইব, বুঝিতে পারি না আমরা অন্ধকারে ঢিল মারি। চতুর্দ্দশ বা ষোড়শবর্ষ বয়স্ক বালকের বিশেষ প্রতিভা না থাকিলে, নৈসর্গিক চিত্তগতি জানা যায় না। আর কুলধর্ম্মের উপরও আস্থা নাই, তাই তাহাকে সুবিধানুযায়ী একটা

বিশেষ শিক্ষালাভে (profession) বলপূর্বক প্রবৃত্ত করি। আর না হয় তাহারা কেবল সাধারণভাবে বিদ্যার্জ্জন করিয়া উপাধি বিশিষ্ট হইয়া উকিল বা যে কোন চাকরি অবলম্বন করে। যখন বর্ণধর্ম্মের প্রভাব ছিল, তখন পিতা এবং বালক, উভয়েই প্রথম হইতে জানিত যে, কোন্ বিশেষ বিদ্যায় নিপুণ হইতে হইবে।

বর্ণধর্ম্মবিভাগসম্বন্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। আমাদের সংস্কারকেরা য়ুরোপীয় বর্ণ বিভাগহীন সমাজের সহিত তুলনা করিয়া বর্ণাশ্রমের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। সেই আপত্তিগুলি ও তুলনার যথাযথ বিচার করা আবশ্যক।

বর্ণধর্ম্মে কর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর। অতএব ক্ষত্রিয়সন্তান সদাই আপনার কর্ম্মগত হীনতা অনুভব করিয়া কর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। আর সভ্য য়ুরোপে সকল কর্ম্মই আদরণীয়। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের চক্ষে নীচ ও ঘৃণার্হ, অলীক কথা। ভিখারী ব্রাহ্মণেরাই ত ক্ষত্রিয়ের বীরকীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া থাকেন। দান লইতে ক্ষত্রিয় ঘৃণা করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের আজীবিকা প্রতিগ্রহ। আজ যদি কোন দরিদ্র ধূলিধূসরিত নগ্নপদ ব্রাহ্মণ তাঁহার লক্ষপতি কায়স্থ শিষ্যের নিকট গমন করিল, আর সেই চিনাংশুকবাসা ছাত্র ছিন্নবসন গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করে, তাহা হইলে কি সেই ধনিসন্তান হীন হইয়া যায়? তবে কি ব্রাহ্মণ উচ্চতর নহেন? শিক্ষক যেমন সম্মান সম্বন্ধে উচ্চস্থান অধিকার করিলে শিষ্যের অবমাননা হয় না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের সম্মানে ক্ষত্রিয়ের হীনতা হয় না। কৃপাচার্য্য অপেক্ষা অর্জ্জুনের বীরোচিত সম্মান অধিকতর ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃপাচার্য গুরু, তজ্জন্য অর্জ্জুন নিশ্চয়ই তাঁহার পাদস্পর্শ করিতেন। পাদস্পর্শ করিতে গিয়া অর্জ্জুন কি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের হীনতা অনুভব করিয়াছিলেন? বর্ণবিয়োজিত কর্ম্মের বরঞ্চ এক পক্ষে অমর্য্যাদা হইতে পারে। সকলের জন্য কর্ম্ম, অতএব সকল হইলেই হইল কর্ম্মটা যেমনি

হউক না কেন—উচ্চ বা নীচ, শুভ বা অশুভ। অলঙ্কার লইয়া কাজ, পতি কেবল একটা উপায় মাত্র।

আর এক আপত্তি, বর্ণবিভাগে অত্যন্ত ভেদভাব হয়। বর্ণমর্য্যাদার আধিক্যবশত এক বর্ণের অপর বর্ণের সহিত আহারপান, আদান প্রদান বা পরিণয়ঘটিত সম্বন্ধ স্বভাবও রহিত হইয়া যায়। য়ুরোপে দেখ এরূপ ভেদভাব নাই। ঐশ্বর্য্য লাভের প্রতিযোগিতায় ভেদ-ভাব চূড়ান্ত হয়। যদি কোন সামান্য বণিক আজ কোটিপতি হয়, তাহার বাটীতে স্বয়ং সম্রাট ও লর্ডেরা-ভোজন করিতে আসিবেন, কিন্তু সেই হঠাৎ-নবাব বণিকের ভ্রাতার গৃহে কেন—পিতারও গৃহে তাঁহারা কোন দিন পদার্পণ করিবেন না। আর ঐ বণিকের কন্যার বিবাহের সময় যখন ভোজ হইবে, তখন সাধ্য কি যে, সেই ভোজগৃহে তাহার দরিদ্র ভ্রাতা-ভগিনী এমন কি জনক-জননী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া আমন্ত্রিত বড়মানুষদের সঙ্গে একটু চা পান করেন। আর আজ এখানে যদি কোন হাইকোর্টের জজের বাটীতে বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহারা দীনহীন কপর্দ্দকবিহীন জ্ঞাতিকুটুম্ব, যে যেখানে আছে, সকলকেই তাঁহাকে গলবস্ত্র হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। তাঁহারা সকলে আসিয়া এক পংক্তিতে ভোজন না করিলে, বিবাহ কার্য্য পূর্ণ হইবে না। ভেদভাব সকল সমাজেই আছে। তবে আমাদের নাকি অত্যন্ত দুর্দ্দশা, তাই য়ুরোপীয়েরা আমাদিগকে বর্ণধর্ম্মত্যাগ করিয়া অভেদভ্রাতৃভাব গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেন। আর আহারপানের নিষেধবিধি কি এতই অনুদার? যদি অন্য বর্ণের সহিত আহার সংসর্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে, ঘনিষ্টতা আবার যদি গুণবিশিষ্টতাকে মিশ্রণদূষিত করে, তাহা হইলে যথেচ্ছ আহারপানের নিষেধ কি হিতকর নয়? কিন্তু একবর্ণের দ্বিজেরা অন্য বর্ণের দ্বিজ-দিগের অন্ন ভোজনে কখনই নিবারিত হন নাই। দ্বিজ বলিতে সকল বর্ণের আর্য্যদিগকে বুঝায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (বশিষ্টসংহিতা —২য় অধ্যায়)। দ্বিজ মাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দানে অধিকার

(গৌতম সংহিতা—১০)। তাঁহাদের মধ্যে একটা মৌলিক নমতা ছিল তজ্জন্য সহভোজনের নিষেধব্যবধানে তাঁহারা ব্যবচ্ছিন্ন হন নাই। যজ্ঞবিরোধী শূদ্রদিগেরই সহিত কেবল ব্যবধান ছিল। কিন্তু যখন বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে ভারত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইল, তখনই বিদ্রোহকে দমন করিবার নিমিত্ত আহারপান-বিধির কিছু কড়াকড়ি হইল। তবুও ভিন্ন বর্ণের সহিত ভোজন বন্ধ হয় নাই। কেবল মর্য্যাদা রক্ষণার্থে দুই এক প্রকার ভোজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করার নিষেধ হইয়াছে।

বর্ণভেদ যে একেবারে অনুলঙ্ঘনীয় ছিল তাহা নহে। একবর্ণের সহিত অপরবর্ণের আদান প্রদান চলিত। কুলাভিমান রক্ষার জন্য সবর্ণবিবাহ প্রশংসনীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। কিন্তু লোকরক্ষার্থে অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল। বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত; বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ; এবং শূদ্রাজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়ের অনুলোমজাত পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র, আর বৈশ্যের অনুলোমজাত পুত্র করণ বলিয়া কথিত হয়। প্রতিলোমক্রমে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র সূত, বৈদেহক ও চাণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার মাগধ ও ক্ষত্তা, আর বৈশ্যার আয়োগব নামে অভিহিত হইয়া থাকে (যাজ্ঞবল্ক্য—১৬)। প্রতিলোমবিবাহ আদরণীয় ছিল না; বিশেষত শূদ্রের প্রতিলোম-দাম্পত্য অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। হীনজাতির কন্যা গ্রহণ করার তত ক্ষতি হয় না, যত কন্যাদানে হয়। কোল-ভীলেরা যদি আমাদের কন্যাগুলিকে লইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হই না? দ্বিজবর্ণের মধ্যে অনুলোম বা প্রতিলোমজাত পুত্র দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত হয়। মেধাতিথির মতে প্রতিলোমজাত পুত্রেরও উপনয়ন কর্তব্য (মনুসংহিতা—১০, ২৮)। এই সকল অসবর্ণসম্মেলন-সম্ভূত জাতিসকল বর্ণোৎকর্ষও লাভ করিত (যাজ্ঞবল্ক্য—১)। মনু বলেন যে, শূদ্র ও ক্রমে ক্রমে

উৎকৃষ্টজাতিভাবাপন্ন হয় (১০ম অধ্যায়—৩৩৫) এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্ণোৎকর্ষলাভ এক পুরুষে হইত না, কারণ বর্ণধর্ম্ম ব্যক্তিগত কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু কৌলিক কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন অম্বষ্ঠবংশ তিন চারি পুরুষ শুদ্ধ ব্রাহ্মণাচারী হয়, তাহা হইলে সেই বংশ বিপ্রত্ব লাভ করে—এইরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেবল এক পুরুষ ব্রাহ্মণধর্মী হয়, আর সেই ধর্ম্ম পুরুষ-পরম্পরাগত না হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না।

বর্ণবিভাগ যে কেবলমাত্র ভেদভাবের পোষণ করে, ইহা সত্য নহে। ইহা অবস্থানুসারে উদার হয়। কালে ইহা উদার এত হইয়া উঠিল যে, শূদ্রসম্মেলনজাত সঙ্করবর্ণের গুরুভারে আর্য্যেরা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সঙ্করজাতিরা আর্য্যজাতির উচ্চ লক্ষ বুঝিতে পারে নাই। তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ভিতর বৈষম্য আনিয়াছিল, নিবৃত্তমার্গকে প্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করিয়াছিল। বৈষম্যদোষে আর্য্যসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবসাদ বৈনাশিক বৌদ্ধবাদের প্রসারভূমি হইয়াছিল। ভারত আর্য্য আদর্শ-বিরহিত হইয়া অধঃপতিত হইল। যে আর্য্যেরা অত্যুদারতার জন্য বিখ্যাত, তাহারাই আজ অনুদার বলিয়া নিন্দিত। আর নিন্দা করে কারা?—যারা পরাজিত জাতি সকলের সহিত কখনও মিলিতে পারে না। মার্কিনের হস্তে আদিম-জাতির আজ কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! কেবল পুঁথিগত উদারতার আড়ম্বর দেখিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে অনুদার ও নিষ্ঠুর বলিয়া গুরুনিন্দাপাতকে পাতকী হইয়াছি।

য়ুরোপে বর্ণভেদ নাই বলিয়া তথায় সামাজিক ভেদভাব নাই, এই ধারণা মনগড়া। সেখানে ঐশ্বর্য্যশালীতে আর দীন শ্রমজীবীতে এত প্রভেদ যে, তাহাদের জীগীষার আদর্শ জিঘাংসায় পরিণত হইয়াছে। বৈনাশিকেরা (Nihilist) ও সামাজিক সাম্যবাদীরা (socialist)

তাহার সাক্ষী। শ্রমজীবীদের বিপুল ধর্মঘটসকল য়ুরোপকে ব্যস্ত করিয়াছে, বিরোধের ভয়ঙ্কর ছবি দেখাইয়া য়ুরোপীয় সমাজকে ভীত করিয়াছে।

বর্ণধর্মের জীগীষাপ্রবৃত্তির পরিপুষ্টি হয় না, মানব-বুদ্ধি কর্মবদ্ধ হইয়া পড়ে ও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর পথে অগ্রসর হইতে পারে না। য়ুরোপে ওরূপ বন্ধন নাই, তাই তথায় জিগীষা আছে, বিজয়লক্ষ্মীর শোভা আছে, প্রতিভার স্ফূর্তির জন্য প্রশস্ত ভূমি উন্নতির অনন্ত পথ খোলা আছে। আর এখানে কোন ব্যক্তি যদি কৌলিক কর্ম করিতে অপটু হয়, যদি তাহার প্রতিভা পরমধর্ম পালনে স্বভাবত ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন উপায় নাই। তাহাকে বর্ণের বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার নৈসর্গিক বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিতে হয়। বর্ণধর্ম এ প্রকার অপ্রশস্ত নয়। বর্ণধর্মপালনে প্রতিভার যথেষ্ট উৎকর্ষ হইত। তাহাতে প্রতিভার স্বাধীনতা নষ্ট হইত না। জনক ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের গুরু হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সকলে আপন-আপন বর্ণধর্ম পালন করিবে, এইরূপ শাসন ছিল বটে, কিন্তু শালী ব্যক্তিরা এই শাসন যে অতিক্রম করিতে পারিত না, এমত নহে। আর আপৎকালে বা লোকরক্ষার্থে জনসাধারণে পরধর্ম গ্রহণ করিতে পারিত। গৌতম বলিয়াছেন—আপৎকালে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতির নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষা-সমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শুশ্রূষা এবং অনুগমন করিবে (গৌতম সংহিতা—৭) ব্রাহ্মণ স্বকীয় ধর্মপালনে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিতে পারিলে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারি ও কালের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য ক্ষত্রিয়ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। কৌলিক কর্মে নিরত থাকাই বিধি ছিল। কিন্তু বিধি লোকস্থিতির জন্য। তজ্জন্য বিধিসকলকে কালানুসারে প্রসারিত বা সংকুচিত করিতে হয়। অবস্থার পরিবর্ত-

নের সঙ্গে সঙ্গে কুলমর্য্যাদা রক্ষা হয়, অথচ স্থিতিভঙ্গ না হয়—এই সংহিতাকারদের উদ্দেশ্য ছিল। আর্য্যদিগের ইতিহাসে সকল সময়ে স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য যথাযথ হইয়াছিল কিনা তাহা বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে বর্ণধর্ম্ম স্থিতিশীল হইলেও কালের গতির সহিত অগ্রসর হইতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বংশগৌরবের দ্বারা চালিত না হইলে সমাজ কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। বিলাতে বর্ণধর্ম্ম নাই। তথায় মোটামুটি ঐশ্বর্য্যলাভানুসারে কর্ম্মের আদর। তাই আজ সেখানে যুদ্ধে যাইবার জন্য লোক পাওয়া যাইতেছে না। লর্ড কিচনর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আনাড়ি লোক পাঠাইলে আর চলিবে না। শস্ত্রব্যবসায়ে তত পয়সা আসে না, তত প্রতিষ্ঠা নাই; ভদ্রজন লোকের ইহাতে তত আস্থা নাই। রাজপুরুষেরা তথায় বলপূর্ব্বক লোকদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। কর্ম্মকুলনত হইলেই যে হীন হয়. আর স্বাধীন হইলেই যে শোভন হয়, এমন নহে।

এক হইতেই বহু হইয়াছে বা একই বহুরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। যাহাতে একেতেই আবার সব পর্য্যবসিত হয়, তাহাই আমাদের সাধন। কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মসূত্র বিনষ্ট হয়? কিন্তু সংসারে রজোগুণেরই প্রবাল্য। মর্য্যাদা রাজোগুণের উত্তমাংশ এই উত্তমাংশকে চালিত করিলে প্রকৃতি সত্ত্বাকুল হয়। পরমার্থতত্ত্ব রজোবিশিষ্ট প্রকৃতিতে ভাল স্থান পায় না। তজ্জন্য সেই প্রকৃতিকে রজোগুণেরই সুবিহিত চালনার দ্বারা সুপথে লইয়া যাইতে হয়। অতএব ঋষিরা আশ্রমধর্ম্মনিয়মিত কুলমর্য্যাদার ভিত্তিতে কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কললিপ্সা-দোষ হইতে উহাকে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। বর্ণবিভাগ রজঃ ও সত্ত্বের বিরোধ ভঙ্গ করে, রজোগুণকে সত্ত্বানুযায়ী করে, প্রকৃতিকে সাম্যাবস্থায় আনয়নের উদ্যোগ করে। এই এক-

নিষ্ঠতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা ও সমাজকে রাজসিক আড়ম্বরের ভিতর দিয়া সাত্ত্বিক পথে লইয়া যাওয়া অতি দুষ্কর। নেতারা জ্ঞানী ও ত্যাগী না হইলে আদর্শ নষ্ট হইবার আশু সম্ভাবনা। এই দুরূহ নেতৃত্ব ভার লইবার জন্য ব্রাহ্মণবর্ণের উদ্ভাবনা। তাঁহাদের বিশেষ কার্য অধ্যাপন ও যাজন। তাঁহাদের আজীবিকা প্রধানত প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অযাচিত দানের উপর নির্ভর করিত। ঐশ্বর্য সঞ্চয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। কঠোর শমদমসংযমে তাঁহাদের জীবন নিয়মিত ছিল। ধর্মভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা অবমানিত, লাঞ্ছিত, পরিবর্জ্জিত হইতেন। মনু বলেন—যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠ বলেন —বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না (বশিষ্ঠসংহিতা—৩)। সমাজকে একত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইঁহাদেরই উপর ভার ছিল। ইঁহারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, শস্ত্রজীবী ছিলেন না। তাই তাঁহাদের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইবার অল্প সম্ভাবনা ছিল। য়ুরোপে রাজনীতি তন্তুবায় ও মদ্যবিক্রয়ীদিগের হস্তে পড়িয়া আজ কত না কলুষিত হইয়াছে? সমাজনীতি, ধর্মনীতি শুদ্ধত্ব রাখিবার জন্যই নেতাদিগকে স্বার্থশূন্য শুদ্ধতায় ভূষিত করা হইয়াছিল।

একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপ্রধান আশ্রমধর্ম হিন্দুত্বের ভিত্তি। এই আশ্রমধর্ম হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর্য্যত্বকে স্থায়ী করিয়াছে। হিন্দুত্বের এক অটল ভিত্তি আছে, এইরূপ বোধ ও আত্মমর্য্যাদা উদ্ভাবিত করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। এই আত্মমর্য্যাদা ব্যতীত বর্তমান হিন্দুসমাজের সংস্কার করিতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িবে।

অনুষ্ঠান-পত্র ঃ স্বরাজ

"বিশুদ্ধ ভাষায় বলে—স্বরাজ্য ; চলিত ভাষায়—স্বরাজ। অথবা, স্বে মহিম্নি রাজতে—নিজের মহিমায় যাহা বিরাজ করে, তাহাই স্বরাজ। স্বরাজের প্রতিষ্ঠা—মহিমায়। মহিমা—মধুরিমা নহে। ছোট্ট ফুলটি মধুর বটে—মহৎ নয়। মহিমা—বিশালতাও নহে। দশকুশী মাঠ বিশাল বটে, কিন্তু মহিমার স্ফূর্ত্তি উহাতে দেখা যায় না। মহিমা তবে কি? যে পূর্ণতা ভেদ বিরোধে সমন্বয় ঘটায়—যে উদারতা বিষম দ্বন্দ্বে সুষমা আনয়ন করে, তাহাই মহতের ভাব—মহিমা। একটি দৃষ্টান্ত লইলে এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে। মহিমাকে যদি শরীরী দেখিতে চাও ত হিমাচলে চল। ঐ যে গিরিরাজ দেখিতেছ, উহা অমৃতের ভাণ্ডার—আবার মৃত্যুরও আধার। অমৃতবাহিনী নির্ঝরিণীকুলের শীতল সঞ্চারে ঐ বিপুল শিলাবক্ষ সদাই স্নিগ্ধ—মৃত্যুভয়-নিবারণী শিবসোহাগিনীর কুলকুল ধ্বনিতে ঐ হিমজটা চিরমুখর—মৃতসঞ্জীবন বনস্পতিগণ ঐ পাষাণ-বিস্তারে সুপরিপুষ্ট। আবার ঐ হিমগিরিকূটে কালকূট ফুল ফুটে—অজগর গরল উদ্গার করে—বিষময়-বনরাজি বিরাজ করে। ঐ উত্তুঙ্গ উত্তরাখণ্ড যোগিতপোধনদিগের আশ্রম—আবার হিংস্র ব্যাধ ও শ্বাপদ-কুলের বিহারভূমি। উহার মেলায় মেঘের খেলা—শিরোদেশে তপনের জ্বালা। ঐ নগক্ষেত্রে কত সরোবর, কত নির্ঝর—আবার নির্মম-কঠোর পাষাণ-প্রসর। কোথাও বা ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত—কোথাও বা মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোল-আকম্পিত কুসুমবল্লরীর দোল। আবার উচ্চে হিমমণ্ডিত চূড়ারাজির অভ্রভেদ—নীচে তমিস্রাবিজড়িত গুহা-গহ্বরের পাতালবেধ। কি দুর্দ্দম দ্বন্দ্ব—কি ভয়ঙ্কর ভেদ—কি বিচিত্র বিরোধ—বিশাল বৈষম্য—ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়। কিন্তু খণ্ডতার ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া বিয়োগদৃষ্টি বর্জ্জন করিয়া যদি যোগদৃষ্টিতে দেখ, তাহা

হইলে ঐ নগরাজের অচল প্রতিষ্ঠা তোমার সম্মুখে উদিত হইবে; দেখিবে—উহার অচলতা কাল-ঝটিকার সকল চাঞ্চল্যকে অঙ্গীকার করিয়াছে—উহার উদারতা সমস্ত দ্বন্দ্বের মিলন ঘটাইয়াছে—উহার পূর্ণতা ভেদবহুলতার অভেদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যে যোগ জানে, সে হিমালয়ের বিরোধ-বিষমতায় বিহ্বল হয় না—উহার অমৃত-পানে মদমত্ত হয় না। হিমালয়ের যোগমহিমায় যদি একবার অধিষ্ঠিত হও ত তুমি উহার সকল ভেদ-বিরোধ আদরের সহিত স্বীকার করিবে —উহার অমৃত-গরল—' উহার সরসতা কঠোরতা—উহার শুভ্রতা-কৃষ্ণতা—সকল বৈষম তোমাকে এক অপার ভূমানন্দে মজাইবে। এই জন্যই হিমালয়কে যোগালয় বলে। ইহাই যোগেশ্বর মহেশ্বরের পীঠস্থান। আর তাঁহার যোগশক্তি যোগমায়া যে হিমাচলকন্যা পার্ব্বতী —সে তত্ত্ব আর বুঝাতে হইবে না। যোগের পূর্ণতা শূন্যতা নহে। ভেদাভেদ-সমন্বয়-পটুতাই যোগ। যেখানে দ্বন্দ্ব মিলনের যৌগৈশ্বর্য্য, সেইখানেই পরম মহিমা বিরাজ করে। এই মহিমান্বিত গিরিরাজের ক্রোড়ে আর এক প্রতিষ্ঠা আছে। অদ্বৈতরসসঞ্জীবিত বৈদিক সংস্কার-পরিপুষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণকমল-সুবাসিত অচল অটল হিন্দু সমাজ। দেখ একবার ঐ অদ্ভুত হিন্দুপ্রতিষ্ঠা উহা নির্বাণসাগরোন্মুখী আর্য জ্ঞানগঙ্গার বেদগাথাময় কুলুকুলু-ধ্বনিতে চিরগুঞ্জারত—ভগবল্লীলারসে উহা মজ্জায় মজ্জায় অভিষিক্ত। আবার নাস্তিক বৌদ্ধ-বিষবৃক্ষ উহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে—দেববিরোধী সাম্প্রদায়িকেরা উহার অন্তরে অন্তরে প্রবৃত্তির বিষ ঢালিয়া দিয়াছে—পাষণ্ড হিংস্র বর্ব্বর জাতিরা উহার তপোবনে কতই না বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। কতই না বিপ্লব-ঝঞ্ঝার বিতাড়ন—পরাজয়-পরাভবের উৎপীড়ন—উৎপাত-নিপাতের নিষ্পেষণ ঐ সনাতন সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়াছে ও করিতেছে। ওদিকে আবার বৃন্দাবন-কুসুম-পরিমল-সেবিত মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল উহার মর্ম্মে মর্ম্মে মধু-মাধুরী ছড়াইতেছে। উহার শ্রীঅঙ্গে কত অভ্যুত্থান অভ্যুদয়ের মহিমা মাখানো রহিয়াছে—কতই না বিজয়-লেখা উহার সুবিস্তৃত

ললাটে অঙ্কিত আছে। কতই না শৌর্য্যবীর্য্যের গৌরব-কিরীট উহার শিরোদেশ শোভিত করিতেছে। দেখ একবার—কি বিরোধ-বাহুল্য—কি বিচিত্র-বৈষম্য ঐ অদ্ভুত সমাজ-প্রতিষ্ঠায় বিজড়িত আছে। বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া ঐ অচল অটল অমর হিন্দু সমাজকে যে দেখে—সে উহার অভেদ মহিমা দেখিতে পায় না। কিন্তু যদি যোগ-দৃষ্টিতে দেখ ত বুঝিতে পারিবে যে, উহার অচলতায় সকল বিপ্লব-চাঞ্চল্য বিলীন হইবে—উহার উদারতায় সকল ভেদবিরোধের সমন্বয় হইবে—উহার পূর্ণতায় সমস্ত বৈষম্য সুষমায় পর্য্যবসিত হইবে—উহার যোগমহিমায় সকল সঙ্ঘর্ষ ভূমানন্দের শান্তি লাভ করিবে।

আজ-কাল আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষা চলিতেছে, তাহাতে আমরা কেবলই বিয়োগশাস্ত্রে পটু হইতেছি। ফিরিঙ্গিরা আমাদের সনাতন সমাজতন্ত্র—আমাদের নিবৃত্তিময় সভ্যতা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিশ্লেষণের ছুরিকা দিয়া চিরিয়া চিরিয়া আমাদের সমক্ষে ফেলিয়া দিতেছে—আর আমরা ভাল-মন্দ সমস্তই কুড়াইয়া কুড়াইয়া ঘরে তুলিয়া লইতেছি—আর ঐ সকল টুকরাগুলির সুখ্যাতি ও অখ্যাতির সমালোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এই বিশ্লেষণের প্রকোপে আমরা ভালবাসা হারাইয়া ফেলিয়াছি—সেই সর্ব্বময় মহিমার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তাই আজ এত সমাজ-সংস্কারের আড়ম্বর ও কুলত্যাগের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আমি জানি—আমার জননী তিলোত্তমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন অথবা জগল্লক্ষ্মীর ন্যায় সর্বগুণশালিনী নহেন। কিন্তু তবু তিনি আমার মা। তাঁহার গুণও আছে, দোষও আছে—কিন্তু মাতৃমহিমা ঐ দোষগুণের দ্বন্দ্বে এক অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করে। সেই সুষমা সেই শোভা আমায় আত্মহারা করে—আমাকে মায়ের চরণে বাঁধিয়া রাখে। যদি কোন পাষণ্ড ঐ মাতৃমহিমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া সুকুমার বালকের কাছে মায়ের দোষগুলি ও গুণগুলি চিরিয়া দেখায়, তাহা হইলে ভালবাসা প্রীতি পূজা ঐ কোমল হৃদয় হইতে নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হয়। মায়ের সন্তান সমগ্র মাতৃবস্তুকে ভালবাসে—

ভাল বলিয়া—বাসে—অঙ্গীকার করে—দোষ-গুণের সমালোচনা করে না। যখন তাহার প্রাণ মাতৃমহিমায় ভরপুর হয়—তখন সে দোষ-গুণ দেখে আর বলে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ। যদি বিমল চন্দ্রিকা ও কলঙ্কলেখা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখ তাহা হইলে তুমি ও-হেন চাঁদেরও নিন্দুক হইয়া উঠিবে। কিন্তু যে চাঁদের মহিমাতে মজিয়াছে, সে-ই চন্দ্রিকা ও লেখার মিলনতত্ত্ব বুঝে ও উহাতে ডুবে। সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যোগদৃষ্টি হারাইয়া ভেদদ্বন্দ্বে আমরা অভিভূত হইয়াছি—নিজ মহিমা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি—স্বরাজভ্রষ্ট হইয়াছি। কি করিয়া সেই যোগদৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে—সেই অচলপ্রতিষ্ঠ হিন্দুসমাজের মহিমা আবার আমাদের প্রাণ-মনকে পূর্ণ করিবে। যত দিন না এই হিন্দুসমাজ হিমাদ্রির গৌরবে আমরা মাতিয়া উঠি, তত দিন আমাদের শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন সমস্তই মিথ্যা হইবে। ঐ যোগদৃষ্টির পুনরুদ্ভাবন করিতে—ঐ অভেদ মহিমার পুনরভ্যুদয় সাধিতে আমরা—স্বরাজ পত্র প্রকাশ করিতেছি। এই ক্ষুদ্র পত্রে দেশের যত ঐশ্বর্য আছে—জয় পরাজয়, মিলন-বিরোধ, স্বাদুতা-তিক্ততা, কাঠিন্য-কারুণ্য, বৈষম্য-সুষমা—অতীত ও বর্তমান যত গৌরব-বিকাশ আছে, সমস্তই আমরা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিব। ঋষিজন-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজের মহিমা আমাদের দেবালয়ে চতুষ্পাঠীতে বাণিজ্যস্থানে গড়দুর্গে বিরাজিত রহিয়াছে—পালপার্ব্বণে মেলায়-খেলায় আচার-ব্যবহারে কুলগৌরবে বংশমর্য্যাদায় পিতৃ-পিতামহগণের কীর্ত্তিতে সতীলক্ষ্মীদের আত্মত্যাগে উহা অনুস্যূত আছে। আমরা স্বরাজ পত্রে ঐ সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনীর সমুজ্জ্বল ছবি আঁকিব। আমাদের জন্য নহে—কৌতুহল নিবারণের জন্য নহে—কিন্তু সেই অচল মহিমা উদ্ভাবন করিবার জন্যই আমাদের সকল যত্ন নিয়োজিত হইবে। আমরা যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়া আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বিচরণ করিতেছি। যদি এই সকল ঐশ্বর্য্যের সুবিন্যস্ত চিত্রণ আলোচনা করিয়া সেই সমন্বয়সূত্র ধরিতে পারি—তাহা হইলে পুণ্যভূমি

ভারতবর্ষে কালে কালে ভগবানের যত লীলা প্রকটিত হইয়াছে—সুখে-দুঃখে প্রতিষ্ঠা-বিপ্লবে জয়-পরাজয়ে সম্পদে-বিপদে মিলন-সঙ্ঘর্ষে—উহা সমস্তই যোগের একতায় গাঁথিয়া লইব। অভেদের ক্রোড়ে সকল বিরোধ মিটাইব—স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিব। বিয়োগের আক্রমণ হইতে যদি বাঁচিতে চাও ত এক সুবিস্তৃত গণ্ডী আঁকিয়া নিজেদের একটি কোর্ট প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই কোর্টে—সেই গণ্ডীর মাঝে স্বদেশী ঐশ্বর্য্য সাজাও—স্বদেশী শিক্ষাদীক্ষা বিধিব্যবস্থা বাণিজ্য ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত কর—স্বকীয় ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ম সংযম অনুষ্ঠান কর, বিদেশীর বিশ্লেষ-ছুরিকার আঘাত প্রতিরোধ কর—অন্তর্মুখী হইয়া সাধন কর—দেখিবে শীঘ্রই সেই বিয়োগবিনাশী যোগ-মহিমা তোমার অন্তরকে পূর্ণ করিবে—তুমি সকল ভেদ-বাহুল্যের অধিকারী হইয়া মহীয়ান হইবে—ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে। তোমার অন্তরমুখী সাধনার গুণে এক পাষণ্ডদলনী রিপুসংহারিণী শক্তি জাগরিত হইবে, যাহার বলে যোগবিঘ্নকারীরা প্রতিহত হইবে ও দীনতা স্বীকার করিয়া যোগালয়ের প্রাঙ্গণকোণে আশ্রয় লাভ করিবে—যাহার দোর্দ্দণ্ড তেজঃপ্রভাবে আর্য্যমহিমা আবার প্রকটিত হইবে। এই স্বরাজপত্র ঐ স্বদেশী গণ্ডী আঁকিয়া স্বদেশী কোর্ট প্রস্তুত করিবার উপকরণ যোগাইবে—স্বদেশী ঐশ্বর্য্যের বিন্যাস করিয়া দিবে—বিদ্বেষীদের বিয়োগ-প্রভাব খর্ব্ব করিবে—অন্তর্মুখী সাধনকল্পে সহায়তা করিবে—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা-ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিবে। স্বরাজ পত্রের বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর রণবীরদিগের সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া হইবে। আর তাঁহাদের যত কীর্ত্তি আছে, তাহাও চিত্রিত হইবে। দেবমন্দির তীর্থস্থান পীঠস্থান বিদ্যাস্থান শিল্প বাণিজ্য-স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র গড়দুর্গ—সমস্তেরই আলেখ্য অঙ্কিত হইবে। আর চিত্রিত বিষয়গুলির ইতিহাসও দেওয়া হইবে। ইহাতে দেশের সংবাদ ও দেশের কথার সমালোচনাও থাকিবে। আমরা এই স্বরাজ ব্রতে ব্রতী হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ধনবল জনবল বিদ্যাবল কিছুই

নাই। কেবল মায়ের প্রসাদ ও মায়ের সন্তানদের আনুকূল্যই আমাদের ভরসা।

স্বরাজ গড়

আমার ঘর নাই—পুত্র-কলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া—সেই নিভৃত স্থানে ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম কথাটি ভুলিয়া যাইতে—কিন্তু যত ভুলিতে যাই, তত ঐ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

কথাটি কি। ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।—নির্জ্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম—আসিয়া দেখি যে, আমারি মত দু-চারি জন ভবঘুরে লোক ঐ দৈববাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা—এত বড় বড় লোক থাকিতে আমার স্থায় ধনজনবিহীন গরীবেরাই কেন এই খেয়ালে মজিল।

জানি না—ভগবানের কি উদ্দেশ্য। এই সুসমাচারে সাক্ষ্য আজ আমি দিব। আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবনস্পর্শে যেমন শীতার্ত্ত তরুণ প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জনসমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীরহৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম। মাদৃশ হীনজনের নিকট এত বড় কথার অবতারণা কেন হইল। কিন্তু যখন দেখিলাম যে, আমি একলা নই—আরও আমার মত পাগল আছে—তখন বুঝিলাম, আর এড়াইবার উপায় নাই—এখন দল বাঁধিয়া মুক্তির রোল তুলিতে হইবে—যাহা গোপনে শুনিয়াছি, তাহা ভেরী বাজাইয়া বলিতে

হইবে। আরও যখন দেখিলাম—স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষেপিয়া উঠিতেছে—মুক্তির সমাচারে শত শত নরনারী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছে, তখন বুঝিলাম—উদ্ধারের দিন সন্নিকট। আবার যখন দেখিলাম—আমাদের ফিরিঙ্গী-ভাব-মুগ্ধ বাবুদের দল মুক্তির সংবাদ সহিতে না পারিয়া আমাদের কত কুৎসা রটাইতে লাগিল—নূতন ভাবের ভাবুকদের কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—তখনই রঙ্গ বাধিল—রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ওরা যতই নিন্দা করে—তাড়না করে—ততই প্রাণে প্রাণে সিংহবল জাগিয়া উঠে—প্রাণ যায় সেও স্বীকার—স্বাধীনতার ধ্বজা ভারত-আকাশে উড়াইবই উড়াইব। এ কি বাতুলের কথা! তোমরা আসিয়া দেখ—আমার মর্ম্মস্থল চিরিয়া দেখ—মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঐ কথাটি লেখা রহিয়াছে—স্বাধীনতা—মুক্তি—স্বরাজ।

তোমরা অত ভয় পাও কেন। তোমাদের প্রাণটা একবার খুলিয়া দেখ দেখি। দেখিতে পাইবে যে, তোমাদেরও প্রাণে ঐ মুক্তি-সঙ্গীত বাজিতেছে। তোমরা যে মায়ের ছেলে—ফিরিঙ্গীকে অত ভয় কর কেন। কপটতা ছাড়িয়া দিয়া—এস, সকলে একবার সপ্ত-কোটি কণ্ঠে বলি—বন্দে মাতরম্—মায়ের ছেলে হইব—স্বাধীন হইব—স্বরাজ স্থাপন করিব।

আমি নর্ম্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়াছে। আমি দেখিতেছি—স্থানে স্থানে স্বরাজ-গড় নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সেই সকল গড় যজ্ঞীয় হোমধূমে পূত হইবে—বিজয় সিংহনাদে ধ্বনিত হইবে—শস্য-শ্যামলতায় পূর্ণ-শ্রী হইবে। এস এস সবে—যাহারা মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ—পুরানো বাঁধন ছাড়িয়া সেই স্বরাজ-গড়ের প্রজা হই। কেন আর ভাব—ভাবনায় কি এই সময়? শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যখন বাজে, তখন কি আর

রক্ষা করা যায়? ঐ দেখ, রাখাল-বালকেরা বাপ-মা ঘর-দ্বার ছাড়িয়া রাখালরাজের সঙ্গে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঘরের কাজ করিবার সময় হয় না—খাইবার পর্য্যন্তও সময় হয় না। ওরা কোন বাঁধন মানে না—মানিবার প্রয়োজনও নাই—ওরা যে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়াছে—কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াছে।

যখন ভাই, ঘরে আগুন লাগে, তখন কি আর শান্তশিষ্ট হইয়া বসিবার সময় থাকে—তখন কেবল এলোমেলো চাল—কেবল রোল কেবল গোল। তখন আর পুকুরের জল—কি নর্দ্দমার জল—জ্ঞান থাকে না। কেবল—ঢালো ঢালো, নিবাও নিবাও।

শুনেছি মুক্তির সংবাদ। আমার জপতপ বাঁধন-ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজ গড় গড়িতে—স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান। এস, তোমরাও এস—যদি মুক্ত হইতে চাও—যদি স্বরাজ-গড়ে আসিয়া নূতন তন্ত্র গ্রহণ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও! আর সংশয় করিও না—সংবাদ আসিয়াছে—ভারত স্বাধীন হইবে—বিলম্ব আর নাই।

রামকৃষ্ণ কথা ঃ অবতরণিকা

ভারতেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। ভারতেই বেদবিহিত আশ্রমধর্ম্মের সুদৃঢ় বেষ্টনে উহা সুরক্ষিত হইয়াছে। আর বিধাতার নির্দ্দেশে পৃথিবীতে যত অংশাংশি ভেদবিরোধ আছে, তাহা সমস্তই এই পুণ্যভূমি ভারতে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে পূর্ণতা লাভ করিবে। পরে সেই পূর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ পৃথিবীর সকল জাতিকে নিবৃত্তির আনন্দে সম্মিলিত করিবে। এই কারণেই ভারতে নানা শক্তির নানা জাতির মেলা লাগিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতোপনিষদে ঐ উদার সমন্বয়ের মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্রবলে কতই না নব-নব ভাব-সংঘর্ষ একতায়

পর্য্যবসিত হইতেছে। এখন আবার বিরোধ বাধিয়াছে। নূতন নূতন ভাববিলাসে ভারত আবার আন্দোলিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে—এই আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে? কে আবার ঐ শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত মন্ত্র-বলে এই ভেদবৈষম্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবে?

রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়-বাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছিলেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজ-ভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান্ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না—উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান্ রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।

স্বামী বিবেকানন্দ

এই অশান্তির দিনে উদাসীন কথা লইয়া আলোচনা করা কি সঙ্গত? স্বামীজী কামিনী-কাঞ্চন-বিরক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যথার ব্যথী ছিলেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ফিরিঙ্গি জাতি ভারতের জ্ঞান-বিদ্যা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সভ্যতা-সমাজকে পদদলিত করিতেছে—জগতের নিকটে উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া প্রদর্শন করিতেছে—উহার মূল উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্য স্থূল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর ভারত-সন্তানেরা

কোথায় ইহার প্রতিকার করিবে—না আত্মবিস্মৃত হইয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যথাই তাঁহাকে সাগরপারে সুদূর ফিরিঙ্গিস্থানে লইয়া গিয়াছিল। ঐ মায়াবীদের দেশে গিয়া তিনি একাকী আর্য জ্ঞানের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছিলেন। কে এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ইহার স্পর্দ্ধা ত কম নয়—স্থূলবিজ্ঞানদৃপ্ত ফিরিঙ্গির কোর্টের ভিতরে গিয়া সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন—হিন্দু জাতি জগতের গুরু—একমাত্র হিন্দুর নিবৃত্তিময়ী সভ্যতাই জগৎকে শান্তি ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে।—ঐ বিজয়ভেরীর রব -ঐ সিংহনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ফিরিঙ্গিস্থানের নরনারীরা চকিত স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আর্য জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই—সকল বিজ্ঞান—সকল কর্ম্মকৌশল—বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব দ্বারায় উৎকর্ষ ও চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বামীজী—আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্প-গাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে—তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয়-পর্ব্বতভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার অনুষ্ঠিত ব্রতের সমাধা সহজেও হইবে না। কত বাধা বিঘ্ন জয় করিতে হইবে—কত ব্রতবিদ্বেষী নিশাচর সংহার করিতে হইবে—তবে ত উহার সিদ্ধি হইবে। এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণমনকে ভরপুর করিয়া ফেলে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভিত্তির

উপরে যে স্বরাজ-মন্দির নির্ম্মিত হইবে—তাহার চূড়ায় আর্য জ্ঞানের স্বর্ণকলস দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিবে—উন্নত অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বসিবে—উহার প্রাঙ্গণে ফিরিঙ্গিপ্রমুখ জাতিরা সেবাদাস হইয়া মায়ের প্রসাদ লাভ করিবে।

বিবেকানন্দ কে ?

দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইষ্টিশানে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—শুনিবা মাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার ত অনেক উপযুক্ত বিদ্বান্ গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশানে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে? যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছু দিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্সপার (Oxford) বা কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে বলিয়া স্বীকার করিলেন।

ঐ অধ্যাপকেরা যে সকল চিঠি আমায় লিখিয়াছেন, তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে, বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে অত বড় একটা কাজ হইয়া গেল, তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মত। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই, চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—একবার কলিকাতা সহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।—বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্ব্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি তাহারি জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময়—ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা—দেশের জন্য ব্যথা। আর্য জ্ঞান আর্য্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য্য, তাহাই সূক্ষ্মকে উদারবস্তুকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে, উহাতে মার্কিণ ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে। দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়? যদি হয় ত বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।

বেদান্তের প্রথম কথা

বেদান্ত শুদ্ধ যে একটা দার্শনিক বাদানুবাদ, তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতি বেদান্তের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দুর যোগ-ভক্তি-কর্ম্ম, হিন্দুর সাধন-ভজন-ধর্ম্ম, হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্ণ বিধি—সমস্তই বেদান্ত প্রতিপাদিত শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানের উপরে সংস্থাপিত। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট হইয়াছে। সম্পদে বিপদে প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবে অদ্বৈতমুখীন নিষ্কামধর্ম্ম পালনে হিন্দুত্ব মরণকে অতিক্রম করিয়াছে। কত না সভ্যজাতি কালগর্ভে বিলীন হইল, কিন্তু হিন্দু অমর—কেন না, বেদান্তরস তাহার অস্থিমজ্জাকে সততই স্নিগ্ধ করিতেছে। হিন্দুর দর্শনে ও ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও বিধিব্যবস্থায় বেদান্ত কিরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তাহার সম্যক্‌বোধ আবশ্যক। বেদান্তবিজ্ঞানের এই ধারাবাহিক ব্যবহারসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম না হইলে কোন ফল হয় না—কেবল বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় মাত্র। আমি এই প্রবন্ধে বেদান্তের মূলকথা স্থূলতঃ ব্যাখ্যা করিব। এই ব্যাখ্যা পরে যাহাতে ব্যবহারোপযোগী হয়, সেই দিকে আমার লক্ষ্য রহিল।

বেদান্তবিজ্ঞানের আরম্ভ অজ্ঞানে ও পর্য্যবসান জ্ঞানে।

নৈয়ায়িকেরা অজ্ঞানকে অভাবাত্মক (negative) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত একটি ঘোর প্রমাদ। অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু জ্ঞান ভাবপদার্থ (positive)। আত্যন্তিক অভাব কি কখন ভাবের বিরোধী হইতে পারে। যাহা একান্তই নাই, তাহা আবার কি করিয়া বিরোধ ঘটাইবে। বৈদান্তিকেরা অজ্ঞানকে অভাবাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন না। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসার গ্রন্থে অজ্ঞানকে—"জ্ঞানবিরোধিভাবরূপম্"—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞান আংশিক জ্ঞানরূপেই দৃষ্ট হয়। যখন কেহ বলে, 'আমি অজ্ঞান, আমি জানি না,' তখন সে তাহার আংশিক জ্ঞানেরই

পরিচয় দেয়, কিঞ্চিৎ জানি, কিঞ্চিৎ জানি না'—ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে গেলে, 'আমি অজ্ঞান' এইরূপ বলিতে হয়। মৃত ব্যক্তিকে অজ্ঞান বলা যায় না, কিন্তু মূর্চ্ছিত ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়াছে—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান একান্ত নষ্ট হয় না, কিন্তু সুপ্তভাবে সূক্ষ্মাকারে থাকে। অজ্ঞান জ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব নহে। উহা বস্তু সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান উৎপন্ন করে। পরে দর্শিত হইবে যে, আংশিক জ্ঞান বিপরীত বুদ্ধি বা ভ্রম উৎপন্ন করে। তজ্জন্যই আংশিক জ্ঞান অজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানের বিরোধী।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিরোধকে একত্বে পর্য্যবসিত করা। তজ্জন্য বিরোধকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র সূচিত হয়। বিরুদ্ধ ধর্ম্মীয় বিরোধের অপবাদ করিয়া অভেদভাবের প্রতিষ্ঠাকে অপবাদন্যায় (dialectic) বলে। এই অপবাদরীতি অবলম্বনে বেদান্তবিজ্ঞান ভেদবহুলতাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর একতায় লইয়া যায়—অবশেষে ভূমার অনন্ত অধিকারে সমস্ত দ্বৈতবিরোধের তিরোধান নিষ্পন্ন করে।

পাশ্চাত্য নবীন ন্যায়ের আরম্ভ সদসদ্ বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সৎ (being) অসতের (non-being-এর) বিরোধী—এই সিদ্ধান্তটি উহার মূলে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই সদসতের বিরোধ কাল্পনিক। প্রথমত সৎ কিংস্বরূপ, তাহা আমার জানা প্রয়োজন। আমার জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যদি অস্তিকে ধরিতে যাই, তাহা হইলে শূন্যে লম্ফপ্রদান করা হয়। দ্বিতীয় অসৎ—যাহা সম্পূর্ণ অভাবময়—ন্যায়ের তর্কজাল বিস্তারের একটা কাল্পনিক উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ প্রকার শূন্যতা বিরোধ তুলিতে পারে না। তজ্জন্য জ্ঞান বিরোধী দ্বন্দ্বসঙ্কুল অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান (expericnce) অদ্বৈত-সিদ্ধির উপযোগী সোপান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞান আংশিক জ্ঞান রূপে দৃষ্ট হয়। আবার আংশিক জ্ঞান বিপরীত বুদ্ধি উৎপন্ন করে। "অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ" করিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনে করা যায় যে, সূর্য্য চিরদিন আকাশে একাকী

—যে বস্তু যাহা নয়, উহাকে তাহাই মনে করা বিপরীত বুদ্ধি। ইহার অপর সংজ্ঞা ভ্রম বা অধ্যাস রচিত, তবে আমি যে লেখনীর দ্বারা লিখিতেছি, তাহা লেখনী নহে, কিন্তু সর্প এতদ্রূপ ভ্রম নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে কখন প্রবঞ্চিত করে না। অন্ধকারে রজ্জু সর্পবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ কি এস্থলে আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া ভ্রমে নিক্ষেপ করে?—কদাচ নহে। রজ্জুতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ পঞ্চবিষয়ই বর্ত্তমান। যদি আমি নেত্রত্বগাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা রজ্জুকে পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে রজ্জু রজ্জুরূপেই প্রতীত হইত, সর্পরূপে প্রকাশ পাইত না। অন্ধকারে চক্ষুর যতদূর কার্য্য করা সাধ্য, ততদূর করিয়াছে,—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে না পাইয়া রজ্জুর সর্পসাদৃশ্যকে সর্পদৃশ্যে পরিণত করিয়াছে। যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্ণেয়, তাহাকে একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি কেহ বলে যে, সকল ইন্দ্রিয়গুলি মিলিয়া প্রতারণা করিতে পারে, সে বলার কোন অর্থ নাই। নিখিল মানবকুল যদি প্রবঞ্চক হয়, তাহা হইলে বঞ্চনাকেই সাধুতা বলিতে হইবে। অধ্যাসের অর্থ ইহা নয় যে, যখন একটি অশ্ব দৃষ্ট হয়, সেটি অশ্ব নহে, কিন্তু গর্দ্দভ বা অন্য কোন জন্তু, অথবা তাহা বস্তু-পরিনিষ্ঠিত নহে, কেবল কল্পনা। কোন বস্তু আমার ইন্দ্রিয়গোচর হইবে জ্ঞানের প্রক্রিয়া বা বিষয়-বিষয়ীর সামঞ্জস্যে কোন ত্রুটি বা প্রতারণা ঘটে না। কিন্তু যেক্ষণে আমি ঐ বস্তুকে কোন এক ব্যতিরিক্ত আত্মসঙ্গত পদার্থ বলিয়া ধারণা করি, তত্ক্ষণেই আমার অধ্যাসভ্রম হয়। যাহা অসঙ্গত (contradictory), তাহাকে সঙ্গত (consistent) মনে করা—যাহা অনাত্ম ও অপ্রতিষ্ঠ, তাহাকে আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ধারণা করা—যাহা প্রতিভাসিক (appearance), তাহাকে পারমার্থিক (real) বিবেচনা করা—এতদ্রূপ বিপরীত বুদ্ধিকে অধ্যাস কহে। অন্ধকারে রজ্জু সর্পবৎ প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত সর্পের নিজের

কোন সঙ্গতি বা প্রতিষ্ঠা নাই। তথাপি রজ্জুর আত্মসঙ্গতি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা অনাত্ম সর্পে আরোপিত হয়।

অন্ধের হস্তিদর্শনকথায় অধ্যাসের লক্ষণ অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। একদা সাতজন অন্ধ হস্তিতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়াছিল। কোন বন্ধুকর্ত্তৃক হস্তি সন্নিধানে নীত হইলে তাহাদের মধ্যে একজন হস্তীর কর্ণস্পর্শ করিয়া বলিল—"অহো, হস্তী সূর্পাকার।" দ্বিতীয় অপর একজন শুণ্ডস্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সূর্পাকার নহে, সর্পাকার।" তৃতীয় পাদস্পর্শ করিয়া সদর্পে ঘোষণা করিল—সূর্পও নহে, সর্পও নহে স্তম্ভ"—ইত্যাদি। অন্ধেরা তাহাদের ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক প্রতারিত হয় নাই তাহারা কর্ণাদি অবয়বসকলের যাহা পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। তবে ভ্রম কি প্রকারে আসিল। আংশিক জ্ঞানই এই প্রমাদ ঘটাইয়াছে। অবয়বসকলের আত্মস্থিতি নাই, অবয়বী হস্তীরই তাহা আছে। সূর্পরূপ কর্ণ নিজেতেই স্থিত, আধারের অপেক্ষা করে না—এইরূপ ধারণাই ভ্রম। কর্ণেতে হস্তিত্ব আরোপ, আর অনাত্মে আত্মত্ব আরোপ, একই কথা। যদি অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি পাইত, তাহা হইলে দেখিত যে, তাহারা তাহাদের সূর্প বা সর্পের আকার প্রকার গুণক্রিয়াদির সম্বন্ধে ভ্রান্ত হয় নাই, কিন্তু স্বরূপধারণায় তাহাদের অধ্যাসভ্রম হইয়াছে।

বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, আমাদের সমস্ত ধারণা (logical judgement) এই অধ্যাসরূপ-ভ্রম-বিজড়িত। আমি সূর্য্য দেখিলাম, আর আমার ধারণা হইল যে, সূর্য্য স্বতন্ত্র,—স্বপ্রতিষ্ঠ, আপনাতে আপনি থাকিতে পারে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা আমার অজ্ঞানকে সংশোধিত করিয়া বলিলেন যে, সূর্য্য স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু সৌরজগতের কেন্দ্র। যদ্রূপ গ্রহ তারকাসকল তাহাদের স্থিতির জন্য সূর্য্যের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ সূর্য্যও স্বকীয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের অপেক্ষা করে। এই তত্ত্ব শিখিয়া ও

জানিয়াও সূর্য্যের স্বাতন্ত্র্যের সংস্কার যায় না। জ্যোতিষকে অগ্রাহ্য করিয়া নির্বিঘ্নে মনে মনে করা যায় যে, সূর্য্য চিরদিন আকাশে একাকী সম্বন্ধনিরপেক্ষ হইয়া দোদুল্যমান থাকিতে পারে। বিজ্ঞানের দ্বারা সংস্কার যদি বিশেষ রূপ পরিমার্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সৌরজগৎকে ছাড়িয়া সূর্য্যের ধারণা না হইতে পারে, কিন্তু সৌরজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা আরোপ না করিয়া সূর্য্যের ধারণা হইবে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি অনাত্ম সূর্য্যে আত্মত্ব আরোপ করে। শিক্ষিত ব্যক্তি সৌর জগতে আত্মস্থিতি আরোপ করিয়া সূর্য্যের ধারণা করে।

সকল ধারণার মূলে দেশ ও কাল বর্ত্তমান। দেশ ও কালের ন্যায় ভ্রমাত্মক আর কিছুই নাই। আমি একটি ত্রিভুজ মনে করিলাম। ত্রিভুজটিকে আত্মসঙ্গতি দিয়া কতই চিত্রবিচিত্র করিলাম। অবশেষে দেখিলাম যে, ত্রিভুজটির কোন আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই। উহা এক বৃহত্তর ত্রিভুজ বা বহুভুজের অংশরূপে গৃহীত না হইলে একেবারেই তিষ্ঠিতে পারে না। বৃহত্তর ত্রিভুজের দশাও সেইরূপ। কাহারও আত্মস্থিতি নাই। তবে প্রতিষ্ঠা কোথায়? গত্যন্তর না দেখিয়া আমরা এক স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ বা মহাদেশের কল্পনা করি ও সমস্ত আংশিক দেশ তাহারই অন্তর্গত করিয়া দেখি। এইরূপ অসঙ্গতির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে আমরা কোনপ্রকার ধারণা করিতে অক্ষম। জানি যে, দেশই হউক আর মহাদেশই হউক, যাহা অংশী, তাহা নিজে একটি অংশ—স্বতন্ত্র বা স্বস্থ হইতে পারে না। ইহা জানিয়া শুনিয়া আমরা ভ্রমের পূজা করি, কেন না, আমরা নিরুপায়। আমাদের কাল-সম্বন্ধে ধারণাও এইরূপ ভ্রমমূলক। অধ্যাসমূলক সংস্কারের এত প্রবলতা যে, আমরা ইতরে আশ্রিত পদার্থসমূহকে বিচারের দ্বারা অনাত্ম ও অপ্রতিষ্ঠ জানিয়াও তাহাদিগকে আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ব্যবহার করি। এই কার্য্য কারণশৃঙ্খলান্বিত বিশ্বে কোন বস্তু ব্যতিরিক্ত (individual) আত্মবস্তু নহে। আর অনাত্মের সমবায়ে আত্মস্থিতি গঠিত হইতে পারে না, তবে আমরা মহান্ অনবস্থাগর্ত্তে

ডুবিয়া যাইবার ভয়ে অংশে পূর্ণতা আরোপ করিয়া ব্যবহারোপলক্ষ্যে বস্তুসকলের আত্ম-সঙ্গতি সৃষ্টি করি।

অজ্ঞানের কতক পরিচয় পাওয়া গেল। এখন জ্ঞানের পরিচয় আবশ্যক। জ্ঞানবস্তু পূর্ণ ও সর্ব্বময়। কিছুই জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান আংশিক জ্ঞান হইয়া যাইবে। জ্ঞান বস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ে একাকার। জ্ঞান শুদ্ধ জানা নয়, কিন্তু জানাজানির ভূমানন্দ।

পাশ্চাত্য নবীন দার্শনিকেরা জ্ঞানসম্বন্ধে এক ঘোর প্রমাদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞেয় (object) ও জ্ঞাতার (subject-এর) মুখামুখি স্থিতি (opposition) হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু ইহা আংশিক জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান নহে। ঘট পটাদি অনাত্মবস্তু যতটা আত্মস্থ না হয়, ততটা অজ্ঞেয়। এইজন্য দ্বৈত জ্ঞান আংশিক জ্ঞান। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানে দ্বৈতের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান বস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মুখামুখি স্থিতি হইতে পারে না। যদি হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যতিরিক্ততা ঘটিবে ও জ্ঞান আংশিক জ্ঞানে পরিণত হইবে। আংশিক জ্ঞান (experience) ও জ্ঞানের (knowledge-এর) ভেদ বুঝিতে না পারায় পাশ্চাত্য দেশে অদ্বৈতের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক প্রকার প্রতীচ্য অদ্বৈতবাদ আছে, তাহা জ্ঞানে দ্বৈত আশঙ্কা করে এবং আত্মা চিদানন্দের অতীত কোন অজ্ঞেয় বস্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত করে। জ্ঞানের শুদ্ধাদ্বৈত স্বরূপ না জানায় এই প্রমাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র বেদান্তের ইহাই নিষ্পত্তি যে, চিদানন্দই চরম বস্তু। আচার্য্যদিগেরও এই সিদ্ধান্ত। গৌড়পাদ আচার্য্য জ্ঞানকে তুরীয় অবস্থা বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের ত কথাই নাই। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে ঐরূপ বলিয়াছেন। পঞ্চদশীকার বলেন যে, স্বয়ম্প্রভা সংবিৎই পরমাত্মা।

জ্ঞানাতীত বা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু থাকিতে পারে না। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের পূর্ণ সমন্বয়ই জ্ঞান। জ্ঞান দ্বৈতভেদের

(differentiation-এর) অপেক্ষা রাখে না। তাহার অন্তরেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আদান প্রদান। জ্ঞান আত্মস্থিত, স্বপ্রতিষ্ঠ, আত্ম-সঙ্গত। জ্ঞান পূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, আত্মরত।

জ্ঞানবস্তুর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আংশিক জ্ঞান অসম্ভব। আংশিক জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ণতার দিকেই ধাবিত হয়। আমরা আমাদের সকল ধারণাতেই জ্ঞানময় আত্মত্বকে বরণ করি। অনাত্মে আত্মসঙ্গতি আরোপ না করিলে কোন পদার্থের বোধ হইতে পারে না। অংশের আরম্ভ পূর্ণত্বে ও শেষ পূর্ণত্বে। সর্ব্বময় জ্ঞান না থাকিলে অংশময় ভ্রম বা অধ্যাস কল্পনায় আসে না। দ্বৈতবিশিষ্ট আংশিক জ্ঞান অবশিষ্ট অদ্বৈতজ্ঞানকে অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করে।

এই বিশ্বসংসার জ্ঞানেরই রঙ্গভূমি—জানাজানির এক বৃহৎ আড়ম্বর। ঐ যে শিশু অর্দ্ধস্তিমিতলোচনে স্তন্য পান করিতেছে, আর জননীকে সুখস্পর্শে বিহ্বল করিতেছে—ঐ যে পেটুক পায়সসিক্ত সৃক্কণী লেহন করিতেছে—ঐ যে বিলাসী স্রকৃচন্দনাদি সম্ভোগ লালসায় আকুল হইয়াছে—ঐ যে কঙ্কালসার সমাধিমগ্ন যোগী ভূমানন্দে আত্মহারা হইতে প্রয়াস করিতেছে—এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞান-সাগরের তরঙ্গভঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হর্ষ-শোক, প্রীতি-দ্বেষ, ধর্ম্ম-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা, শীল-সভ্যতা—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এক সুনিয়ত মিলন চেষ্টা মাত্র। অচেতন জড়ও জ্ঞানের অন্তর্গত। বেদান্ত বলেন যে, জড় অস্তিমাত্র নহে, উহা ভাতি অর্থাৎ জ্ঞেয় হইয়া জ্ঞাতাকে সদাই আহ্বান করিতেছে। জড় জ্ঞানপক্ষে একেবারে নিষ্ক্রিয় নহে। জ্ঞাতাই নিজবলে জড়কে জানে, কিন্তু জড় জ্ঞান প্রক্রিয়ায় কোনরূপ কর্তৃত্ব করে না—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। ঐ যে সূর্য্য-চন্দ্র-তারা জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, উহা কেবল জড়ময় ক্রিয়া নহে—উহা পূর্ণজ্ঞান, জ্ঞেয়রূপে স্ফুরিত হইয়া জ্ঞাতৃপক্ষকে আমন্ত্রণ করিতেছে। যদি আমন্ত্রণ না করিয়া জ্ঞাতৃত্বের প্রতিকূল আচরণ করিত, সাধ্য কি যে, কেহ তাহাদিগকে জ্ঞানের অধিকারভুক্ত করে। তরজিত

নদী বা মলয় সমীরণ বা শ্যামল উপবন প্রিয়জনের ন্যায় আদৃত, গৃহীত ও অধিকৃত হইতে ধীরে ধীরে ইঙ্গিতভঙ্গি প্রদর্শন করে বলিয়াই আমি উহাদের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারি। আমি একটি বস্তু জানি, অথচ উহা আমার জ্ঞানাধিকার স্বীকার করে না—ইহা অসম্ভব। চেতন হউক বা অচেতন হউক, সকল পদার্থই ভাতিরূপ—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়স্বরূপে জ্ঞানবস্তুর প্রকাশ। জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে আকর্ষণ করে, জ্ঞেয় জ্ঞাতাকে আহ্বান করে ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। কোন এক পক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে জ্ঞানের স্ফুরণ হইত না। কেহ বলিতে পারেন যে, তপ্ত বালুকারাশি বা পূতিগন্ধ জ্ঞাতাকে আমন্ত্রণ করিবার পরিবর্ত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াই থাকে। তবে সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসব কিরূপ হয়? এখানেও জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের আমন্ত্রণ ও আদান-প্রদান আছে। জ্ঞানের নিষ্পত্তি হইয়া গেলে পর অন্যান্য কারণে প্রত্যাখ্যান ঘটে। জ্ঞানক্রিয়ার সমাধান না হইলে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মিলন না হইলে, বিরক্তি বা প্রীতির স্ফুরণ হইতে পারে না।

এই যে বৃহৎ জগদ্ব্যাপার, ইহা জ্ঞানবস্তুরই উদ্বেলন—জানাজানির বিচিত্র লীলা—জ্ঞানজ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের পূর্ণ সমন্বয়। এই পূর্ণতাই বিষয়-বিষয়িরূপ—দ্বৈতভেদ ক্রমে প্রতিভাত হয়। অন্ধকারে রজ্জুতে যেরূপ সর্প বা যষ্টির ভ্রম হয়, তদ্রূপ অদ্বৈত জ্ঞানবস্তুতে অজ্ঞান-প্রভাবে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদবিলসিত বহুত্বের ভাণ হয়। ব্যবহারিক রজ্জু কেবল ছায়াময় সর্প বা যষ্টি প্রসব করে। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানরজ্জু যাহাতে বিশ্ব আলম্বিত—অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হইয়া ঈশ্বরদেব যক্ষ রক্ষ, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, গিরি-নদী-সাগর-বন, মন-বুদ্ধি-চেতনা-বেদনা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-পাপ-পুণ্য, অহংপ্রত্যয়—ইত্যেবম্প্রকার অস্মদ্-যুস্মদ্ দ্বৈতভাবে (duality of subject and object-এ) প্রতিভাত হয়। এই দ্বৈতপ্রকাশে যে শীতোষ্ণসুখদুঃখাদির অনুবোধ, তাহা স্বপ্নকল্পনা নহে, কিন্তু যথার্থই বস্তুপরিনিষ্ঠিত। তথাপি সর্পের সহিত রজ্জুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক সৃষ্টির সহিত পরম-জ্ঞানের

সেই সম্বন্ধ। রজ্জু স্বরূপ পরিণাম-প্রাপ্ত না হইয়াও যষ্টি বা সর্পরূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অদ্বৈতজ্ঞান অধিকারী থাকিয়াও বহুরূপে ব্যাকৃত হয়। উদয়াস্তহীনা স্বয়ম্প্রভা সংবিৎ অখণ্ড ও সর্বময়ী, কিন্তু আংশিক জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডরূপে গৃহীত হইলে ঈশ্বররূপে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন, অমররূপে স্বর্গভোগ করেন, নররূপে মর্ত্ত্যে বিচরণ করেন, সূর্য্য হইয়া উত্তাপ দেন, চন্দ্র হইয়া মনোহরণ করেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—নিশ্চয়ই এই সমস্তই ব্রহ্ম। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। সেই একই বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়। পূর্ণজ্ঞানময় আত্মা ভিন্ন আমাদের অনুভূতির অন্য কোন বিষয় নাই। তজ্জন্য খণ্ডপদার্থে পূর্ণতা আরোপ না করিয়া আমাদের কোনপ্রকার ধারণা হইতে পারে না। উচ্চ হইতে নিম্নে দেখিলে পূর্ণ অংশের অধ্যারোপ হয়, আর নিম্নদেশ হইতে উর্দ্ধে দেখিলে অংশে পূর্ণের অধ্যাস হয়।

অহো কি মহদ্বস্তু। যাহা অংশত উপলব্ধি হইলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রূপ ধারণ করে, তাহার মহত্ত্বের কে পরিমাণ করিবে? অজ্ঞানপ্রসূত যষ্টি বা সর্পের যোজনায় রজ্জু হয় না। কিন্তু রজ্জুতত্ত্বে যষ্টি ও সর্পদৃশ্যের কোন এক সাদৃশ্যসমন্বয় আছে, তাহা না হইলে রজ্জুতে যষ্টি বা সর্পভ্রম হইত না। চিন্ময় আত্মা সকল যোগ-বিয়োগের অতীত, কিন্তু যাহার গর্ভে এই অনন্তলোকব্যাপী বিরোধ-বিশালতা সমন্বয়লাভ করে, তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানে মনবুদ্ধি নিশ্চয়ই বিলীন হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অজ্ঞান যাহা আংশিকজ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়—তাহা—কোথা হইতে আসিল?

যথায় গভীরতা, যথায় আনন্দ আছে, তথায় উপচয় আছে, উচ্ছ্বাস আছে। লৌকিক ব্যবহারে ইহা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রেমিকের হৃদয় প্রিয়বস্তুর দ্বারায় পূর্ণ। সে মিলনানন্দে মত্ত, তাহার অপর সুখসম্ভোগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে যদি তাহার প্রীতি

ও পুলকের সঞ্চার হয়। তাহার ঐ ছবির কোন প্রয়োজন ছিল না। দশসহস্র ঐপ্রকার ছবি আনীত ও অপনীত হইতে পারে, তথাপি তাহার প্রিয়জনমিলনজন্য সুখের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এইপ্রকার অপ্রয়োজন সত্ত্বেও ঐ ছবি তাহার প্রীতি ও আদরের বস্তু। প্রতিরূপে প্রীতি স্বরূপানন্দের উপচয়মাত্র। তাহা আংশিক ভাবে পূর্ণপ্রেমকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই অংশকে কোটিগুণ করিলে পূর্ণতালাভ করা যায় না। অগণন প্রতিরূপের প্রতি অজস্র উচ্ছ্বাস স্বরূপ-প্রেমের গভীরতায় লুপ্ত হইয়া যায়, কারণ খণ্ডপ্রীতি প্রেমের পূর্ণতা-পক্ষে থাকা না থাকা দুইই সমান। এই লৌকিক দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, গভীরতার উপচয় কাহাকে বলে। আনন্দের উপচয় অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। সচরাচর আমরা প্রয়োজনানুসারে সাবধানে ব্যয় করি। কিন্তু উৎসবের দিনে আমরা প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া বাহুল্য-সম্ভোগে প্রস্তুত হই। অন্নব্যঞ্জন, পিষ্টকপায়স ও সুস্বাদু ফলের ফেলাফেলি ছড়াছড়ি। এই প্রচুর আয়োজন হইতে দুই একটা লেহ্যপেয় অপসারিত করিলে উৎসবের কোন অঙ্গহানি হয় না। এই পৃথিবীতে আমাদের উদরপূর্ত্তি ও বাসনার তৃপ্তির জন্য এত আয়োজন যে, প্রয়োজনের তালিকায় তাহা গণনা করা চলে না। যদি কপাটভাঙ্গা আম বা লিচুফল বঙ্গদেশে না থাকিত বঙ্গবাসীর সুখভোগের বোধ হয় বিশেষ কোন বিঘ্ন হইত না। আমরা প্রবৃত্তির দাস, তজ্জন্য এই বাহুল্যলীলার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পরি না।

চিদ্বস্তুর জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদক্রমে যে আংশিক প্রকাশ হয়, তাহা অনন্ত গভীরতার উপচয়। কিন্তু ঐ উপচিত আংশিক প্রকাশ বিপরীত বুদ্ধি বা অধ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না। হস্তীর জ্ঞান না থাকিলে শুণ্ডকে শুণ্ড বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ঐ অনাত্ম আংশিক অবয়বটিকে আত্মস্থিত সর্পতুল্য কোন পদার্থ বলিয়া ধারণা হয়। স্বরূপের ভেদবহুল প্রতিভাতি অজ্ঞানপ্রভাবেই ঘটিতে পারে, সুতরাং উপচয় বা আংশিক প্রকাশ স্বীকার করিলে অজ্ঞানশক্তি স্বীকার

করিতে হয়। পূর্ণবস্তুসম্বন্ধে যদি পূর্ণজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার বিকাশ বহুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানই কেবল অদ্বৈতকে ঐশ্বর্য্যবিলসিত করিয়া প্রতিভাত করে। এই অজ্ঞান জ্ঞানের আনুষঙ্গিক। অংশ যেরূপ পূর্ণতার মধ্যে বাস করে, ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে অবস্থিত, তদ্রূপ অজ্ঞান জ্ঞানের সঙ্গী। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণতা অংশনিরপেক্ষ—যোজনা করিয়া পাওয়া যায় না। আমি একটি বৃক্ষকে অংশ করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে পূর্ণতা আরোপ করিয়া আমি বৃক্ষ বস্তুর ধারণা করি, তাহা অংশ যোজনায় প্রতিষ্ঠিত নহে। জ্ঞানবস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মারাম, আত্মক্রীড়। তাহার কোন প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা বা অভাব নাই। এই নিষ্প্রয়োজন নিরাকাঙ্ক্ষ পূর্ণতা আছে বলিয়াই উপচয়বাহুল্য সম্ভবে। যাহার প্রয়োজন আছে—অভাব আছে, তাহা অপূর্ণ, তাহার আবার উপচয় কি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রমাদপূর্ণ। তাহা অদ্বৈতকে বস্তুগত দ্বৈতভেদের অপেক্ষী বলিয়া নির্ণয় করে ও জগদ্ব্যাপার যে অজ্ঞান প্রসূত, এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে।

সংক্ষেপে বেদান্তের প্রথম কথা বলিলাম। কিরূপে জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক —অজ্ঞান প্রভাবে ত্রিপাদে বিভক্ত হয় ও কিরূপে জ্ঞানাজ্ঞানের বিরোধসোপান অপবাদচ্ছলে আরোহণ করিয়া তুরীয়ানন্দের একত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয় কথায় যথা সময়ে দেখাইব।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

("সাহিত্য-সভার" পঞ্চমবাৎসরিক দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

(১) অবতরণিকা।

কৃষ্ণতত্ত্ব, অতি নিগূঢ় ও সুগম্ভীর। ঈদৃশ গভীর বিষয়ের আলোচনা মাদৃশ হীনজনের শোভা পায় না। তবে নিজের মত ও আত্মম্ভরিতা পরিবর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের শাসনক্রমে কৃষ্ণরহস্য উদঘাটন করিব মনে করিয়াছি বলিয়াই আমার দুঃসাহস মার্জ্জনীয়। আমি আচার্য্যগণের পারম্পর্য্য স্বীকার করি। তাঁহারা যে সকল মূলতত্ত্বসম্বন্ধে একমত ও একবাক্য, তাহা অবশ্যই শিরোধার্য্য। কিন্তু শঙ্করপ্রমুখ আচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত-বিরোধী মতসমূহ এই প্রবন্ধে স্থান পাইবে না। দ্বৈতভেদসঙ্কুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গণের কৃষ্ণতত্ত্ববুদ্ধি যত দূর অদ্বৈতানুকূল, তত দূর কেবল স্বীকৃত হইবে—অবশিষ্ট এ ক্ষেত্রে গৃহীত হইবে না।

বিংশতিকোটি হিন্দুসন্তান, একহৃদয়ে বিশ্বাস করেন যে—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার। যাঁহার নাম, সমস্ত ভারতকে অনুপ্রাণিত করিতেছে যাঁহার গীতোক্ত নিবৃত্তিমার্গ সমগ্র হিন্দুজাতিকে জ্ঞান ও ও সভ্যতার শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছে—যাঁহার ধর্মপালনে আর্য্যবংশ অমরত্ব লাভ করিয়াছে—তিনি নিশ্চিতই নারায়ণের অবতার। পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অঘটন ঘটাইয়া গিয়াছেন, তাহা সাধন বা সিদ্ধির ফল কখনই হইতে পারে না। ঈশ্বরের অবতরণ বিনা এপ্রকার অমানুষিক অপ্রাকৃত ব্যাপার সম্ভবপর নহে। যিনি সাধনসিদ্ধ, তিনি মহাপুরুষ হইতে পারেন; কিন্তু অবতার নহেন। শ্রীকৃষ্ণ, সাধন বা সিদ্ধির অতীত, কেন না তিনি অবতার।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এই যে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত, তাহার প্রমাণ বা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বেই একটি বিঘ্ন উপস্থিত। সেই বিঘ্নের অপসারণ না করিয়া ব্যাখ্যানকার্য্যে অগ্রসর হওয়া সুপরামর্শ নয়। বিঘ্ন কি?

অধুনা ভারত, অঙ্গলদেশীয় এক নবীন ম্লেচ্ছজাতির করকবলে পতিত। ইহারা প্রবীণ হিন্দুজাতির সমক্ষে শীল, সভ্যতা ও জ্ঞানে বালভাবাপন্ন বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহারা এত বলদৃপ্ত ও ইন্দ্রিয়বিমুগ্ধ যে, পুরাতন হিন্দুজাতির গুরুস্থানীয় হইতে দুঃসাহস করিয়াছেন। এই অঙ্গলদেশীয় ধর্মপ্রচারকেরা হিন্দুত্বের উচ্ছেদ করিয়া পাশ্চাত্য ধর্ম, বিদ্যা ও নীতি এদেশে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। হিন্দুর অদ্বৈতজ্ঞান, আশ্রমধর্ম, নিষ্কামনীতি প্রতীকোপাসনা—এবংবিধ উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসকলের নিন্দা করা এই শ্বেতাঙ্গ প্রচারকদিগের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণের নামে তাঁহাদের কোপবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহারা স্থির বুঝিয়াছেন যে, শাখা-প্রশাখা কর্ত্তন না করিয়া মূলোচ্ছেদ করিলে তাঁহাদের কৃত বিনাশকার্য্য সহজেই সুসাধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, হিন্দুত্বের জীবন্ত মূল। শ্রীকৃষ্ণকে পাড়িতে পারিলে তাঁহাদের জাতীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের জয়জয়কার হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদের যত গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাহা কৃষ্ণপ্রভাব নিরাকরণচেষ্টায় অনুক্ষণ প্রয়োগ করিতেছেন।

প্রথমে তাঁহারা ধুয়া তুলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ বলিয়া কোন ব্যক্তি ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্রকরাচ্ছন্ন নয়ন, কিরণপ্লাবী মার্ত্তণ্ডকে দেখিতে পায় না। তদ্রূপ জিগীষামদান্ধ রাজসিকবুদ্ধি, সুনির্মল কৃষ্ণ-শশি-দর্শনে অসমর্থ। তজ্জন্যই এই নাস্তিকতা। কিন্তু নাস্তিকতার বলে কৃষ্ণনাম বলোপ অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা আবার ধুয়া ধরিলেন যে, কৃষ্ণ বলিয়া এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি দুশ্চরিত্র। আমাদের দেশে নিবৃত্তিবিরোধী কতিপয় ছোট ছোট সম্প্রদায়, প্রবৃত্তিচরিতার্থ করিবার উপায়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছে। তাহারা নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্রে কালিমা লেপন করিয়াছে। সাহেবেরা সেই ঘরের শত্রুদিগকে সহায় করিয়া কৃষ্ণনিন্দার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অনেক

সাম্প্রদায়িক ঈশাচরিত পাওয়া যায়, যাহাতে ঈশাসম্বন্ধে কত অলীক কথা বিবৃত আছে। সেই সকল জীবন বৃত্তান্ত ঈশা পন্থী আচার্য্য-মণ্ডলীর দ্বারা অশাস্ত্রীয় বলিয়া তিরস্কৃত। ভারতেও সেইরূপ অনেক কৃষ্ণচরিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু, বৈদিক আচার্য্যেরা তাহা প্রত্যাখান করেন। সেই অশাস্ত্রীয় গ্রন্থসকল অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণনিন্দা করা অতি অদ্ভুত কার্য্য। উল্লিখিত যুক্তিটি আজকালকার সাহেব-প্রচারকেরা অল্প স্বল্প বুঝিতে পারিতেছেন ও কতক পরিমাণে কৃষ্ণ-কুৎসায় ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু, সাহেব বাহাদুরেরা একেবারে ছাড়িবার পাত্র নহেন।

আবার এক নূতন সুর। শ্রীকৃষ্ণ, সম্ভবতঃ, একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিন্তু তিনি অবতার নহেন ও গীতা তাঁহার শিক্ষা নহে। কৃষ্ণের অবতারত্ব, গীতাগ্রন্থের কল্পনাপ্রসূত। মনুষ্যহৃদয়, স্বতঃই চায় যে, ভগবান অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতিকে পাপ হইতে উদ্ধার করেন। সেই আকাঙ্ক্ষা, গীতায় সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতাকার —তিনি যিনিই হউন না কেন—অবতীর্ণ রূপক লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাটি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন! কিন্তু তাঁহার কল্পনা, ভ্রমক্রমে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছে। গীতাতে যে অবতার-তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে, তাহা জিশুকৃষ্টের জীবনেই সম্যগ্‌রূপে সংলগ্ন হয়। ব্রহ্মের সহিত গীতার কোন সম্পর্ক নাই। গীতাকার, কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া জিশুকৃষ্টেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি জিশুকৃষ্টকে জানিতেন না, তাই কৃষ্ণকে কল্পনাতে অবলম্বন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, গীতা, জিশুসম্বন্ধে এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী। গীতার ভাব জিশুতে পূর্ণতালাভ করিয়াছে। সাহেব-ধর্ম-প্রচারকদিগের এই সুরটা নূতন বটে, কিন্তু অত্যন্ত তালমানলয়হীন। পরে জানা যাইবে যে, ইহাতে কৃষ্ণপরিভব বা জিশুপ্রভাব, একটিও সাধিত হয় না। কৃষ্ণনিন্দার, বোধ হয়, সাহেবদিগের এই শেষ চেষ্টা। কারণ, যেন বিচারপরাস্ত নারীসুলভ এলোমেলো চীৎকার বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, এই নবোদ্ভূত জিশুবিভীষিকানিরাকরণ না করিলে, কৃষ্ণতত্ত্বব্যাখ্যায় বিঘ্ন ঘটিবে।

(২) ঐতিহাসিক বিচার।

সাহেবপ্রচারকদিগের একান্ত বাসনা যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' তাহাদের জিশুকে এদেশে প্রবেশ করাইয়া দেন। কিন্তু কিছুতেই আর পারিতেছেন না। তাঁহারা জাতিধর্ম নষ্ট করিয়া বহির্মুখী সভ্যতার চাকচিক্য দেখাইয়া ভেদবুদ্ধি ও প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষা বিস্তার করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিষণ্ণ প্রযত্ন হইয়াছেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া শাস্ত্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গীতাকে কোন্ হিন্দুসন্তান না মানে! যদি প্রমাণ করা যায় যে, গীতাশাস্ত্র, জিশুখ্রীষ্টেরই পূজা করিয়াছে, কৃষ্ণের নহে—তাহা হইলে হিন্দুবিজয় অবাধে হইয়া যাইবে। দুঃসাহস তো অল্প নয়।

শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার কি না ও গীতা, তাঁহার শিক্ষা কি না—ইহা বিচার করিবার পূর্বে গীতা যে, একেবারেই জিশুকথা নহে,—তাহা দেখাই কর্ত্তব্য।

---

(1) "The truth is that man needs an incarnate saviour : our nature cries in for him ; in his absence the human heart imagines him ; responds of to a mythical representation of such a saviour, and falls down in ardent adoration before the mere imaginatton···········We have sewn us an ineradicable instinct, an inexplicable divine impression that he must be such a saviour."—Permanent Lessons of the Gita, By the FARQUAHAR, M.A.

Rightly read. the Gita, is a clear-tongued prophecy of Christ, and the hearts that bow down to the idea of Krishna are really seeking the incarnate son of God."—Gita and Gospel. —Ibid.

ঈশাপন্থীদিগের নিম্নলিখিত ধর্মমতটি, বোধ হয়, সকলেই শুনিয়াছেন। ঈশ্বর মানবপ্রকৃতি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ও নিজের প্রাণদান করিয়া, মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। পর্কাহার (Farquhar) নামে এক সাহেবপ্রচারক বলেন যে, মনুষ্যহৃদয়, স্বভাবতই এই প্রকার অবতীর্ণ ত্রাণকর্তার জন্য লালায়িত। হিন্দুরা মানুষ; অতএব তাহারাও লালায়িত। আবার—গীতাকার, একজন উচ্চদরের হিন্দু। সুতরাং, তাঁহার উল্লিখিতপ্রকার ত্রাণকর্তৃ-লাভের লালসা, অত্যন্ত প্রবল। সেই লালসার দ্বারা প্রেরিত হইয়া অজ্ঞানতঃ তিনি জিশুতত্ত্ব লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, কেবল ছায়াবলম্বমাত্র। তিনি যদি জিশুর বার্ত্তা জানিতেন, নিশ্চিতই কৃষ্টীয়ান হইতেন।

পর্কাহার সাহেবের কল্পনাময় যুক্তিটি বিচার না করিয়া পরিহাসে উড়াইয়া দেওয়া যায়; তথাপি দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ—ঈশ্বর, মানবপ্রকৃতি গ্রহণ পূর্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন—এরূপ আকাঙ্ক্ষা, মানবহৃদয় নয়, কেবল বোধ হয়, তাহা পর্কাহার সাহেবের মস্তিষ্কে আছে। দ্বিতীয়তঃ, মানবহৃদয়ে ঐরূপ স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে বলিলে, এক ভয়ানক দোষ আসিয়া পড়ে।

পর্কাহার সাহেব বলেন,—ঈশ্বর, প্রায়শ্চিত্তকারী ত্রাণকর্তা হইয়া মানবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বাধ্য। কিন্তু, ভগবানে এই বাধ্য-বাধকতার আরোপ করা কৃষ্টিয়ানশাস্ত্রবিরুদ্ধ। সকল কৃষ্টিয়ান আচার্য্য একবাক্যে বলেন যে—ভগবান মনুষ্যদেহ ধরিয়া জীবকে উদ্ধার করিতে বাধ্য নহেন। এরূপ কার্য্য তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যদি ইচ্ছাধীন না হইয়া, প্রয়োজনবশতঃ হইত, তাহা হইলে ভগবানের অবতরণ, কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িত। কৃষ্টিয়ান আচার্য্য-দিগের মতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা, জীবের থাকিতে পারে; কিন্তু, ভগবান্, অবতীর্ণ হইয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন—এরূপ আকাঙ্ক্ষা, মনুষ্যপ্রকৃতিতে থাকিতে পারে না। কারণ, যে প্রক্রিয়ার

কৃষ্টিয়ানমতে জীবোদ্ধার হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির নিয়মের বহির্ভূত। যাহা প্রকৃতির বহির্ভূত, তাহা প্রকৃতির অধিকারে আসিতে পারে না। পর্কাহার সাহেব, বোধ হয়, কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত। তাই সাম্প্রদায়িক উৎসাহে আচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। গীতার ভাব—গীতার কথা—যিনি জিশুকৃষ্টে সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করেন, তিনি হিন্দু ও কৃষ্টিয়ান উভয় শাস্ত্রই বুঝেন না।

দ্বিতীয়তঃ, অবতরণসম্বন্ধে গীতার শিক্ষা—আর, খ্রীষ্টিয়ানদিগের শিক্ষা—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গীতা, শিক্ষা দেন—ভগবান্, দুষ্কৃতদিগের শাসনার্থ, সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু, কৃষ্টিয়ানেরা বলেন যে—ভগবান, একবারমাত্র মনুষ্য-প্রকৃতিধারণপূর্বক পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাণদান করিয়াছেন। গীতার শিক্ষানুসারে অবতারশব্দগ্রহণ করিলে, জিশু, অবতারপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাঁহার আবির্ভাবতত্ত্ব, সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। পর্কহারপ্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণ, জিশুকে গীতার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবিষ্ট করাইবার যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা সর্বশাস্ত্রবিরোধী। নিশ্চিতই গাঢ়, অজ্ঞানাচ্ছন্ন না হইলে, কেহ এরূপ হাস্যোদ্দীপক চেষ্টায় বিব্রত হয় না।

এই তো গেল—গীতার সহিত জিশুকৃষ্টের সম্বন্ধ। এখন দেখা যাউক, গীতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ।

পর্কাহার সাহেবের মতে গীতা, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক পরে গীতা, লিখিত হইয়াছে। অতএব গীতা, শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে। সুতরাং—গীতা, তাঁহার শিক্ষা হইতে পারে না।

আমরা পর্কাহার সাহেবের যুক্তি শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। কেহই এ কথা বলেন না—কৃষ্ণার্জ্জুন, রথে বসিয়া অনুষ্টুপ্-ইন্দ্রবজ্রা-ইত্যাদি ছন্দে কথোপকথন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় গীতাভাষ্যের উপোদ্ঘাতে বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন,

তাহা ব্যাসদেব, শ্লোকাকারে পরিণত করিয়াছেন।' ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে গীতা, ঠিক্ শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে, অথচ উহা তাঁহারই শিক্ষা[২]। শ্রীকৃষ্ণের ঠিক মুখের কথা নহে বলিয়া, গীতা, তাঁহার শিক্ষা নহে—এরূপ তর্ক, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। গীতা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কত বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে, তাহার আপাততঃ বিচারের প্রয়োজন নাই; কিন্তু, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে ছন্দাকারে লিখিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু গীতা, শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে—অতএব ইহা তাঁহার শিক্ষা নহে—এরূপ সিদ্ধান্ত, অত্যন্ত অর্থহীন।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে—যদি গীতা, শ্রীকৃষ্ণের ঠিক্ মুখের কথা নহে, তবে গ্রন্থমধ্যে "শ্রীভগবান্ উবাচ"—"অর্জ্জুন উবাচ" এইরূপ লিখিত হয় কেন? ভগবান্ ব্যাস শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্ম ছিলেন। সুতরাং, যদিও তিনি কৃষ্ণকথা, ছন্দে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অণুমাত্র ভ্রংশদোষ ঘটে নাই। বিন্যাসে তাঁহার অধিকার ছিল। কেন না, যোগপ্রভাবে তিনি কৃষ্ণভাবময়তা লাভ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কথা, ব্যাসদেব, যেরূপ লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লেখক হইলে, তদ্রূপই লিখিতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নে ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদভাব। তজ্জন্যই ছন্দোবদ্ধ গীতা, কৃষ্ণার্জ্জুনের উক্তি বলিয়াই পরিচিত।

ভগবান্ ব্যাস, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ, প্রথমে উপনিষদ্রূপে লিখিয়াছেন। মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই জন্যই গীতার প্রত্যেক অধ্যায়সমাপ্তিতে—"ইতি ভগবদগীতাসূপনিষৎসু"—ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিত হয়। এই গীতোপনিষৎ, ব্যাসদেবলিখিত চতুর্ব্বিংশতি চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র-শ্লোকাত্মক 'ভারতের' অন্তর্গত। কারণ, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব, যে আটশত শ্লোকে ভারতের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে অর্জ্জুনের বিশ্ব-

(২) "তং ধর্ম্মং ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ"। গীতাভাষ্য।

রূপদর্শনের কথার উল্লেখ আছে। তথাপি কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ একটি স্বাধীন উপনিষৎ গ্রন্থ, চিরকালই আদৃত। এই ব্যাসরচিত গীতোনিপষৎ, সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে নূতন তেজে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই ব্রহ্মগীতা, সংশয়তাপে তাপিত লোকপুঞ্জকে ধর্ম্মপাদপরূপে অদ্যাপি আশ্রয়দান করিতেছে। ব্যাসশিষ্যগণকর্তৃক লালিত পালিত হইয়া ঐ গীতাকল্পতরু ক্রমশঃ পল্লবিত, কুসুমিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কালে কালে যত মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে লাগিল, আমাদের বিরোধসমূহ, গীতার অভেদবিশালতায় একতালাভ করিল। তজ্জন্যই ব্যাসলিখিত ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, সমন্বয়মীমাংসার আকার ধারণ করিয়াছে। সেই মূল, সেই স্কন্ধ, সেই তরু! কেবল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বসকল, শাখা-প্রশাখারূপে শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা পক্ষেপদোষবিবর্জ্জিত, বিকাশ-চেতনাসম্পন্ন এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া দেখিলে নিশ্চিতই প্রতীতি হইবে—গীতা, ক্রমবিকসিত ব্যাসরচিত কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার কালনির্ণয় করিতে গিয়া এক বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কোন পুরাতন বটবৃক্ষের নবীন পল্লব দেখিয়া বয়স নির্দ্ধারণ করিলে নিশ্চিতই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তদ্রূপ মূল ও সারকে উপেক্ষা করিয়া কালবিকসিত কোন তত্ত্বকিসলয় দেখিয়া গীতার সময়নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া অর্ব্বাচীনের কার্য্য।

কৃষ্টীয়ান্‌শাস্ত্রে এইরূপ ক্রমবিকাশ ও ব্যাকৃতির কথা শোনা যায়। জিশুর চারিখানি জীবনী আছে। চতুর্থখানি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য যোহন্‌-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু, অনেক কৃষ্টীয়ান পণ্ডিত-দিগের মত যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার বিবৃত বিষয়গুলির বিস্তার ও বিন্যাস সম্পাদন করিয়াছেন। যোহনের তিরোভাবের পর অনেকানেক সম্প্রদায়, অশাস্ত্রীয় তত্ত্বসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদিগের নিরাকরণার্থ যোহনকথিত জিশুর উক্তিসকল, নানাভাবে বিস্তারিত হইয়াছে। মূল যাহা, তাহা ঠিক্ রাখিয়া সম্প্রদায়বিরোধ

দূর করিবার জন্যই ঐ জীবনীতে তত্ত্বমীমাংসা বিমিশ্রিত করা হইয়াছে। যোহনের জীবনী, বিশেষভাবে জিশুকৃষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করে। তজ্জন্য ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আদৃত। কিন্তু, প্রথমে ইহার অধিক প্রসিদ্ধি ছিল না। কৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন প্রধান আচার্য্য যশস্তন (Justin Martyr) অপর তিনখানি জীবনীর বিশেষ সমাদর করিয়াছেন; কিন্তু, এই চতুর্থখানির উল্লেখ বড় একটা করেন নাই। তজ্জন্য অনেক কৃষ্টিয়ান পণ্ডিত, অনুমান করেন—যোহনের জীবনী, শিষ্যগণকর্তৃক বিস্তারিত হইবার পরে সমাদর আকর্ষণ করিয়াছে। তাহাতে ক্ষতি কি? যদি মূল সত্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে আকারপ্রকারের ভিন্নতায় কি আসিয়া যায়? বরং, অধিকতর ব্যবহারোপযোগী হয়।

আর একটি কথা। পর্কাহার সাহেব বলেন—যদি গীতা নারায়ণের অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা হয়, তবে ইহাকে শ্রুতি না বলিয়া স্মৃতি বলা হয় কেন? সাহেবেরা এত মদমত্ত যে, না শিখিয়াই—না বুঝিয়াই—ছল ধরিতে প্রস্তুত।

শ্রুতি অনাদি। সৃষ্টির প্রারম্ভে ইহা শব্দযোগে প্রকটিত হইয়াছে। ইহা কর্ম্ম ও জ্ঞানাত্মিকা। কালক্রমে কর্ম্মপ্রবণ প্রবৃত্তিমার্গ, প্রবলতা লাভ করে ও জ্ঞানমুখীন নিবৃত্তিমার্গের পরিভব হয়। মানবের হীনবুদ্ধি, জ্ঞান ও কর্ম্মের যে বিরোধ বাধাইয়াছিল, তাহার সামঞ্জস্য, গীতাতে সাধিত হইয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ, নূতন কথা কিছু বলেন নাই; কেবল অনাদি শ্রুতির পৌর্ব্বাপর্য্য সমন্বয় দেখাইয়াছেন। স্মৃতি, শ্রুতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অতএব গীতা স্মৃতি—শ্রুতি নহে।

এইবার মূলে আঘাত। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন। সাহেবেরা বলেন, পুরাতন গ্রন্থসমূহে অবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কোন উল্লেখ নাই। কেবল সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগ্রন্থে তিনি অবতার বলিয়া সম্মানিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা হিন্দুর ইতিহাসের কথা একেবারেই বুঝিতে পারেন না; বরং বিপরীতই বুঝেন। শ্রীকৃষ্ণ, অতি পুরাতন

কাল হইতেই, অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইহা দেখিয়াও দেখেন না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, জিশুকৃষ্টের প্রায় দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। এই মত, কোন প্রকারেই স্বীকার করা যায় না। দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে কুরুক্ষেত্রের নেতা শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লন পণ্ডিত বলেন যে, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে যুধিষ্ঠির রাজ্য করিয়াছিলেন। এখন কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। অতএব প্রায় সার্দ্ধচতুঃ-সহস্র বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রব্যাপার ঘটিয়াছিল। অন্যত্র, বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ু-পুরাণেও এইরূপ গণনা আছে। দ্বাপর ও কলির সন্ধি বা কলির প্রারম্ভ বলিলে ঠিক যে দিন, দ্বাপর শেষ হইয়াছে বা কলির আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝায় না। সন্ধি অর্থে মিলন। নূতন যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পূর্বযুগ, পরের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিত থাকে; এইরূপ চলিত হয়। আর কলির প্রারম্ভ বলিলে, প্রাদুর্ভাবের আরম্ভ বুঝিতে হইবে। অতএব কলির ৬৫০ বৎসর গতে অর্থাৎ দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল —এই পৌরাণিক মত, সর্বতোভাবে গ্রহণীয়।

আমরা এই সমস্ত প্রমাণ ত্যাগ করিয়া সাহেবদিগের অনুসরণ কেন করিব? যাহারা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবজাতি, সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা কূপমণ্ডুক। তাহাদের চীৎকারে কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

সার্দ্ধচতুঃসহস্রবৎসর পূর্ব্বে দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় অদ্ভুত সমন্বয়ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঋষিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। সেই যুগসন্ধিতে ভগবান্ ব্যাস বেদবিভাগ করেন। তখনই জ্ঞানরত্নাকর 'ভারত' রচিত হয়। সেই যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি ভারতকে স্নিগ্ধ

করিতেছে। পরবর্ত্তিকালে যত ধর্ম্মের আন্দোলন হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণপাদবিনিঃসৃতা জ্ঞানগঙ্গার বীচিবিক্ষোভমাত্র। অবতারের আগমনে এইরূপই প্রলয় ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'খিলসূক্তে' পাওয়া যায়। "কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে" ইহা খিলসূক্ত বটে, কিন্তু সর্বজনমান্য। আধুনিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়সকল পরামর্শ করিয়া যদি ঋগ্বেদে এই সূক্ত বসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে কেহই তাহা মানিতেন না। ইহা বেদবিভাগের সময় হইতে সূক্তরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে। আবার, ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয় যে, 'আঙ্গিরস ঘোর' "পুরুষযজ্ঞের" কথা 'দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে' বলিয়াছিলেন। "ছান্দোগ্য" শ্রুতিতে পুরুষ নিজেই, আধ্যাত্মিক যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছেন। তাঁহার জীবনায়ুঃ গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ—'আর্জ্জব-অহিংসা-সত্যবচন' ইত্যাদি দক্ষিণা কর্ম্মকাণ্ডের সুগভীর অর্থ, 'উপনিষদে' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রুতির এই গূঢ় সমন্বয়, যথাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া, ধর্ম্মরাজ্যে যুগপ্রলয় ঘটাইয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ, ধর্ম্ম ও সাধনমার্গকে আপৎসঙ্কুল করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত বিরোধের সামঞ্জস্য পূর্বক সাধনপথ সরল ও সুগম করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞানকর্ম্মময়ী শ্রুতির নিগূঢ় ঐক্য, পুরুষযজ্ঞে আভাসিত। শ্রীকৃষ্ণ সেই অন্তর্নিহিত ঐক্য উদ্ঘাটিত করিয়া সকল বিরোধের সমাধান করিয়াছেন। তিনিই পুরুষমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। গীতায় এই যজ্ঞতত্ত্বের বিশেষ উপদেশ আছে। ভাগবতেও এই যজ্ঞপুরুষের কথা পাওয়া যায় (১-৫-৩৮)। মায়ার অতীত না হইলে, এই অবিদ্যাপারগামী অভেদতত্ত্বদর্শন সম্ভবে না। তজ্জন্য শ্রুতিও, প্রশংসার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন অপেক্ষা করেন। আঙ্গিরস, পুরুষযজ্ঞের কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন বলিয়া য়ুরোপীয়েরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ 'আঙ্গিরস ঘোরের' শিষ্য ছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, পুরুষযজ্ঞের প্রশংসার্থই

শ্রুতিতে কৃষ্ণঘোরসংবাদ লিখিত হইয়াছে। আর, এই সংবাদ বর্ণিত আছে বলিয়া, ছান্দোগ্যশ্রুতি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে রচিত হইয়াছে —এইরূপ সিদ্ধান্ত, সমীচীন নহে। বেদশাখীরা এই প্রশংসাসূচক বাক্য প্রক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা অনুমিত হয়। প্রশংসার্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণঘোরসংবাদ, শ্রুতির অন্তরঙ্গ নয়। ঈদৃশ সতর্ক অনুকূল প্রক্ষেপে মূলের কোন ক্ষতি হয় না; বরং শোভাই বৃদ্ধি পায়। কারণ, বেদশাখিগণ—বেদবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক নহেন; কিন্তু তাঁহারা বেদরক্ষক। তাঁহাদের দ্বারা শ্রুতি বিকৃতি সাধিত হইতে পারে না। কৃষ্টীয়শাস্ত্রে এই প্রকার প্রক্ষেপ অনেক লক্ষিত হয়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় কাঠকে ধৃতরাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায় ও "শতপথ ব্রাহ্মণে" পাণ্ডবদিগের নাম দৃষ্ট হয়; কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের কোন উল্লেখ নাই। অতএব তিনি বড় একটা প্রসিদ্ধলোক ছিলেন না, সাহেবেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে কৃষ্ণকথা থাকিবার যে কোন প্রয়োজন নাই, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। আর, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক বিচারের পর এখন স্থির করিয়াছেন যে, কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ, তৎকালীন গ্রন্থাদিতে না পাইলে, তাহা অঙ্গীকার করা সুপরামর্শ নয়। জিশুর তিরোভাবের পরে অল্লাধিক শত-বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উক্তি, শাস্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইতে দৃষ্ট হয় না।[৩] খৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত আচার্য্য থিয়পীলস্ (Theophilus) স্বীয় গ্রন্থে জিশুর নামপর্য্যন্ত করেন করেন নাই। সাহেবরা কি বলিতে প্রস্তুত আছেন যে, এই কারণে জিশুখ্রীষ্ট প্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না?

এখন দেখা যাউক, শ্রুতিপূজিত শ্রীকৃষ্ণ, অন্যত্র কিরূপ সম্মানিত। পাণিনির এক সূত্র আছে—"বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্।"[১] শ্রীকৃষ্ণের

(3) The Epistle of Barnsbas (A.D. 130) IV. 14, is "our earliest instance of the citation of Sayings of Christ as scripture,—"The Early base of the Gospels" by V. H. STANTON D. D.

উপাসক জ্ঞাপনার্থ পাণিনি এই পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অবতার। পাণিনি, শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের সম্মানার্থ যখন পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে, পাণিনির সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পাণিনি, আবার মহাভারত ও পাণ্ডবদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত দহলমান (Dahlmann) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির বহুপূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতে ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত অপরাপর ভারতদ্বেষী পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, অনিচ্ছার সহিত স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, সূত্রে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েরই নাম আছে। কৃষ্ণ যখন অবতার, তখন অর্জ্জুনকেও আর এক জন বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহা হইলে পাণিনির মতে কৃষ্ণ, সর্ব্বেসর্ব্বা নহেন। অর্জ্জুনও, তাঁহার সমকক্ষ। এই প্রকারে তাঁহারা আপনাদের গায়ের জ্বালা নিবারণ করেন। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, এমন অভক্তদিগের হাতে শাস্ত্রবিচারের ভার পড়িয়াছে। মহাভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় অর্জ্জুনের অবতারত্ব কল্পনা করেন নাই। আর কোন হিন্দু কোন কালে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ ভাবিয়া নাস্তিকতার ঘোর পাপে মগ্ন হয় নাই। অর্জ্জুন, নরশ্রেষ্ঠ নর ; নরভিন্ন নারায়ণ থাকেন না। ইহাই তো সকলে জানে ও বলে। অর্জুনে কৃষ্ণতুল্যতা আরোপ করা হয়, ইহা বাতুলের, নয়, পাষণ্ডের কার্য্য।

ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতের রচয়িতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাণিনির মতে ঐ মহাভারতেই শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, মানবলীলা সংবরণ করিবার পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে বৈয়াসকি আদিম ভারতে শ্রীকৃষ্ণ কেবল

মানুষরূপে বর্ণিত আছেন। উহা ঘোর প্রমাদ। পাণিনির সিদ্ধান্ত অকাট্য। পাতঞ্জলিও শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (পাতঞ্জল সূত্র ১—৪—৯২। ৪—১—১৪। ৫—৩—৯৯)। অপরের আর কথা কি ?

এই তো গেল—হিন্দুদিগের সাক্ষ্য। এখন যবন ও বৌদ্ধদের সাক্ষ্যের কথা বলা প্রয়োজন। গ্রীক-যবন মেগাস্থিনিস্ (Megasthenes) চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, মথুরা কৃষ্ণপুরে কৃষ্ণপূজা প্রচলিত ছিল। এই শ্রীকৃষ্ণপূজা-বিষয়ে উক্সপারের (Oxford) অধ্যাপক মকদানল (Macdonell) বলেন—সম্ভবতঃ, কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই পূজিত হইতেন। ইহা যীশুপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম, ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। ব্যাপারটা যদি এত গুরুতর, তবে আদিম বৌদ্ধ শাস্ত্রে কৃষ্ণের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন—এই আপত্তি করিয়া মগদানল সাহেব সম্ভবতঃ বিশেষণটি সংলগ্ন করিয়াছেন। আবার উল্লেখানুল্লেখের কথা। বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণের নাম কেন করিবে ? কিন্তু, নাম না করিয়া থাকিতে পারে নাই। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ সূত্রপিটকে কৃষ্ণ, অসুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহারা ঈশ্বর মানে না—অবতার মানে না—তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ, অসুর ভিন্ন আর কি হইতে পারেন ? আস্তিক যাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন, নাস্তিক তাঁহাকেই অসুর বলিয়া ঘৃণা করে।

এখন সমালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণপ্রসিদ্ধি নূতন নহে, কিন্তু অতি পুরাতন। যিনি শ্রুতির দ্বারা পূজিত—যাঁহাকে ভগবান্ ব্যাস, নারায়ণের অবতার বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন—'গীতোপনিষদে' যাহার সমন্বয় সকল ভেদবাদকে জয় করিয়াছে ও করিবে—পাণিনিপ্রমুখ ঋষিরা যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন—যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আজিও সম্মানিত—যাঁহার প্রভাবে হিন্দুজাতি, জ্ঞান ও সভ্যতায় অত্যুন্নত—তিনি যদি অবতার নহেন, তো অবতার আর কে হইবে ?

(৩) অবতার-তত্ত্ব।

এতক্ষণে বোধ হয়, কৃষ্ণপ্রভাবগুণে সকল বিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে ও তত্ত্বনির্ণয়ের সুযোগ আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার—ইহাই মূল তত্ত্ব। এ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মত অনেক আছে, কিন্তু ঐ সকল মত, নিবৃত্তিমুখীন নহে বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। অদ্বৈতবাদি আচার্য্যগণ নিবৃত্তিপথে কৃষ্ণপদানুসরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া অবতারতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বস্তু এক—দুই হইতে পারে না। একই, বহু হইয়া প্রতিভাত। ঐ অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, অংশতঃ প্রতীত হইলে, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, অমররূপে স্বর্গে বিহার করেন ও নররূপে মর্ত্তে বিচরণ করেন। ঐ পূর্ণসত্তা, খণ্ডভাবে গৃহীত হইলে, তপন হইয়া উত্তাপ দেন, চন্দ্র হইয়া কৌমুদী বিকিরণ করেন, সমুদ্র হইয়া উত্তাল তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করেন ও পর্ব্বত হইয়া মতভেদ করেন। অহো কি মহদ্বস্তু! আংশিক জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ হইলে যাহা কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধারণ করে, তাহার আরম্ভ, মধ্য বা অন্ত কোথায়? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সমস্তই ব্রহ্ম।

যখন সমস্ত বিশ্বই তাঁহার রূপ—যখন তিনি ঘটে ঘটে অবতীর্ণ—তখন আর কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অবতার বলা হয় কেন?

গীতাতে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যথা:—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(ভগবদ্গীতা—৪র্থ অধ্যায়—৬।৭।৮)

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশসাধন ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে, ঈশ্বর, নিজ মায়াকে বশীভূত করিয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

অবতরণের প্রয়োজন ও লক্ষণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন—নিঃশ্রেয়স সাধনের অভাবকে ধর্ম্মের গ্লানি কহে। যে সাধনের দ্বারা সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাহার নিঃশ্রেয়সসাধন। ইহা স্বর্গ-ভোগকে তুচ্ছ করে ও মায়ার অতীত ব্রহ্মপদের দিকে ধাবিত হয়। যখন মানবকুল, সম্ভোগপরায়ণ হইয়া, নিঃশ্রেয়সসাধনকে ত্যাগ করে ও প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করে, যখন ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা, ধর্ম্মসাধন বলিয়া স্বীকৃত হয়, যখন জ্ঞানের শাসন অতিক্রম করিয়া, ধর্ম্মযাজকেরা, কর্ম্মের আড়ম্বরজালে বদ্ধ হন—যখন গুরুপদাভিষিক্ত আচার্য্যগণ, নির্ব্বাণমুক্তিতত্ত্ব অগ্রাহ্য করিয়া, ঐহিক সুখভোগবাসনায় ব্যস্ত হন—তখনই আশ্রমধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; ভোগবিলাস ও ব্যভিচার, প্রবলতা-লাভ করে; সমাজদ্বেষী শঙ্করজাতির উৎপত্তি হয়; সম্প্রদায়ভেদ ও ও স্বার্থবিরোধ, স্বদেশকে সমাচ্ছন্ন করে। এই ঘোর দুর্বিপাকে মানবকুলের উদ্ধারসাধন কে করিতে পারে? যিনি মায়াধীশ তিনিই পারেন।

মানুষ, স্বভাবতঃ প্রবৃত্তিপরায়ণ। পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গলাভের এষণা তাহাকে সদাই চালিত করিতেছে। প্রবৃত্তির হস্ত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়—ধর্ম্ম। প্রবৃত্তিকে একেবারে দলিত করিতে গেলে, মানবপ্রকৃতি, ধর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য সমাজকে এমন ভাবে নিয়মিত করিতে হয় যে, প্রবৃত্তি-প্রণোদিত কর্ম্মসকল ধীরে ধীরে অতর্কিতভাবে নিষ্কামতা লাভ করিতে পারে। যদি কেবল নিবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে সংসার ও কর্ম্মের লোপ হইবে। আর, যদি কেবল প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে অনাচার ও অত্যাচার, সমাজকে বিনষ্ট করিবে। তজ্জন্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির—কর্ম্ম ও জ্ঞানের—সামঞ্জস্যকে

'ধর্ম্ম' কহে। যাহা সংসারকে ধারণ বা রক্ষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই, প্রবৃত্তি ও তৎপ্রেরিত কর্ম্মসকলকে বিধিনিষেধক্রমে নিবৃত্তিমুখীন করিয়া দেন। যিনি সমাজকে এই সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও উহাকে জ্ঞানকর্ম্মের সন্ধি সূত্রের দ্বারা নিয়মিত করিতে পারেন, তিনিই ধর্ম্মসংস্থাপয়িতা। কিন্তু, ধর্ম্মসংস্থাপন সহজে হয় না। অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ঘোর দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড সকলের অভ্যুদয় হয়। তাহারা নিবৃত্তির নামে খড়্গহস্ত। তাহাদিগের বিনাশসাধন ও প্রপীড়িত সাধুদিগের পরিত্রাণ না করিলে, ধর্ম্ম, সংস্থাপিত হইতে পারে না।

অবিদ্যার বন্ধন অবিদ্যার দ্বারা কাটা যায় না। নিজেকে নিজে অতিক্রম কে করিতে পারে? অবিদ্যাজনিত কর্ম্ম বা সাধনের বলে অবিদ্যাকে উল্লঙ্ঘন করা অসম্ভব। সকল ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলে—সকল ভেদবুদ্ধির অপগম হইলে—অবিদ্যার উপরে উঠা যায়। কিন্তু, কর্ম্মের দ্বারা অবিদ্যাপাশ হইতে কখনই মুক্ত হওয়া যায় না। কর্ম্ম, ভোগফল প্রসব করে ও যেখানে ভোগ, সেখানে অভেদজ্ঞান আসিতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত আচার্য্যেরা সকলেই স্বীকার করেন। জীব, যখন কর্ম্মবশে প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে, সাধ্য কি যে, সে আর সুকৃতি বা পুণ্যের বলে নিবৃত্তির অভিমুখে গমন করে! মায়ার অধীশ্বর যদি প্রসাদবিতরণ না করেন, যদি ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবদ্ধ জীবের অন্য উপায় নাই। যখন এই বৃত্তিপরায়ণতা সমস্ত দেশকে অভিভূত করে, ঘোর অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ উৎপাটিত হয়—লোকসমূহ, ভেদ-বিরোধের দিকে ধাবিত হয়—তখন ঈশ্বরের অনুকম্পা ঘনীভূত হইয়া 'রূপ' ধারণ করে। যে রূপ, আত্মদৃষ্টিহীন মানুষও দেখিতে পারে, দেখিয়া বিবেকজ্ঞান লাভ করে। যে রূপের প্রভাবে প্রবৃত্তি ও তাহার অত্যাচার প্রশমিত হয় ও মানববুদ্ধি, নিষ্কাম ও নিবৃত্তির পথ অনুসরণে সমর্থ হয় ঈশ্বর, অবিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। জীব, অবিদ্যার নিম্নে অবস্থিত। ঐ ঈশ্বরত্ব যদি জীবত্বে মিলিত হয়,

তবেই জীব, অবিদ্যার উৰ্দ্ধদেশে আরোহণ করিতে পারে। মায়ার অতীত কোন অপ্রাকৃত আয়োজন বিনা মায়ার ডোর ছেদন করা যায় না। প্রবৃত্তিকে নিষ্কাম কর্ম্মে নিয়োজিত করা যায় না। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগকে নিবৃত্তিমুখীন করিয়া পরমার্থের দিকে প্রেরিত করা যায় না ও ধর্ম্মবিঘ্নকারী বিদ্রোহ দলন করা যায় না। এই আয়োজন বা হরিকৃপায় অবতরণ দর্শন প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় হইলে, আপামর-সাধারণের পক্ষে বিশেষরূপ উপযোগী ও উপকারী হয়। তজ্জন্যই মায়াধীশ, নিজমায়াকে বশীভূত করিয়া, মায়ার অন্তরে প্রবেশ করেন। কিন্তু, তাঁহার জন্ম, কর্ম্মবশে হয় না। তিনি স্বেচ্ছায় মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হন। কোন সাম্প্রদায়িকেরা মনে করে যে, অবতারের মনুষ্যত্ব বাস্তবিক নহে; কিন্তু, একটা লোকদেখান প্রয়োচনামাত্র। ইহা এক ঘোর ভ্রান্তি। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করিবার জন্যই ঈশ্বর, অবিদ্যাকে অধিকার করেন। যদি সেই অধিকার, বাস্তবিক না হয়, তাহা হইলে অবতারণের সার্থকতা কোথায়? ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বের মিলনপ্রভাবে জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হয়। সুতরাং, মনুষ্যত্বের বাস্তবিক অঙ্গীকারকে ঈশ্বরের অবতরণ কহে। ঈশ্বর, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিলে, বুঝিতে হইবে যে, যিনি বিশ্বরূপ, তিনি বাস্তবিক মানুষ হইয়াছেন। তিনি আপনাকে মনোবুদ্ধিদেহ সংবলিত এক বিশেষ ব্যক্তিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতাতে তাই—"আত্মানাং সৃজামি"—এইরূপ—লিখিত আছে। আবার, যদি অবতার কেবল প্রাকৃত জীবের ন্যায় হন, তাহা হইলেও অবতরণ নিষ্ফল হইবে। অবতারের ব্যক্তিত্ব অপ্রাকৃত ও ঈশ্বরত্বময়। উহা যথারীতি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, কর্ম্মের বশে আসে না। তাহা জ্ঞান ও প্রেমে ভূষিত; কিন্তু, সাধন বা সিদ্ধির অতীত। অবতার, অবিদ্যাকে গ্রহণ করেন ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন; কিন্তু অবিদ্যাপ্রসূত কর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিনা সাধনে—বিনা চেষ্টায়—অবতারবিগ্রহে ঈশ্বর ও

জীবের ঐক্য স্থাপিত হয়। ঈশ্বর, স্বীয় কর্ম্মসচিবকে পরিহার করিয়া নিজসঙ্কল্পে অবতাররূপে প্রকাশিত হন। জীব গোস্বামী "কৃষ্ণসন্দর্ভে" অবতারের অপ্রসিদ্ধ মানুষত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবতার, যথার্থ মানব পুরুষত্ব। পুরুষ, কিন্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতত্বরহিত।

শঙ্করাচার্য্য, স্বপ্রণীত গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব,'—বিষ্ণু অংশরূপে কৃষ্ণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। গীতাতে বাসুদেব, বিভূতির মধ্যে গণিত হইয়াছেন। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ" (১০-৩৭)। মহাভারতে স্বর্গারোহণপর্ব্বে (৫-২৩) বর্ণিত আছে—"যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনা। প্রায়শেঃ বাসুদেবস্তু কর্ম্মণোঽন্তে বিবেশ হ।' পরব্রহ্মের ত্রিপাদ অপ্রকাশিত ও একপাদমাত্র ব্যক্ত হয়। তুরীয়পাদ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বিরাট্ ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্ষু দশনকল্পিত সর্পের ন্যায় অলীকভাব প্রাপ্ত হয়। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—"যারা পাঁচ ভেঙে এক করে মাগো! তাদের হাতে তুমি কেমনে বাঁচ।" আর? ব্রহ্মতত্ত্বে সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী জগন্মাতা কালিকাও অন্তর্হিতা হন। অদ্বৈতদৃষ্টিতে আস্তম্বব্রহ্মপর্য্যন্ত সদ্বস্তুর আংশিকরূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই জন্যই অবতারকে নারায়ণের অংশ বলে। কিন্তু "অংশেন অবতীর্ণ" ধরিলে অবতারে ও মহাপুরুষে বা সিদ্ধপুরুষে কোন ভেদ নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত অনুচিত। শঙ্কর যে "অংশেন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আনন্দগিরি তাহার অর্থ করেন—প্রয়োজন জন্য বা কর্ম্মবশে নয়। যাহা পূর্ণ, তাহা অব্যক্ত আর মায়াতে যাহা প্রতিবিম্বিত তাহা আংশিক; কিন্তু "অংশেন সম্ভূতঃ" ধরিলে অংশাবতার বুঝায় না। জীব, অবিদ্যাপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু কর্ম্মবান্ নিজের অংশে অর্থাৎ স্বকীয় তেজোবলে মূলপ্রকৃতি বৈষ্ণবী মায়াকে সঙ্কুচিত করিয়া অবিদ্যার অধীনতা স্বীকার না করিয়া মানবরূপে দেখা দেন। যাঁহারা

সাধনসিদ্ধ বা জন্মসিদ্ধ, তাঁহাদের জন্ম কর্ম্মাধীন। তাঁহারা অংশাবতার হইতে পারেন; কিন্তু "অংশেন সম্ভূতঃ" বা পূর্ণাবতার নহেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—ইন্দ্র, মায়া দ্বারা মানবরূপ ধারণ করেন। কিন্তু এই মায়িক লীলা কেবল কর্ম্মনিয়ন্ত্রিত ফলভোগ ও সাধন যোগের অবসর সৃষ্টি করে, যেখানে কর্ম্মের বন্ধন নাই, ফলভোগের অবকাশ নাই, সাধনের প্রয়োজন নাই। যেখানে অবিদ্যা প্রতিহত, যেখানে ঈশ্বর স্বীয় অংশে অর্থাৎ মায়ায় অধিষ্ঠিত, সেই খানে নারায়ণের অবতাররূপ দৃষ্ট হয়। এইরূপ অপ্রাকৃত অবতরণ বিনা দুঃসাধ্য ধর্ম্মস্থাপনব্যাপার সাধিত হইতে পারে না।

(৪) শ্রীকৃষ্ণ অবতার

অবতারলীলায় কি লক্ষণ, তাহা বুঝা গেল। এখন শ্রীকৃষ্ণে, ঐ লক্ষণসমূহ যে বহুল ও বিচিত্র ভাবে বিরাজমান, তাহা দেখাইতে হইবে।

প্রথমে কৈশোর। ঐ দেখ কালিন্দীশীকরসিক্ত-পবনসেবিত কুঞ্জকুসুম সুবাসিত তমালপিয়ালশ্যামায়িত কোকিল-কূজনমুখরিত বৃন্দাবনধামে রাজ কিশোর বিহার করিতেছেন! তিনি ক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া গোচারণ ব্রতে ব্রতী ছিলেন। তিনি সন্তাপিত প্রপীড়িত সাধুভক্তগণকে পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছেন, তিনি গোপালরূপে প্রথমে অভ্যুদিত হন। আত্মদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুতা। জননীসদৃশ ধীরগম্ভীর গাভীগণের ন্যায় আর কে আত্মদান করিতে পারে? তাহাদের পরিচর্য্যা তাঁহার ভক্তজনতারণ ভাবিলীলা সূচিত করিয়াছিল। গোপাল-কৃষ্ণের কি বিচিত্র খেলা! যিনি সমস্ত রাজন্যবর্গের পূজনীয়, তিনি আজ বনমালায় শোভিত হইয়া রাখালরাজ সাজিয়াছেন। শ্যামল ধবল ধেনুদল তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। আর গোপবালকেরা ব্যস্ত ভাবে তাঁহার সহিত ক্রীড়া-

কৌতুক করিতেছে। গাভীগণের যিনি পালক ও গোপবালকদিগের সখা. তিনি হিংস্রস্বভাব প্রাণীগণের দণ্ডদাতা। ব্রজে সর্পভয় ছিল ও অন্তঃপাতিবনসমূহে অশ্ব, বৃষভ ও গর্দ্দভজাতীয় শ্বাপদসকল বাস করিত। তিনি তাহাদিগকে নিজপরাক্রমে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। এই শ্বাপদশাসন তাঁহার দুষ্কৃতদমনের পরিচায়ক। সেবা, সখ্য ও শাসন—এই তিনটি ভাব, কৃষ্ণের চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই অপূর্ব্বরূপে মিলিত হইয়াছিল।

যিনি গোপাল—যিনি খলের কাল—তিনি আবার মাধুর্য্যরসাল।

চল—আজ রাসকেলি দর্শন করিয়া কামদোষ হইতে মুক্ত হই। আকাশে শরৎশশীর রসময়ী পূর্ণিমা পৃথিবীতে শ্যামশশীর নিবৃত্তিময়-নীলিমা। শশিকলা রূপলালসাকে জাগরিত করে। আর, কৃষ্ণকলা তাহাকে প্রশমিত করে। এই ভোগমধুর শারদীয় পূর্ণিমাতে শ্রীনিবাসের বেণুরব, বৃন্দাবনকে মাতাইয়া তুলিল। আত্মবিস্মৃত গোপীজন বংশীধ্বনির অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণসন্নিধানে সমুপস্থিত। রুক্মপুত্তলিকা আভীরবালিকাসকল আবা আবা আবা ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পরে করে করে মিলিত হইয়া মণ্ডলাকারে কলনর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ণচন্দ্রের করস্পর্শে সাগর যেরূপ তরঙ্গায়িত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকর-স্পর্শে গোপীহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আজি কৌমুদী মায়ামধুরা প্রকৃতি ও কৃষ্ণ-মাধুরীমুগ্ধা-প্রকৃতিরূপিণী গোপললনা পুরুষপ্রধানে মিলিত হইল—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমন্বয় হইল।

হে গোপাল! হে কালীয়দমন! তুমি মাধুর্য্যবিগ্রহ তুমি আপ্তকাম উদাসীন।

কৈশোরে কৃষ্ণচরিত্রে প্রবৃত্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল, এই বিকাশ সাম্প্রদায়িকেরা ইন্দ্রিয়ঘটিত মনে করেন। সুকুমার শৈশবে ইন্দ্রিয়ের পরিপক্কতা আরোপ, অবৈধ ও অসঙ্গত। তরুণ নটবর শ্যামসুন্দরের মাধুরীরসিকতা ইন্দ্রিয়াতীত।

মাধুর্য্যরসের অপূর্ব্বতা অনির্ব্বচনীয়। কবিগণ, উপমাচ্ছলে ইহার মিষ্টতা দেখাইতে কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রভাত-তপন-চুম্বিত কমলিনীর বিকাশ, কৌমুদীরঞ্জিতকুমুদিনীর হাস্য, এলালতালিঙ্গিত চন্দনতরুর সুরভি, মাধবীপরিণদ্ধতমালদ্রুমের শ্রী, প্রণয়িজনসঙ্গমমাধুরীকে প্রকাশ করিতে হার মানিয়া যায়। বিরহ-বিধুরহৃদয়যুগলের মিলনানন্দ, সুধাপানসুখকে তুচ্ছ করে। কিন্তু পৃথিবীতে এই মাধুর্য্যরস, কামগন্ধময় ও ভোগপঙ্কিল। আমরা ইন্দ্রিয়রতিবিরহিত মাধুর্য্যরসাবেশ দেখিতে পাই না, কেন না মানব-প্রকৃতি, অবিদ্যাপরবশ। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে এই মধুর রসের পূর্ণ আবির্ভাব হইয়াছিল! অথচ ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না! শ্রীকৃষ্ণ যে ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া রসোপভোগ করিতেন, তাহা নহে। সংযমচেষ্টা বলিলে কর্ম্মবন্ধন বুঝায়। তিনি কিশোর ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ হয় নাই। বিলাসভোগের সম্ভাবনা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন ছিল না—তথাপি মাধুরীবিলাসরসজ্ঞ। এরূপ চরিত্র কোথায় আছে? ইহা অপ্রাকৃত। কর্ম্মদোষ থাকিলে এরূপ বাসনাবিবর্জ্জিত মাধুর্য্যলীলা ঘটিতে পারে না। তিনি মানবপ্রকৃতি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কর্ম্মের অতীত। প্রবৃত্তির ইন্দ্রিয়রতিবিহীন পূর্ণবিকাশ মায়াধীশের অবতরণ বিনা অসম্ভব। মানব-প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্বের অধিষ্ঠান হইলে, প্রবৃত্তিসকল স্থূল ভোগকে অতিক্রম করিয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মিলনশ্রী কি অপূর্ব্ব! বিলাসলালসা নাই—কামরতি নাই—পুষ্পশরের অবসর নাই। তথাপি আদিরসের গূঢ় রসিকতাগুণে প্রবৃত্তিসকল সতেজাঃ ও সরস। হে গোপীজনবল্লভ! তুমি ব্রতধারী কঠোর যতি নও, তুমি সাধনসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় নও। তুমি ঈশ্বরের অবতার। তোমাতে অবিদ্যা ও বিদ্যার সমন্বয় হইয়াছে। সগুণ ও নির্গুণের মিলন প্রকটিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত তোমার মধুরচ্ছবি, হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। তোমার কৈশোর লীলা ভাবিলে মন উদাস

হয়। প্রবৃত্তির পূর্ণ খেলা, অথচ কামচেষ্টা নাই, তোমার চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে যেন নিষ্কাম হই। রাসমঞ্চে গোপললনাবল্লরী আশ্রয় করিয়া যে কৃষ্ণকুসুম ফুটিয়াছিল, তাহার আমোদে কামগন্ধ তিরোহিত হয়। যাঁহাদের প্রতিটি লতিকা নিবৃত্তিকুসুমে শোভিত হইয়াছে, তাঁহারাই পুণ্যময় রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে পারেন। হায় প্রবৃত্তিপন্থী সাম্প্রদায়িকেরা এই হরিচন্দনবিনিন্দিত কৃষ্ণকমলের কি কুৎসিত ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। নির্ব্বাণের ভূমানন্দকে মদনোৎসবে পরিণত করিয়াছে। সাবধান, নিবৃত্তি কুসুম বিনা কৃষ্ণ পূজা হয় না।

যেখানে কোমল মাধুরী, সেখানে রুদ্রভাব থাকতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে এই দুই পরস্পরবিরোধীগুণ পূর্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। ঐ যুগপরিবর্ত্তনকালে দুর্দ্দান্ত ভূপতিগণের অত্যাচার হইতে ভারতভূমিকে রক্ষা করে। ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণের সহায়তাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের শরণ না লইয়া, যুধিষ্ঠির, রাজসূয়যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। কংস, জরাসন্ধ, কালযবন, শিশুপাল ও অন্যান্য ধর্ম্মবিরোধিনৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভারতকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-রক্ষিত অজেয় কৌরবদিগকে কে বিনাশ করিতে পারিত? পার্থসারথি কৃষ্ণ নিজের সারথ্য-প্রভাবে অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত দুষ্কৃতদমনব্যাপার ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্চ্চিত হন। তিনি মুনি বা ঋষি নহেন—ব্রাহ্মণ বা রাজা নহেন—তথাপি নারদ-ব্যাস-ভীষ্ম প্রভৃতি মহাজনদিগকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়াছিল। লিখিত আছে—"নারদোঽপি পরং মেনে"। এই রাজসূয়যজ্ঞের শ্রীকৃষ্ণের সেবা, সখ্য ও শাসনের ভাব বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যে পাণ্ডবসখা, পাণ্ডবগতপ্রাণ—তাহা দেখাইয়াছিলেন ও দুষ্ট শিশুপালকে যজ্ঞসভায় বিনাশ করিয়া-

ছিলেন। আবার এদিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইয়াও, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্ভুত রহস্য!

আর কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের কথা কি বলিব? যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সামঞ্জস্য, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়—সেই ক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ভারতকে জয় করিয়াছে ও কালে পৃথিবীকে জয় করিবে। ঐ জ্ঞানরহস্য, শয়নে বা যোগবলে জানা যায় না। ইহা ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের সম্মিলনসূত্রে পরমধাম হইতে অবতরণ করে। "ফলেন পরিচীয়তে"। ইহা ভগবান্ ব্যাসকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল—শ্রুতির গুহ্যতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছিল—শরশয্যায় ভীষ্মকে দিব্যজ্ঞান দিয়াছিল। ইহার প্রভাবে বেদ ও ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও পুরাণ নূতন ভাব ধারণ করিয়াছিল, জ্ঞানসমুদ্র মহাভারত প্রসূত হইয়াছিল, আশ্রমধর্ম্ম নবীন জীবন পাইয়াছিল, সমাজের প্রত্যেক বিভাগ পরমার্থভিত্তিতে গঠিত হইয়া লোকসমূহকে নিঃশ্রেয়সসাধনপথে লইয়া গিয়াছিল। কলিকালে জীবকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া অনুকম্পাবশতঃ ঈশ্বর এই বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। এরূপ সুবৃহৎ সুদূরগামী যুগপ্রলয়ব্যাপারসাধন, অবতারই করিতে পারেন, সাধনসিদ্ধির বলে ঘটিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরমাধুরী দিগন্তবিজয়ীপ্রচণ্ডতা ও অবিদ্যাভেদীজ্ঞানদৃষ্টি একাধারে ভাবিলে 'ঈশ্বরের অবতরণ' স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। তাঁহার মহিমা কি অপার! তাঁহারই প্রসাদে আজও ভারত—ধর্ম্মপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণপ্রধান তীর্থস্থানরূপে পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। বিংশতিকোটি মানবসন্তান, তাঁহারই গুণগানে তাঁহারই পদানুসরণে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। হিন্দুজাতি তাঁহারই প্রভাবে অদূরভবিষ্যতে সমগ্র মানবকুলের গুরুপদে অভিষিক্ত হইবে। "কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে"।

ফিরিঙ্গি শব্দের ব্যুৎপত্তি

এম্পায়ার—বলিয়া একখানি নূতন ইংরেজি দৈনিক কাগজ বাহির হইয়াছে। ঐ কাগজে লেখা হইয়াছে যে সন্ধ্যা পত্রিকাতে ইংরেজকে অবজ্ঞা করিয়া ফিরিঙ্গি বলা হয়। তাই আজ আমরা ফিরিঙ্গি-শব্দ-তত্ত্বের কথা কিছু বলিব।

আমাদের এক হিন্দুস্থানী বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে যে কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইত—তিনি সেই কথারই অক্ষর ধরিয়া একটি না একটি চমৎকার অর্থ করিয়া দিতেন। সেই জন্য তাঁহাকে সকলে—ডিক্‌শনারী অর্থাৎ অভিধান—বলিয়া ডাকিত। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—হিন্দু শব্দের অর্থ কি ? তিনি অমনি বলিলেন—হি হীন—দু দুর্ভাগ্য—যাহারা হীন ও দুর্ভাগ্য তাহারাই হিন্দু। এই অর্থ তিনি নিন্দাচ্ছলে বলেন নাই—মনের দুঃখে বলিয়াছেন।

এখন ফিরিঙ্গি শব্দের অর্থ কি। প্রথমেই ফি।—যাহারা সব কথায় ফি (টাকা) চায়—তাহারাই ফিরিঙ্গি। ওরা বাপকে খাওয়াইয়া বিল করে—ফি চায়—ওদের স্ত্রীকে যদি কেহ ভ্রষ্টা করে ত তাঁহার নিকট ফি লইয়া ছাড়পত্র লিখিয়া দেয়। তাই গোড়াতেই ওদের নামে ফি শব্দ আছে। এখন ফি ছেড়ে ধর—ফিরি। এমন ফিরিওয়ালার জাত আর নাই। শুধু যে উহারা সওদা ফিরি করিয়া বেড়ায়—তাহা নহে। তোমার কাছে ফি লইবে আবার ফিরি করিবে। আর যদি ফি দাও—আর যদি সওদা না লও—ত তোমাকে যমের উত্তর দক্ষিণ দ্বারে ফেরাফিরি করাইবে। তারপর ধর—ফিঙ্গি। এমন ফিঙ্গি বা ফিঙে দুনিয়ায় নাই—ওরা সকলের পিছনে লাগে।—কথায় কথায় ফি আদায় করে—তোমার ঘরের ভিতরে গিয়া জোর করিয়া ফিরি করিয়া আসে—তারপর ফিঙ্গি-ফিঙে হইয়া ঝিঙির মত তোমার পিছনে লাগিবে ও তোমাকে উত্তমকুস্তম করিয়া

তুলিবে। তুমি যেমন পক্ষী হও না কেন—ফিরিঙ্গি ফিঙে তোমায় যদি তাড়া করে ত তোমার দম বাহির করিয়া ছাড়িবে।

আসল কথাটা হিন্দুস্থানীতে—কিরিঙ্গি। ফি গেল—ফিরি গেল—ফিঙ্গি গেল—এখন আছে বাকি—রঙ্গী।

প্রথমেই রঙটা ত ফ্যাক-ফেকে শাদা—রঙ নাই বলিলেই হয়—যেন টব-চাপা ঘাস। তবে রঙ্গী কি করিয়া হইল। বিচি-ভরা বেদানাকে লোকে কেন বে-দানা অর্থাৎ দানাহীন বলে। সেই রকম রঙ নাই বলিয়াই ওদের রঙ্গী বলে। আর একটা ওদের রঙ্গ আছে। লোককে মেরে ধোঁয়ে উড়াইয়া দেয়—আর বলে—আলোক বিস্তার করিতেছি। মার্কিণের ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীরা ওদের আলো-ছড়ানো রঙের চোটে অনন্ত জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছে। এমনি ওদের রঙ্গ।

আবার স্ত্রীলোক নিয়ে ওরা বড়ই রঙ্গ করে—তাই ওরা ফিরিঙ্গি। ভয়ানক শীতেও ওদের স্ত্রীলোকের গলা বুক ও হাত আদুড় করিয়া সভায় যায় ও মেয়ে-পুরুষে গল্প-গাছা গাওনা বাজনা করে। সে রঙ্গ যে দেখেছে তার আক্কেল হয়েছে। ওরাই রঙ্গী বটে। ওরা নিজের স্ত্রীর ও পরের মেয়ের ও স্ত্রীর পা ধরিয়া গাড়ী থেকে নামায়—কিন্তু পিসী মাসী ভাজ বোনকে খেতে দেয় না। এমন রঙ্গ কি কেহ কখনও দেখেছ।

ওদের শেষ রঙ্গ দেখে কিন্তু হাসি চাপিয়া রাখা যায় না। ওদের বিদ্যা ঐ ধুমো ধুমো কলকজা পর্য্যন্ত—কিন্তু ওরা সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যজাতির গুরু সাজিয়া বসিয়াছে। এমন উল্টা রঙ্গ আর কখনও হয় নাই। ফিরিঙ্গির ভিতরে কি আছে—ফিরি আছে—ফিঙ্গি-ফিঙে আছে—আর শেষে রঙ্গ আছে। ওরে ফিরিঙ্গি—তোর বালাই নিয়ে মরি।

(সন্ধ্যা, ২৩শে নবেম্বর ১৯০৬)

বয়কটের মর্ম্ম

বারে বারে বলিয়াছি যে শুধু নুন-চিনি-কাপড়ের স্বদেশী হইলে চলিবে না। বিলাতী-বর্জ্জনের অর্থ—কেবল ফিরিঙ্গির মালপত্র বয়কট করা নহে—কিন্তু খাস ফিরিঙ্গিকে বয়কট করা চাই। সে কি রকম।—ফিরিঙ্গি আমাদের শাসন করে। ঐ শাসনকার্য্যে আমরা বাচিয়া সহায়তা করিব না। যেখানে পেটের দায় বা ইজ্জতের দায় সেখানে করিতেই হইবে। দায়ে পড়িয়া যখন ফিরিঙ্গির সহায়তা করিতে হইবে—তখন যেন এই ভাবটি মনে থাকে—পড়েছি মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে। কিন্তু কোন রকমেই সখ করিয়া গিয়া ফিরিঙ্গির শাসনচক্রে তৈল ঢালিব না। লাটমজলিশে সখের নকিবি করিতে যাইব না—অনাহারী কাজীগিরি করিব না—ফিরিঙ্গি আমাকে ঠেঙ্গাইল—আর আমি ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা বন্ধ করিয়া ফিরিঙ্গির আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ আঁটিব না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি ফিরিঙ্গিকেই বয়কট করিতে হয় ত ফিরিঙ্গির আইন পর্য্যন্ত মানা উচিত নয়। একজন আমার নামে মিথ্যা মিথ্যা নালিশ করিয়াছে ও ফিরিঙ্গি আদালত হইতে শমন বাহির হইয়াছে। আমি নির্দ্দোষী—তার উপরে আবার বয়কট-কারী। আমার ঐ ফিরিঙ্গি আদালতের শমন অগ্রাহ্য করা উচিত।

একটু স্থির হইয়া ভাবিলে—মনকে চোখ না ঠারিয়া সোজাসুজি দেখিলে বুঝা যায়—যে বয়কট অর্থে আইন-ভঙ্গ নহে। আমি নির্দ্দোষী বা দোষী—তাহাতে কি আসে যায়। যে নালিশ করিয়াছে—সেও ভাবিতে পারে যে সে নির্দ্দোষী। আইনের সাহায্যে বিচার করিয়া ওই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে—দোষীকে দণ্ড দিতে হইবে। যদি আমাদের রাজা দেশী হইতেন—তবুও আমাকে ওই আদালতের আইন মানিয়া লইতে হইত। আইন বস্তুটিকে মানিতেই হইবে।

যাহা সাধারণ—সর্ব্বজনসম্মত বিধিব্যবস্থা—ব্যবস্থাপক দেশীই হউন বা বিদেশীই হউন—তাহা মানা চাই। হইতে প্যারে যে কোন দোষের জন্য বিদেশী আইনে কম বা বেশী দণ্ড হয়—আর স্বদেশী আইনে সেই দোষেই বেশী বা কম হয়—কিন্তু আইনের বশ্যতা তোমাকে সকল দেশে সব কালে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যদি সিপাহীরা শমন ধরাইতে আমার মাথা কাটাইবার বন্দোবস্ত করে—বা আমি চলিয়া যাইতেছি আর আমার উপরে গুণ্ডামি করিয়া লাঠি চালায়—তাহা হইলে আমার লাঠির বদলে লাঠি ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া অধিকার। যদি দেশীয় রাজার অধীনে এইরূপ অত্যাচার হয়—তাহা হইলেও আমার ঐরূপ প্রতীকার করিবার অধিকার আছে—ফিরিঙ্গি-রাজার অধীনে—কা কথা।

তাই যখন লাঠির বদলে লাঠি বলা যায়—তখন ইহা বলা হয় না যে সব আইন ভাঙ্গিয়া ফেল। ইহাই বলা হয় যে যদি কেহ তোমাকে ঠেঙ্গাইতে আসে কিংবা তোমায় বে-ইজ্জত করিতে আসে—তা সে ফিরিঙ্গিই হউক বা তাহার চৌদ্দপুরুষ হউক তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়মের চেয়ে বড়।

অবশ্য—ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। ফিরিঙ্গি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কর্ত্তামি জুড়িয়া দিয়াছে—তোমার প্রাণের দায় মানের দায় অর্থের দায় শিক্ষাদীক্ষার দায় সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছে—আর তুমি তার মুখের পানে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া বসিয়া আছ। তাহার ঐ কর্ত্তামি ঘুচাইতে হইবে। তাহাকে অতিথি-অভ্যাগতরূপে বাড়ীর বাহিরে স্থান দিতে হইবে। এই পরকে ঘর হইতে বাহির করাকেই বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও। আইন-ভাঙ্গাকে বয়কট বলে না। যাহাতে সেই সনাতন-তন্ত্রের অধীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি—এস—তাহারই সাধনা করি—ফিরিঙ্গিকে বয়কট করি।—সন্ধ্যা, ২৩শে নবেম্বর, ১৯০৬।

দে কালীবাড়ী একশ পাঁঠা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আর কি কারো ভয় রেখেছি ?

আমরা যে সেই ভগবানের অভয় পদে প্রাণ স'পেছি—তিনি কি আমাদিগের মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারেন। আমরা যে স্বাবলম্বনের পথ ধরিয়াছি—তিনি কি আমাদিগের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারেন ? আজ বাঙ্গালীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার সিংহাসন টলিয়াছে—তিনি তাই তাঁহার বিচিত্র উপায়ে আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যে ডাল ধরিতেছি সেই ডালই তিনি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, আর পরোক্ষভাবে এই উপদেশ করিতেছেন যে পর প্রত্যাশাদিগকে আমি এইরূপ কশাঘাত দ্বারাই সৎপথে আনিয়া থাকি। "অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" বাঙ্গালী তুমি যত দিন অভাগা থাকিবে, ততদিন মর্লী এলিস ত দূরের কথা—সেই দীনবন্ধু ভগবান পর্য্যন্ত তোমার প্রতি বিমুখ থাকিবেন। যাহার আত্মপ্রত্যয় নাই অপনার শক্তিতে যে বিশ্বাস করে না, কেবল পরের অনুগ্রহ পরের সহানুভবতা যাহার সম্বল কেহই তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিলে দাঁড়াইয়া হটিয়া আসিলাম, আজ সেই উদারতার অনন্ত প্রস্রবণ মূর্ত্তিমান্ সাম্যমৈত্রী মর্লী আমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন, ইহাতে যে আমরা কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে কি বঙ্গভঙ্গে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে নাই ? তবে কি বানরিপাড়ার* পিটুনী পুলিসের অত্যাচারে—তবে কি সেখানকার পুরনারীর আর্ত্তনাদে আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় নাই ? তবে কি বরিশালে গুর্খার গুঁতায়

* বানরিপাড়া বরিশাল শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরের একটি গ্রাম, ১৯০৫ সনে নবেম্বরের মাঝামাঝি গুর্খা পুলিস দ্বারা গ্রামবাসীর উপর নির্ম্মম অত্যাচার সাধিত হয়।

আমরা সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জ্জন করি নাই? তা নয় আমরা এত দিনে ফিরিঙ্গির স্বরূপ চিনিব।

এত দিন ভগবান স্বহস্তে আমাদিগের চোখের ঠুলি খুলিয়া দিলেন। এত দিনে আমরা ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া দিবার প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিব এই ভাবিয়া ত আমাদের আর আনন্দ ধরিতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গ! কে বলে তুমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ? আমরা ত তোমাকে আরও বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। বরিশালের বানরীপাড়ার সংবাদ কে রাখিত। আর আজ কলিকাতার আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে সেই বানরীপাড়ার কথা। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণ উৎসবে ঐ বানরীপাড়ার নিগৃহীত লোকদিগের জন্য টাকা উঠিতেছে। আজ বরিশালের অশ্বিনীকে, মাদারীপুরের কালীপ্রসন্নকে, বল্লার স্বদেশী বীরদিগকে, জলপাইগুড়ির আদ্যনাথকে, ভবানীপুরের সুরথকুমারকে সমস্ত বঙ্গদেশ সম্মান করিতেছে। ভাঙ্গা বাংলা আর কেমন করিয়া জোড়া লাগাইতে হয়। যাহাদিগের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না, তাহাদিগকে আমরা প্রাণের বন্ধু হৃদয়ের দেবতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহাদিগের বেদনায় দুঃখ জানাইতেছি—যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতেছি। এরূপ সৌহার্দ্য কি আর কোন উপায়ে সম্ভব হইতে পারিত। ফুলার যতই ঘা মারিবেন, ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। মিন্টো মর্লী যতই পায়ে ঠেলিবেন ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। ফিরিঙ্গি যতই নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন—ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। ছাত্রদিগের প্রতি যতই নির্য্যাতন হইবে—ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। মৃত্যুতে জীবন! আমাদের এই মিথ্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের, এই অস্বাভাবিক ফিরিঙ্গি প্রীতির, এই ঘৃণাকর পরমুখাপেক্ষিতার এই বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কারের মৃত্যু না হইলে, আমরা জীবন লাভ করিতে পারিব না। আমাদিগের দৃষ্টি,

আমাদিগের কাজ কর্ম্ম সব বহির্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। আমরা আপনাতে আপনি নাই। সাধক বলিয়াছেন,—

আপনাতে আপনি থাকো
যেও না মন কোনখানে
যা চাবে তাই খুঁজে পাবে,
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

বাহিরের মায়া একেবারে না কাটিলে আমরা অন্তর্মুখীন হইতে পারিব না। বাহ্য বস্তুতে আসক্তির—সামান্য মাত্র কারণ থাকিলে আমাদের আত্মদৃষ্টির উন্মেষ হইবে না। তাই নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামকৃষ্ণ যেই শুনিতেন যে তাঁহার জমিদারী এক এক করিয়া লাটে উঠিতেছে অমনি ৺জয়কালীর বাড়ী একশ করিয়া বলি দিতেন। আমরাও সেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলি—আজ আমাদের ভুয়া রাজনৈতিক আন্দোলন লাটে উঠিয়াছে, আজ আমাদের মরলী-প্রীতি ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ বাহিরে আমরা সব শূন্য দেখিতেছি, আজ ইংলণ্ডের কুয়াশাবৃত-অম্বরে ভারতবাসীর আশাসূর্য্য একেবারে ডুবিয়া গেল, আজ ইংলণ্ডের মহাসভার উদারনীতিক মন্ত্রী সমাজের উদারতম সদস্য মরলী আমাদিগের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন—তাই আজ যদি আমাদের চৈতন্য হয় আজ যদি আমরা স্বাবলম্বনের মহিমা বুঝিতে পারি, আজ যদি আমরা আমাদের সামাজিক শক্তি চিনিতে পারি, আজ যদি আমরা মানুষ হইবার পথ খুঁজি, তাই বলি দে জয়-কালীর বাড়ী একশ পাঁঠা।

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)

কোন কালে নাই মনসাপূজা, একেবারে দশভুজা।

এখন ছেলে বুড়ো সকলেরই বিশ্বাস যে, সেকেলে ব্রামুণদের মতন ঘটত্ব পটত্বের কচ্‌কচি নিয়ে থাকিলে আর চলিবে না। কালাপানি পার হয়ে ঘট ও পট তৈয়ারি শিখে না এলে আর রক্ষা নাই। ভাল ভাল ছেলে বাছাই করে বিলাত কি জাপান পাঠাইয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মা করে না আনিতে পারিলে ঐ সেকেলে নরুণের ঠুকুর ঠুকুরে আর কারিকুরিতে বড় হওয়া যাইবে না। কারিকুরি বিদ্যাটা বিলাতেরই একচেটে। ঐ তমসা নদীর তীরেই বিজ্ঞানলক্ষ্মী তাঁর মনের মতন পেঁচা পাইয়াছেন। ঐ সেইখানে গিয়া তাঁর কাছে ধন্না দিতে না পারিলে পৃথিবীতে আর কোন দেশে কারুর মাথায় বিজ্ঞানিবুদ্ধি গজাইবে না। এ একটা বেহদ্দ গোলামের কথা। বলি, জেমস্ ওয়াট্ কার ঘরের কেটলীর ধোঁয়া দেখে এন্‌জিন গড়ার বুদ্ধি মাথায় আনিয়াছিল? গরুর রাখালই বা কোন দেশ থেকে বিদ্যা বুদ্ধি ধার করে এনে সেই ইঞ্জিনের উন্নতি করেছিল? যদি একটা কোন কাজের উপর ঝোঁক থাকে, আর সেই কাজের মধ্যে পড়া যায়, তবে সেটা কি করিয়া ভাল করে করা যায়, তার সব সুলুক সন্ধান আপনা থেকেই এসে যোগায়। আদত কথা আমাদের শিল্পের উন্নতি করিব এই বলে আগে কাজে লেগে যেতে হয়। যে কাজ যে ভাবে চলিতেছে, তারই একটা হদ্দ মুদ্দা দেখিতে হয়, তারপর ঐ কাজ করিতে করিতে নূতন রকমের কলকব্জা করিবার বুদ্ধি আপনা থেকেই এসে যোগায়। আমাদের এই ছাপাখানার জমাদার প্রেসম্যানদের মধ্যে দুই একজন এমন কলকব্জা বোঝে যে, দুপুর রাত্রিতে কল বিগড়ে গেলে তারা আপনা থেকেই একটা বুদ্ধি বার করে সব ঠিক করে নিতে পারে। যে সকল ছেলেপিলের কারিকরিতে মাথা আছে, তাহাদিগকে হয় তাঁত বুনিতে, না হয় চরকা কাটিতে, না হয় কোন ঢালাইয়ের কারখানায়, না হয় ঐ রকম অন্য কোন একটা কাজে জুড়িয়া দিতে হয়। তারপর কাজ করিতে করিতে তাদের আপনা থেকেই বুদ্ধি

খুলে যায়। তখনই নূতন কি রকম কি করিলে কাজটা শীঘ্র বা সহজে হইতে পারিবে, সে সকল ফন্দী বাহির করিবার চেষ্টা হইবে। তখন বরং তাহারা বিদেশে গিয়ে কোন শিল্প রীতিমত শিখে আসিতে পারিবে। নইলে কোথায়ও কিছু নাই, দুদশজন পুঁথি মুখস্থ করা ছেলেকে বিদেশে শিল্প শিখিতে পাঠিয়ে যে বিশেষ কি লাভ হইবে, তা ত বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি আর উল্টাপাল্টা কাজ। আগের কাজ আগে না করে, আগের কাজ পাছে, আর পাছের কাজ আগে। কোন দিন মনসা পূজা করিলাম না, কিন্তু খেয়াল চাপিল ত একেবারে দুর্গাঠাকুর ঘরে নিয়ে আসিলাম। আর দেশে আগে ছোট ছোট কাজ আরম্ভ কর, দেশী কারিকর দিয়ে সেইগুলি যতদূর চলে চালাও, তারপর আপনাদের ছেলেপিলেকে সেইগুলির ভার দিয়া, তাহাদিগকে সে বিষয়ে এলেম জন্মাইতে দাও। তখন ইংলণ্ড জর্ম্মণী জাপান যাওয়ার কথা উঠিলে তবে বুঝতে পারি যে যাদের ওদিকে মতিগতি এবং শক্তি আছে, তারা বিদেশ থেকে নূতন হদিস্ পেয়ে এসে আপনাদের কাজ কারবারের একটা উন্নতি করিতে পারিবে। এদেশে যারা বি, এ পরীক্ষা বা এম, এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় বিজ্ঞান পড়ে, তাদের হাতে হাত্‌ড়ে কাজ করিবার কোন ক্ষমতাই জন্মে না। কেজো রকম বিজ্ঞানের চাষ এদেশের ফিরিঙ্গি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই—এ কথা অধ্যাপক র‍্যামসে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তবে ওরই মধ্যেই যাঁদের আদত শিখিবার বা কিছু করিবার মতলব আছে, তারা কাজ গুছাইয়া লইতে পারেন। কলিকাতায় "বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে"র কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই কারখানায় বিলাতী ঔষধ বৈজ্ঞানিক রকমে তৈয়ারী হয়। সম্প্রতি মাণিকতলায় এই ঔষধ তৈয়ারীর যে নূতন কারখানা হইয়াছে, তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, বিদেশ যাইয়া একটা কেষ্টো বেষ্টো হওয়ার আগেও এখান থেকে কল-কারখানায় কিছু না কিছু কাজ করা যায়। এই কারখানায় সম্প্রতি

ঔষধ তৈয়ারীর আরও কলোয়া রকম ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও কিছু কিছু তৈয়ারী হইতেছে। সালফিউরিক এসিড তৈয়ারীর নূতন কারখানা হইতেছে। এলো মেলো কাণ্ড কিছু নাই, আস্তে আস্তে পা বাড়ান হইতেছে। আজ এটা কাল সেটা করিয়া সমস্ত আবশ্যক ঔষধ এবং যন্ত্রাদি তৈয়ারীর উপায় হইতেছে। এদিকে অপব্যয় কিছু নাই, পাকা ব্যবসাদারের মত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হইতেছে। অথচ সেখানে রাঙ্গামুখও নাই, বিলাতফেরত আস্তিনকাচা দেশী কিরিঙ্গিও কাহাকে ড্যাম শুয়ার বলে না, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধির অভাবে সেখানে কোন কাজ আটকায় নাই। সেখানে যা কিছু কাজ আটকাইতেছে—টাকার জন্য আর দেশের লোকের দেশের উপর মন না থাকার জন্য। প্রথম এখানকার টাকাকড়িওয়ালা লোক কাজ কারবারে টাকা খাটাইতে বড় নারাজ। তাই ঐ কারখানার সেয়ার বেচিতে উদ্যোগীদিগের একেবারে হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের সূতা ছিঁড়িয়া যায়। কেউ বলেন, কোম্পানীর কাগজের দরটা একটু চড়ুক এখন কাগজ বেচিলে অনেক লোকসান খাইতে হইবে। কেউ বলেন, বাড়ীর মেয়েদের ও বিষয়ে একেবারেই মত নাই। তাঁরা বলেন, গহনা বা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিলে হু হু করিয়া টাকা বাড়িয়া যাইবে, অথচ কোন লোকসানের ভয় থাকিবে না। আবার যারা বিলাতী ওষুধপত্র হামেসা ব্যবহার করে, তাদের আবার এমনই বিদ্বে যে বিলাতি পুরাণা পচাধসা ওষুধ ব্যবহার করিবে, তবুও দেশী কারখানার টাটকা ওষুধ লইবে না। ওষুধবিক্রেতারাও দেশী কারখানার ওষুধ গুদামের এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়া দেয়। আমাদের জন্য বিলাত থেকে যে সকল ওষুধ আসে, তাহার অনেকগুলি ব্যবহারেই কোন উপকার হয় না। সেগুলি জিনিষ ভাল নয়, তারতের জন্যই সেগুলি তৈয়ারি, একথা বিলাতের ঔষধওয়ালারা স্পষ্ট করিয়া কাগজে ছাপিয়া দেয়, তবুও এদেশের লোকে ঘরের কড়ি খরচ করে ডুবে মরে।

তাই বলি, আপাততঃ বিদেশে পাঠাইয়া বিশ্বকর্ম্মা তৈয়ারীর মতলব চপিয়া রাখিয়া এই সকল কারখানা দেশী লোকের সাহায্যে যত দূর চলে সেটা একবার চেয়ে চেয়ে দেখিলে ভাল হয় না? বিদেশে লোক পাঠাইলেই তার ১০টা হাত আর দশটা পা বেরোয়, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। জগদীশচন্দ্রকে অনেক দিন প্রেসিডেন্সী কালেজের লেবরেটরী ঘেঁটে ঘেঁটে তবে একটা কিছু হইতে হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, বেঙ্গল কেমিকেলের চন্দ্রবাবু* বা রাজশেখরবাবু ** এখান থেকে যা করিবেন, কোন লোক বিলাত, জার্ম্মাণী বা জাপান থেকে কারীকুরির বস্তা বস্তা সার্টিফিকেট বেঁধে নিয়ে এসেও, তার সিকির সিকি করিতে পারিবে না। বরং অন্য দেশ থেকে কারিকর এনে নূতন বিদ্যা শেখা ভাল, তবুও যার গোঁফের রেখা দেয় নাই, বা যে কখনও কল কারখানা দেখে নাই, তাহাকে বিদেশে পাঠান কিছু নয়।

বিলাতে যখন প্রথম লোহা চালাই করিয়া নানা রকম জিনিষপত্র তৈয়ারী হইতে থাকে তখন ফ্রান্স সুইজরলণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এত কারিকর আসিয়াছিল যে, তখনকার পাড়া পাড়ায় রেজিষ্টারী বহিতে ঐ সকল দেশের অনেক লোকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইত। তাই বলি, আগে দেশে যে সকল কাজকর্ম চলিতেছে, সকলে মিলিয়া সেইগুলি ভাল করিয়া চালাইবার চেষ্টা করা উচিত। কেবল হুজুগে পড়িয়া যার প্রাণে যা চায়, তাই করিলে চলিবে কেন? বেঙ্গল কেমিক্যালটার এখন যেমন অবস্থা, তাহাতে প্রাণে বেশ আশা হয়—আনন্দ হয়। যদি সঙ্গতিপন্ন লোক মাত্রেই এই কারখানার শেয়ার কেনেন, তাহা হইলে এই দেশী লোকের দ্বারাই কতদূর কাজ হয়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া যায়।

—১৩ই মার্চ, ১৯০৬

* চন্দ্রভূষণ ভাদড়ী

** রাজশেখর বসু।

কবে আঁখি ফুটিবে ?

হিউম বল, কটন বল, ওয়েডারবরণ বল, এঁরা সবাই লোক ভাল, শতবার একথা স্বীকার করি ; কিন্তু এঁদের সঙ্গেই কি সত্যি সত্যি আমাদের মিল আছে ? না—মিল হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা যে বস্তুর জন্য লালায়িত, ইঁহারা কি তার আদর করেন, না ইচ্ছা করেন আমরা তাহা লাভ করি। সত্য সত্য আন্তরিকভাবে ইঁহারা কি কখনো চান আজ পর্য্যন্ত আমাদের রাজনীতিক নেতৃবর্গ এ কথাটা কখনো তলাইয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কথাটা অতি সামান্য, কিন্তু এর নিগূঢ় মর্ম্ম অতি সাংঘাতিক। সে কথাটা এই যে হিউম, কটন, ওয়েডারবরণ্ প্রভৃতি ভারত-বন্ধুগণ কখনো ভারত-শাসনকে—"আমাদের শাসন"—"Our rule" ভিন্ন অন্য কোন বিশেষণে নির্দ্দিষ্ট করেন না। এখন ভারতশাসন সম্পূর্ণ-রূপেই ইংরেজের ইহা কে না জানে ? আমরা সর্ব্বতোভাবেই—

'নিজবাসভূমে পরবাসী'

হইয়া রহিয়াছি কিন্তু কথাটা সত্য বলিয়াই যে প্রিয় হইবে তা ত নয়। আর এ সত্যও যে একটা বিরাট অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও তো অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজ আমাদের যতই উপকার করুক না কেন, এ তো গরু মেরে জুতা দানের চাইতে কখনো বেশী হতে পারে না। কিন্তু কোন ইংরেজই এই গোড়ার অন্যায়টা মানিয়া চলিতে রাজী নন। ঐ গোড়ার অন্যায়ের জ্ঞান যদি থাকিত তবে কথায় কথায় এমন উদারমতি ভারতবন্ধুগণও আমাদের মাথায় বারম্বার—এই Our rule প্রক্ষেপ করিতেন না।

এদেশে কথায় কথায় গৃহস্বামী সম্মানিত অভ্যাগতকে "এ আপনারই বাড়ী"—"এ আপনারই সকল"—এরূপ অভ্যর্থনায় পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াস পান। ইহাতে গৃহস্বামীর স্বামিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কেবল অসাধারণ সৌজন্যই প্রকাশ পায়। আমাদের উদারমতি ভারত-

বন্ধুদের এ সৌজন্যটুকুও আজি পর্য্যন্ত শিক্ষা করা হয় নাই।—অন্যে পরে কা কথা ?

মোট কথাটা এই—যে বিরাট অন্যায়ের বলে জগতের সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলতর জাতির উপরে প্রবলতর জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, কোনো ইংরেজই ভারত-শাসনে সেই গোড়ার অন্যায়টা আর মানিতে চান না। যাঁরা নিতান্ত উদার ভাবাপন্ন তাঁরাও তামাদির অজুহাতটা অস্বীকার করিতে রাজি নন। এই জন্য কোনো ইংরেজই ভারতশাসনকে এমন ভাবে পুনর্গঠন করিতে চান না, যাহাতে আর তাঁহাদের পক্ষ ইহাকে—"আমাদের শাসন"—Our rule—বলা সম্ভব হইবে না।

হিউম বল, কটন বল, ওয়েডারবরণ বল, ইঁহারা সকলেই এই "আমাদের শাসন"—Our Ruleটাকে এদেশে বদ্ধমূল করিবার জন্য ব্যস্ত। হিউম-কটন-ওয়েডারবরণ নীতির উদ্দেশ্য ইহাই। ইহাদের সর্ব্ববিধ সদাশয়তার লক্ষ্য ঐ এক দিকে।

ইঁহারা ইংরেজশাসনকে মোলায়েম করিতে চান। ইঁহারা লোকের দুঃখ কষ্টের লাঘব করিয়া ইংরেজ রাজত্বকে জনগণের প্রিয় করিতে চাহেন। এঁরা ব্রিটিশ ভারতে অত্যাচার বন্ধ করিতে চাহেন—ধর্ম্মের খাতিরে ও রাজ্যরক্ষার উদ্দেশে। অপর ইংরেজের সঙ্গে এঁদের প্রভেদ এই যে, তারা নির্ব্বোধ, ইঁহারা বুদ্ধিমান; তারা অপরিণামদর্শী, ইঁহারা পরিণামদর্শী; তারা বর্ত্তমানের আশুসুখ-সম্মান-সুবিধার জন্য ব্যস্ত, ইঁহারা সুদূর ভবিষ্যতের শান্তি ও স্থায়িত্বের জন্য লালায়িত। কিন্তু মূলে কাহারও ভুল নাই। সকল ইংরেজেরই প্রাণগত বাসনা যে চিরদিন ভারত ব্রিটিশ পদানত থাকে।

সে বহু দিনের কথা—একবার কংগ্রেসে অস্ত্র আইন সম্বন্ধে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়। অস্ত্র আইন রহিত করিবার জন্য কংগ্রেসে এক মন্তব্য উপস্থিত করা হয়। সেখানে মাদ্রাজে প্রথম কংগ্রেস

বসিয়াছিল। হিউম এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। পর বৎসরের কংগ্রেসে প্রয়াগে আবার ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, সেবারেও হিউম উহার অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদের হেতু কি, তিনি নিজমুখে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, একজন কংগ্রেসীকে বলিয়াছিলেন,—কৌন্সলী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী একথা হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে হিউম বলেন—'১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে যাহারা ভারতের সেই ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব স্বচক্ষে দেখিয়াছে—তাহারা কখনও অস্ত্র আইন রদ হউক, আর এদেশের লোকে যথেচ্ছভাবে অস্ত্র রাখিবার অধিকারপ্রাপ্ত হউক, এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারে না।'

পাঠক, কথাটার দৌড় কত একবার তলাইয়া দেখ। যাঁদের মনোভাব এইরূপ,, তাঁরা লোক মন্দ, একথা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু আমরা যে বস্তু চাই, তাঁরাও যে ঠিক সেই বস্তুই আমাদের জন্য চান, তাই স্বীকার করিতে পারি না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ এই যে, তাঁরা চান আমাদের জন্য সুশাসন, আমরা চাই সত্য স্বায়ত্তশাসন। কারণ সুশাসনে পশুবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন ব্যতিরেকে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পরমার্থ-সিদ্ধ হইতে পারে না।

এঁরা চান দেশে যেন অকাল-মন্বন্তর না হয়, লোকে পেট পুরিয়া যেন দুবেলা খাইতে পায়। এঁরা এইজন্য প্রজার করভার লঘু করিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা করভার লঘু কি গুরু তা ভাবি না—আমরা কেবল চাই যে করভার যদি গুরু হয়, তাও আমাদের আত্মপ্রয়োজনে, আত্মনির্দ্ধারণে হইবে। অপরের প্রয়োজনে বা নির্দ্দেশে নয়। দেশরক্ষার জন্য, স্বজাতির শিক্ষার জন্য, শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য, স্বদেশবাসীদিগের সুখ-স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য যদি এখন যে করভার বহন করি, তদপেক্ষা দশগুণ বেশী বহন করিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু রাজস্বের প্রত্যেক কপর্দ্দক প্রজার প্রয়োজন সাধনে ব্যয়িত হইবে, আর প্রজার

নির্ব্বাচিত, বিশ্বস্ত, স্বদেশবাসী, স্বজাতীয় প্রতিনিধিগণ এই কর নির্দ্দিষ্ট করিবেন। বিচারালয়ে আমরা কেবল ন্যায়-বিচার চাহি না,—আমাদের নিজেদের লোক বিচার করিবেন ইহাও চাই। কারণ এই বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের লোকের বুদ্ধি প্রখর ও ধর্মজ্ঞান উত্তরোত্তর ফুটিয়া উঠিবার সম্যক্ অবসর পাইবে। আমরা শিক্ষা কেবল চাহি না—নিজেরা শিক্ষকও হইতে চাহি; কারণ শুধু অধ্যয়নে বিদ্যালাভ হয় না,—অধ্যাপনা ব্যতিরেকে অধীত বিদ্যা কদাপি পরিস্ফুট ও পরিপক্ক হইতে পারে না। আমরা কেবল সুরক্ষিত হইয়া থাকিতে চাহি না,—কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আপনাকে আপনি রক্ষণ করিবার শক্তি ও সরঞ্জাম লাভ করিতে চাহি; কারণ যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সে যতই কেন সুরক্ষিত হউক না, —জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে সে কদাপি অচল-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। আমরা কেবল শান্তি চাহি না, কিন্তু শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সংযমের ক্ষেত্র চাহি; কারণ যে শান্তি সংযমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহা বিষময় ও আত্মঘাতী। তাহাতে মানুষ পশুর অধম হইয়া যায়; তাহাতে তমোগুণ প্রবল হইয়া উঠে। সে শান্তি মৃত্যুর দ্বার, অমৃতের সোপান নহে। আমরা শক্তি চাই, আমরা বীর্য্য চাই,—আমরা সাধন চাই, যাহাতে পরমার্থ জাগ্রত হয়। আমাদের বিলাতী বন্ধুগণ কি এ পথে আমাদের সহায় কখনো হইবেন? যতই কেন উদার হউন না,—এতটা উদারতা তাঁরা সহিতে পারিবেন না। তাঁদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা কেবলই পদে পদে বিপথ-গামী হইব, এখনো যদি ইহা বুঝিতে না পারি, তবে আর কবে আমাদের এ চক্ষু ফুটিবে?

—১৬ই মার্চ, ১৯০৬

অমৃতং মৃত্তি ভাষিতম্

প্রিয় "অমৃত" বলিতেছেন, এত দেশ থাকিতে বরিশালে কন্‌ফারেন্স করিবার কারণ কি?

বাস্তবিক, কারণ কি? প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কারণ কি?

আমরা বলিতেছি, এবারকার কন্‌ফারেন্স কামস্কট্‌কায় করিলে হানি কি? কামস্কট্‌কা কিঞ্চিৎ কটমট বলিয়া যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে এযাত্রা সিংহলে সমবেত হইলে ক্ষতি কি? বিজয়বাহুর পর আর কোন প্রবল প্রতাপশালী বাঙ্গালী সিংহলে জয়পতাকা প্রোথিত করেন নাই। এবার সিংহল বিজয় করিলে হয় না? রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন,—

"প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ"

বাঙ্গালীর প্রতাপ "বন্দে মাতরম্" কন্যাকুমারীর পথে লঙ্কায় উপনীত হইয়াছে, সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। এইবার সেখানে কণ্ঠযন্ত্র সহযোগে "শব্দ" করিলেই ত দিগ্বিজয়ের অর্দ্ধেক কতে হইয়া যায়? আর সিংহল যদি মনঃপূত না হয়, হিন্দুর প্রাচীন উপনিবেশের কন্দে'ও দেশের অভাব নাই। যবদ্বীপ অর্থাৎ যাভা, বলিদ্বীপ অর্থাৎ বালি প্রভৃতি সমুদ্রোর্ম্মিচুম্বিত দেশে কনফারেন্স হইল না কেন? হনোলুলু ও চন্দ্রকোণা, ফিলিপাইন ও তারকেশ্বর, উত্তর মেরু ও করেসডাঙ্গা—সব পড়িয়া রহিল, আর বাছিয়া বাছিয়া ক্ষুদে লাট ফুলারের দুটি চক্ষুর বিষ, গুর্খা-বুটমর্দ্দিত বরিশালেই কন্‌ফারেন্স?

এ নির্ব্বাচন কে করিল?

"অমৃত" বলিতেছেন, দুর্দ্দান্ত বরিশালী পুলিস রাঘব বোয়ালের মত বদন ব্যাদান করিয়া আছে। এই যমের মুখে বাঙ্গলার বাছা বাছা নায়কদের নিক্ষেপ করিবার দুষ্ট কল্পনা কাহার? বাহিরের লোকে, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বরিশালের নেতাদের পুলিসের গ্রাসে সমর্পণ করিবার দুরভিসন্ধিতে এই টোপ্ ফেলে নাই ত? বরিশালের

অধিবাসীরা বিভীষিকায় ভয় করে না, ফুলারের মনে এই কাল্পনিক সংস্কার বদ্ধমূল করিবার বৃথা চেষ্টায়, বরিশালে কন্‌ফারেন্স চণ্ডীমণ্ডপের পত্তন হয় নাই ত? "অমৃত" শেষে প্রায় মুক্তকচ্ছ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বলি, বরিশালে এবার কন্‌ফারেন্স হইবে ত? যদি বা হয়, সেখানে নামজাদার বদলে বেকার নামহীন নগণ্য প্রতিনিধিদের ভিড় হইবে না ত?

বলা বাহুল্য, এ সব "অমৃতে"র প্রশ্ন—অমৃতায়মান অচল অটল সিদ্ধান্ত নয়। কেন না, তাহার পরই অমৃতবাজার বলিতেছেন, এসো, আমরা এক লহমার জন্যেও ধরিয়া লই যে, বরিশালবাসীর হৃদয়ে বল দিবার জন্য, প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্যই কন্‌ফারেন্স হইতেছে। বরিশাল অনেক সহিয়াছে, এখনও তাহার ক্ষতমুখে রুধির ঝরিতেছে, অতএব, বরিশালই কনফারেন্সের একমাত্র যোগ্য ক্ষেত্র। আমরা বলি সাধু!

অমৃতে আমাদের কোনও কালে অরুচি নাই। বিশেষতঃ সংপ্রতি অত্র দেশে মতান্তর ঘটিলেই মনান্তর, এবং মনান্তর ঘটিলেই একতা নষ্ট হইতেছে। এক্ষেত্রে যত দিন এই একতার জোড়-কলম বেশ জুড়িয়া না যায়, ততদিন আর মতান্তরের ঝঞ্ঝা তুলিয়া কাজ নাই। অগত্যা আমরা প্রসন্নচিত্তে কামস্কটকা, হনোলুলু যবদ্বীপ প্রভৃতির কন্‌ফারেন্স বক্ষে ধরিবার দাবী তুলিয়া লইতেছি। বরিশালেই কন্‌ফারেন্স বসুক।

এখন দেখা যাক, ভাবী প্রতিনিধিদের অবস্থা। "অমৃতে"র ভাণ্ড হইতেই আমরা কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে এত তথ্য, প্রশ্ন, সম্ভাবনা বিভীষিকা সংগ্রহ করিতেছি। আর এক পশলা অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হইতে, বোধ করি, কাহারও আপত্তি নাই। আর, যখন এহাটে কোনও আপত্তিই তুলিবার রীতি নাই, তখন আর ভয় কি? "অমৃত" সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকীর ন্যায় "আকাশে" জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন—"ধর্মক্ষেত্রে বরীশালে সমবেতা যুযুৎসবঃ", সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ও

মতিদাদার স্থায় নায়কদের ধরিয়া বরিশালের জেল-নামক অষত্ন খাঁচায় পুরিবে না ত? বরিশালের কন্‌ফারেন্সের পাণ্ডা ও নেতাদের আবার অনাহারী কন্‌ষ্টেবল করিবে না ত?

আমরা বলি, একটু ইংরাজী করিয়াই বলি, সে সব এখন ভবিষ্যৎ গর্ভিনীর গর্ভে। যখন দৈবজ্ঞ ঠাকুর এত খড়ি পাতিয়াও ফিরিঙ্গীর অভিসন্ধি নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের বিশ্বাস, উত্তরের আশা নাই।

এবার ত বরিশালে দুর্ভিক্ষ। শুনিয়াই একটু দমিয়া গিয়াছি। "অমৃত" ভুলিয়া যান, কিন্তু আমাদের মনে আছে,—বরিশালে কন্‌ফারেন্সের কথা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। তখন স্বদেশীও ছিল না, সুতরাং মালক্ষ্মীর অন্নক্ষেত্র বরিশাল হইতে পেলার হিসাবে মনে করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ বালাম সংগ্রহ করিয়া আনিব। দুর্ভিক্ষ বরিশালে মানুষ খাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার সে আশারও মাথা খাইয়াছে। পেলা চুলায় যাক, খোরাকীর ভাবনায় ঘুম হইতেছে না। অশ্বিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত কিরূপ? রসদের উপরই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে। রসদের পরিপাটী ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তাই অমৃতের কেবল নেতাদের চিন্তা, আর আমরা প্রতিনিধিদের ভাবনায় অস্থির।

যদি পোলাও কাবাব না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বরিশালই কারাগার। জগৎ একেই জীর্ণারণ্য, তার উপর কন্‌ফারেন্সে যদি আলুভাতে ভাতই সম্বল হয়, তাহা হইলে জেলে যাইতেই বা হানি কি? বরিশালের জেলে দাদখানি চাউলের অন্ন, একটু ঝোল ও কিঞ্চিৎ বল্‌কা দুধ পাইব ত? হরিনামের ঝুলিটি হাতে রাখতে দিবে ত?

এবারে "অমৃতে"র হ্যামলেট-ভাবের একটু অনুধ্যান করুন। To be or not to be, that is the question। ইহার বাঙ্গলা

অনুবাদ বোধ করি কোনও মহিলাকবি এইরূপ করিয়াছেন, "হয় কি না হয় প্রশ্ন ইহাই এখন।" প্রশ্ন গুরুতর। যাই কি না যাই একদিকে চক্ষুলজ্জা, লোকের উপহাস, ফিঙ্গের উপদ্রব। ওদিকে গুর্খার গুঁতার আশঙ্কা, নিদারুণ জেলের ভয়, ফিরিঙ্গির প্রেম-সাধে বাদ, তার উপর দুর্ভিক্ষ, সুতরাং রসাভাব। কি করি। যাই কি না যাই! "অমৃত" বলিতেছেন, এবার সকলেই চল। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ চৌহদ্দী করিয়া ভাঙ্গা ও অভাঙ্গা, সমগ্র বাঙ্গালার নায়ক বা নেতা মনুষ্যদের একটা ফর্দ্দ কর। তাঁহাদের শপথ করাইয়া লও যে, এবার বরিশালের কন্‌ফারেন্সে নিশ্চিত হাজিরা দিব। অবশ্য যাঁহারা 'ইন্‌ভ্যালিড্' অর্থাৎ শয্যাগত তাঁহাদের ছুটি। আমরা আবার বলি সাধু!

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রতিবাদ করিব না, কিন্তু একটু ত্রুটির উল্লেখ না করিলে নয়। তাই ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, এই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঘিরিয়া বাঙ্গালা জুড়িয়া যে জাল ফেলিলেন, ইহাতে এত বড় একটা ছিদ্র রাখিয়া দিলেন কেন? ঐ যে শয্যাগত—মহারন্ধ্র, ঐ পথে ত বাঙ্গালার যত রুই কাতলা, মৃগেল বাহির হইয়া যাইতে পারে! তখন কি পঙ্কচারী রোগা কই সিঙ্গি, চ্যাং ছাঁকিয়া তুলিয়া বরিশালের রাজনীতি দীর্ঘিকায় ছাড়িয়া দিবেন? অমৃত দাদা আপনি যে বলিতেছেন—স্বয়ং যাইবেন, তাহাই কি এই "ইন্‌ভ্যালিড" ছিদ্র থাকিতে ঘটিয়া উঠিবে? কন্‌ফারেন্সের প্রসঙ্গে আপনার বাজারে যেরূপ "হা হতোস্মিন" রব উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আপনার স্নায়ুর অবস্থাও শঙ্কাজনক। আপনি যদি ইন্‌ভ্যালিডের থাতে পড়িয়া যান, তাহা হইলেই ত সব মাটি! নভেলের ভাষায় বলিতে গেলে, বাগবাজারের গগনমণ্ডলের এক কোণে একটু ভয়ের একটু সন্দেহের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে,

"পুন পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন ডাক দিয়া বলে,
লক্ষ্য বিঁধিবারে যত ক্ষত্রিয় সকলে।"

ইহার অর্থ যে নিশ্চেষ্ট দেখিলেই ডাক দিয়া লক্ষ্য বিঁধিতে বলিতে হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নও ডাক দিয়াছিলেন, "অমৃত" ও দিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের আওয়াজ ভরাট, অমৃতের গলা একটু কাঁপিতেছে। কালের প্রভাব।

আমাদের পরামর্শ, শুধু ডাকাডাকি হাঁকাহাকির কর্ম্ম নয়। যদি কন্‌ফারেন্স সফল করিতে চান, তাহা হইলে যেমন রোগ সেই-ঔষধের ব্যবস্থা করুন। প্রথমতঃ ফুলার-ভয় নিবারণের প্রার্থনা করিয়া মিণ্টোর নিকট দরখাস্ত ও মরলীর নিকট 'তার' করুন। এই দরখাস্ত দুইখানির ও মহারাণীর সেই মামুলি ঘোষণাপত্রের লিখো প্রতিলিপি করিয়া বড় বড় তাম্রময় কবচে রক্ষা করুন। সেই কবচ একটু স্থূল রজ্জুসহযোগে গলদেশে ধারণ করিয়া বরিশালে গমন করুন, আর ফুলার-ভয় থাকিবে না। অবশ্য নেতাদের জন্য একটু বিশেষ রামকবচ আবশ্যক। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিন নেতাদের পক্ষ হইতে প্রজাদের যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কবচে তাহাও থাকিবে। গলায় দিবার দড়ি যেন একটু মোটা ও মজবুৎ হয়, নতুবা ছিঁড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না।

—২৯ মার্চ, ১৯০৬

শ্রীপঞ্চমী

দুইটি উৎসব আছে বৈদিক—তাহার মধ্যে একটি শ্রীপঞ্চমী। শ্রীপঞ্চমী—বাক্ বিভূতির আরাধনা। এ বাক্ কোন বাক্? ইনি ভগবচ্ছক্তি—যাঁহার রূপ এই সৃষ্টি-কমল। তাই ইনি কমলাসনা। ইনি শ্রী-হ্রী-তুষ্টি-পুষ্টি-ক্ষমা-লজ্জা-ধী—ইনি যে, কি নহেন তাহা তো জানি না। তবে জানি শ্রী রহিলে হ্রী থাকে, তুষ্টি পুষ্টি সবই থাকে। শ্রী হইতেই বিদ্যা অপরা নহে—পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা তুচ্ছ ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যমলিন—অমৃত হইতে দূরান্তর। পরাবিদ্যা অমৃতত্ব দান করে—

তাই তাঁহার নাম শ্রী। শ্রী ব্যতীত অমৃত নাই—অমৃত ছাড়িয়াও শ্রী রহিতে পারে না। পরাবিদ্যার শরণ লইলে জীব শিব হয়, অমৃতত্ব লাভ করে। তাই শ্রীপঞ্চমী উৎসব—বাণী বীণাপানি বাক্ দায়িনীর আরাধনা।

আমাদের দেশ সরস্বতী পূজা করিয়া পরাবিদ্যার অনুশীলন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিল। ভারতের শ্রী তাই—অনুপম অতুল অমৃতময়। এখানে জ্ঞানে শ্রী—কর্ম্মে শ্রী—অন্তরে শ্রী—বাহিরে শ্রী এই শ্রী জড়পুঞ্জের আবর্জ্জনা রাশি নহে, লালসার পুতিগন্ধ দুষ্ট নহে, এ শ্রী সম্পদ—অমৃতময়—অমৃতই ইহার কাম্য,—"যেনাহং নামৃতংস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম।"

সরস্বতী পূজায় সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে, পরাবিদ্যার সাধনা করিলে শ্রীভগবানের অনুকম্পা বর্ধিত হয়। অতীত ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রমাণ মিলিবে। কার্ত্যবীর্য্যার্জ্জুন হইতে ভীষ্ম, দ্রোণ পর্য্যন্ত, সনক সনাতন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে দিন হইতে ম্লেচ্ছ বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছি, সেই দিন উৎসন্ন গিয়াছি। ম্লেচ্ছের শিখানো অপরাবিদ্যার জৌলস আছে, কিন্তু উহা অগ্নিগর্ভ কালান্তক বিস্ফোরক, জ্বলা মালার শেষফল—ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া।

শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যক্ষণে তোমায় আহ্বান করিতেছি—মা বাণী বিদ্যাদায়িনী! এস আমাদের হৃদয়-কমলাসনে তোমায় আরাধনা করি! তুমি আমাদের তুষ্টি ও পুষ্টি দাও, আমাদের শ্রীযুক্ত কর।

বসন্তোৎসব

শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে মধু মাধবের আবির্ভাব—বসন্তের সংক্রমণ। শ্রীপঞ্চমী কেবল সরস্বতী পূজা নহে—উহা বসন্ত পঞ্চমী।

জাতি যখন বাঁচিয়াছিল, তখন তাহার জীবনে বসন্তের অমৃত স্পর্শের আবির্ভাব হইত, তাই এখনো পর্য্যন্ত তাহার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে।

বসন্তোৎসবের একটু ইতিহাস আছে। বসন্ত আপনি আসে না। লতায় পাতায়, বল্লরী বিটপী, কুজন কাকলী মলয় মারুতে যে বসন্ত তাহা মানব জীবনের মাধুরী জাগৃতি নহে, উহা জড় প্রকৃতির অচেতন প্রকাশ। মানব জীবনে বসন্তের বিকাশ অমনি হয় না, ত্যাগের মূলে—তপস্যার বিনিময়ে—বক্ষরক্তের উৎসর্গে তাহার আবির্ভাব।

উত্তরায়ণ এমন একটি ত্যাগ, যাহা মহিম হইতেও মহিমাময়—সেই ত্যাগ যজ্ঞের শেষে—শ্রী পঞ্চমীর অন্তে পরাজ্ঞানের অর্চনা আরাধনায় পরিশুদ্ধ হইয়া তবে বাসন্তী মধুরিমার সূচনা হয়—আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। বসন্ত কি? উহা তো কালের একটা অংশ নহে—বসন্ত—আনন্দ। বসন্ত আবির্ভূত হইল—ত্যাগে ও পরাবিদ্যা অনুশীলনে, উহার পরিণতি অথবা পূর্ণতা হইবে—হোলি-খেলায়।

হোলিখেলা—পিচকারী লইয়া প্রেমের গান গাহিয়া আলস্যে বিলাসে প্রমত্ত হওয়া নহে। হোলির রক্তরাগ বক্ষ শোনিতের প্রবাহ ধারা। জাতীয় জীবনের অসুর—সমাজ সংহতির শত্রুকে সংহার করিতে যে হৃদয় রক্ত ঝরিয়া পড়ে, তাহারই রক্তিম লেখা ঐ রক্ত রক্তিমা। বসন্ত পঞ্চমী উদ্‌যাপনের শেষ ক্ষণে জাতিশত্রুকে সংহার করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ মৃঢ্যাসুর সংহার করিয়া বসন্তোৎসব করিয়াছিলেন—প্রমোদরঙ্গে মাতিয়া নহে।

আমাদের বসন্ত পঞ্চমীর জীর্ণ মৃত অনুষ্ঠান আছে, তাহার প্রাণ নাই, তাই না জাতির জীবনের এই অবিচ্ছেদ দুঃখ দুর্গতি। কেন এমন হয়?

হয় তাহার কারণ, উত্তরায়ণের আত্মবিসর্জনে আমরা সঙ্কুচিত, বাণী বীণাপাণির আরাধনা করিয়া সত্য সত্য জ্ঞানানুশীলনে পরাঙ্মুখ, জাতীয় জীবনের বৈরি বিনাশে নিশ্চেষ্ট। কেমন করিয়া আমাদের মধু-মাধবের আবির্ভাব সম্ভব হইবে? ঐকান্তিক আগ্রহ দিয়া

বসন্তকে আকাঙ্ক্ষা করিলে বাসন্তী সিদ্ধির সিদ্ধ সাধনাকেও বরণ করিতে হইবে।

বসন্ত সিদ্ধির সার্থক সাধনার ধারা—আত্মবিসর্জ্জন—পরাজ্ঞানানুশীলন—জাতীয় অমঙ্গল দূরীকরণে হৃদয় রক্তক্ষরণ।

(আনন্দ বাজার পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ ২৬৩ সংখ্যা ৪ মাঘ। ১৩৩২
18th January 1926)

দোল যাত্রা

কাল বাসন্তী পূর্ণিমা—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। ঐ দেখ বসন্তের নীলাকাশ কি অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ওই দেখ ভগবান সুধাংশু তাঁহার অমিয় সুষমারাশি বিস্তার করিয়া নীলরাগরঞ্জিত পূর্ণাকাশে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন। ঐ দেখ শালতমাল পিয়াল-শ্যামায়িত কুহুরব-মুখরিত কুসুম-সৌরভান্বিত কালিন্দী-শীকরসিক্ত-পবন-সেবিত গোপীগণপূজিত পবিত্র বৃন্দাবনধাম আজ আনন্দ সাগরে মগ্ন। শ্রীকৃষ্ণ দোল উৎসবে মগ্ন হইয়াছেন। এই মধুযামিনীতে দোলমঞ্চে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা দর্শন করিয়া হৃদয় পবিত্র করি, চল-চল, আজ এই ভোগ-মধুর বাসন্তী পূর্ণিমায় আমরা সেই জগন্নাথের মাধুর্যময়ী লীলা দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই।

যিনি একদিন রাখাল বেশে গোচারণ ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন—যাঁহার 'প্রাণপণ উন্মাদকারী' শ্রুতিমধুর বেণুরবে যমুনায় উজান বহেছিল। যাঁহার বংশীধ্বনিতে আত্মবিস্মৃত গোপললনাগণ লজ্জা-সরম কুলমান জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিল—আজ সেই বিলাসরসজ্ঞ রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ হোলী খেলায় মত্ত হইয়াছেন। আর গোপীকারগণ তাঁহার গাত্রে কুমকুম ফেলিয়া দিতেছেন, আবীর দিতেছেন। প্রেমপুত্তলিকা আভীর বালাগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন—আর মাঝে মাঝে দোল দিতেছেন। বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ দোলমঞ্চে দুলিতেছেন, অন্তরে আবার কৃষ্ণমাধুরী-

মুগ্ধা গোপীগণের হৃদয় কমলমঞ্চেও তিনি দুলিতেছেন—মলয় পবন দিবস-রজনী তাঁহাকে দোল দিতেছে। বাহিরেও দোল, ভিতরেও দোল—সর্বত্রই দোল—দে দোল, দে দোল। যে এ দোল দেখিয়াছে, সে কি আর ঘরে থাকিতে পারে।

নীলাকাশে জগজন মনোহারী পূর্ণচন্দ্রের উদয়। পূর্ণচন্দ্র রূপ-লালসা বৃদ্ধি করে—আর কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে প্রশমিত করে। পূর্ণচন্দ্র উদয় হইলে সাগর যেমন তরঙ্গায়িত হয়, আজ কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ে গোপীহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। আজ গোপললনাগণ কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল। হে গোপাল! হে শ্রীনিবাস! হে কালীয়দমন! হে গোপী-জনবল্লভ! তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত তোমাকে জানা যায় না। তোমার লীলা খেলার কথা চিন্তা করিলেও আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। কি অপূর্ব লীলা! কি অনির্বচনীয় মাধুর্যরসের সমাবেশ—কি অদ্ভুত মিলন! অথচ ইহাতে কামগন্ধ নাই—বিলাসলালসা নাই। এ যাহারা বুঝিয়াছে তাহারাই মজিয়াছে, তাহারাই কুলমান ছাড়িয়াছে।

দোলমঞ্চে আজ যে কৃষ্ণকুসুম ফুটিয়াছে তাহার সৌরভে কামগন্ধ দূর হইয়া যায়। ভক্তি-তুলসী দিয়া—শ্রদ্ধা চন্দন দিয়া—কৃষ্ণপূজা করিতে হয়; নিবৃত্তি পুষ্প বিনা আবার কৃষ্ণপূজা হয় না। যাহারা ইন্দ্রিয় পরায়ণ যাহারা নীচ স্বার্থান্ধ তাহারা কৃষ্ণ পূজার অধিকারী নয়। গোপীকা-বেষ্টিত রাধালতা-বিজড়িত কুমকুমরাগরক্ত বিলাস-রসজ্ঞ নটবর শ্যামসুন্দর যে ইন্দ্রিয়াতীত। যাঁহারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ণময় শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে পারেন।

যিনি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, পাপাত্মাগণের বিনাশের জন্য, ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন—যিনি কৃষ্ণ সখারূপে উপদেশচ্ছলে ভারতে গীতাশাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন—যাঁহার প্রভাবে ব্যাস বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন—অর্জুন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—যাঁহার প্রভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম নূতন জীবন লাভ করিয়াছিল ও সমাজে

পারম্পর্য রক্ষিত হইয়াছিল—বিংশতি কোটি নরনারী যাঁহার পদানুসরণে আজ সঞ্জীবিত—সেই পুরুষ প্রধান মহা-মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণের দোল। এস, ধনী দরিদ্র বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া আজ সেই বিপদের বন্ধু, দুর্বলের বল, আশ্রিতের আশ্রয় বিপদবারণ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবৃন্দে আবীর কুমকুম প্রদান করি। তাঁহার আশীর্বাদে ভারতে আবার কর্মের স্রোত প্রবাহিত হইবে সমস্ত আপদরাশি দূর হইয়া যাইবে। এস, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দোল দিই আর প্রাণ ভরিয়া দেখি—"মুঞ্চে মধুসূদনঞ্চ গোবিন্দং দোলায়ধৃতং," "রথেচ বামনং দৃষ্ট পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" আর বলি, "কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষিকেশ বাসুদেব নমোস্তুতে"।

(ধর্ম হইতে পুনর্মুদ্রিত)

ইতু-পূজা

মিত্র পূজা—সূর্য্যের আরাধনা—চলতি কথায় ইহারই নাম ইতুপূজা। অগ্রহায়ণের রবিবাসরে শুদ্ধ সংযত, সদাচারী হইয়া একনিষ্ঠার সহিত মিত্র-দেবতার পূজা করিতে হয়।

অগ্রহায়ণ মাস—হেমন্ত ঋতুর অন্তিম কাল—এখন শীতের আক্রমণ—শিশির বিন্দুর খর পরষণ—বায়ুর কণ্টকিত শিহরণ—এখন প্রকৃতির বুকেও স্থবিরতা—মানুষের বুকেও অসাড়তা—এখন গলিত পত্রের মত যৌবনের শ্রীও বিবর্ণ হইতে বসিয়াছে। এই সূর্য্য পূজার উপযুক্ত কাল।

দিবাকর—প্রাণের দেবতা,—প্রাণ—জ্যোতিস্বরূপ—এই জন্তই বৈদিক ঋষির প্রার্থনা—"তমসো মা জ্যোতির্ম্ময়"—মৃত্যুই তমসাবৃত গাঢ় অন্ধকার। আজ মিত্র পূজাই করিতে হইবে। হে সূর্য্য—হে মিত্র আমাদের—আজ "তমসো মা জ্যোতির্গময়"।

হিন্দু সমাজে এমন শীতের স্পর্শ—এমন অবসাদের হিমানী-সম্পাত—এমন আত্মবিস্মৃতির কুয়াসা—কালিমার সংক্রমণ—আর

কবে হইয়াছে। হিন্দু—তাহার সমাজ সভ্যতাকে অবজ্ঞা করিয়াছে—সত্য সংযমকে বর্জন করিয়া—ফেরঙ্গ ভাবের প্রবাহে—তাহার সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া দিতেছে। ইহাই সমাজের শীত ঋতু—যমের দক্ষিণ দ্বার।

দেবতার বরে মানুষ বাঁচে—হিন্দুও বাঁচিবে। সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সেই সঞ্জীবনী বর মাগিয়া লইতে হইবে। ঐ ফেরঙ্গ ভাব, ফেরঙ্গ শিক্ষা দীক্ষা—উহার দিকে তাকাইতে নাই!—ইতুপূজা করিয়া আজ আমাদের এই তত্ত্বটাই মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

("সন্ধ্যা" হইতে পুনর্মুদ্রিত)

স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম

প্রসঙ্গটা বাঙ্গালীর মেয়ের সংকীর্ণতা। কিন্তু ব্যাপারটা আসিয়া দাঁড়াইল স্বদেশপ্রীতি এবং বিশ্বপ্রেম। তখনকার জাতীয় বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই বাঙ্গালী মেয়ের সংকীর্ণতার কথা তুলিয়াছিলেন। আজ উপাধ্যায় মহাশয় ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন "আপনারা কথায় কথায় বিশ্ব ও প্রেমের কথা কহিয়া থাকেন, অথচ কথা দু'টার সম্বন্ধে বোধ হয় বিশেষভাবে কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই। ব্যাপকভাবে প্রেমের স্ফুর্ত্তি হয় না।

অধ্যাপক মহাশয়:—যে প্রেমের ব্যাপকত্ব নাই, উহাকে মোহ বলাই ভাল।

ব্রহ্মবান্ধব:—বলিতে পারেন,—কিন্তু "না বিইয়ে কানাই-এর মা" হইতে নাই। প্রত্যেক বস্তুরই একটা ক্রম বিকাশ পদ্ধতি আছে, এটা জড় বস্তুতেও আছে, ভক্তি প্রীতিতেও আছে। একটা গাছ বীজ হইতে অঙ্কুরিত হয়—একবারে আগাগোড়া একটা বিবর্দ্ধিত গাছ কখনই জন্মায় না। একটা বীজ চাই, বীজের আবার অঙ্কুরিত অবস্থা আছে, অঙ্কুর ধীরে ধীরে গাছ হয়। আর প্রীতিই একবার হুস করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। শিশু প্রথমে মাকে নহে, মাতৃস্তনকেই আঁকড়াইয়া

ধরে—তাহার পরে মা তাহার কাছে সত্য হয়, পরে পিতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি। অন্তর্জ্জগত বহির্জ্জগত সকলেরই একটা রীতি আছে।

সু বাবু:—আপনি ভুল করিতেছেন, উপাধ্যায় মশাই। মহী-রাবণের ব্যাটা অহিরাবণও আছে।

ব্রহ্মবান্ধব:—থাকুক সে পাতালেই থাকুক না কেন, আমাদের বাছাদের ঘাড়ে চড়ে কেন! এই চড়িতে দিয়াই আমরা মরিতে বসিয়াছি।

অধ্যাপক মহাশয়:—কথাটা ঘুরিয়া যাইতেছে। নিজের টাকাকড়ি লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা যদি স্বার্থপরতা হয়, তবে কেবল আপনার প্রিয়জনকে ভালবাসাই বা নীচতা না হইবে কেন? আর গীতাতেও বলা হইতেছে, "সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

ব্রহ্মবান্ধব:—গীতার কথাটা থাক···বাবু! আমরা ক্লীব জাতি—আমরা গীতা-তত্ত্বের অনধিকারী।

সু বাবু:—কথাটায় ফিরিয়া আসুন। বিলাতেও আজকাল পেট্রিয়টিজমের বিরুদ্ধে আন্দোলন উঠিয়াছে।

ব্রহ্মবান্ধব:—উহাতেই তো মাথা খাইয়াছে। সেই কথাটা আপনাদের মনে আছে কি? ছোট ভাই বড় ভাইকে বলিল, "দাদা তুমি বাড়ীতে থাক, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই, না হয় আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই, তুমি বাড়িতে থাক।" মোটের ওপর নেমন্তন্ন খাওয়াটি ছোট ভায়ের এক চেটে। উহাদের রাজ্য-সাম্রাজ্য থাক, কামান-বন্দুক থাক, ব্যবসা-বাণিজ্য ষোল কলায় বজায় থাক—তোমাদের যেন কিছু না থাকে। তোমাদের এক আধটু স্বদেশ প্রেমের বিকাশ দেখলেই অমনি থাবারি দিতে সুরু করে—বলে, ও সব ক্ষুদ্রতা, তখন ওরা শ্রীপাটের বৈষ্ণব হয়ে দাঁড়ায়। এ সব মায়াবীর মায়ায় যারা ভোলে তাদের মত আহাম্মক আর আছে।

অধ্যাপক:—কিন্তু এই রকম একটা গণ্ডি অবলম্বন করিয়া থাকা কি বাস্তবিকই ক্ষুদ্রতা নয়?

ব্রহ্মবান্ধব ঃ—মোটেই না। প্রেমের আদি প্রকৃতি ঐ প্রকার, প্রিয়বৎসল না হইলে ভালবাসা অকালে মরিয়া যায়—আদি অবস্থায় যে প্রীতি শতমুখী তাহা ব্যভিচারী—মা যদি তাঁহার শিশু সন্তানের সহিত অন্য দশটিকেও স্নেহ করিতে থাকেন, তবে কোন শিশুরই মঙ্গল হয় না। এটা যে ঐশ্বরিক বিধান তাহা কেউ বুঝিতে চাহে না। ইতর জীবের মধ্যে অপত্যস্নেহ সাময়িকভাবে স্ফুর্ত্তি পায়, কিন্তু ব্যাঘ্রী শাবক প্রসবের পর যতক্ষণ না ছানাটি সমর্থ হয়, ততক্ষণ অনন্যচিত্ত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে, কেন জানেন, ঐ রক্ষার জন্য। সমস্ত প্রকার প্রেমেরই এই প্রকার পদ্ধতি জানিবেন। স্বদেশকে ভালবাসিয়া আমরা প্রেমের সাধনা করিব। এখন আমাদের "তথাপি মম সর্বস্ব রামঃ কমললোচন"। এই সাধনার বিঘ্ন ঘটাইতে কত মার কত প্রলোভন দেখাইবে, কত রক্ত দন্তী রাক্ষস রাক্ষসী খণ্ড খণ্ড করিতে আসিবে—ভুলিলেই সর্বনাশ—যে যাহা বলে বলুক, আমাদের কিন্তু তোমা-বই আর জানিনে—স্বদেশ আমাদের সর্ব্বস্ব—স্বজাতি আমাদের প্রিয়ের প্রিয়! আমাদের একমাত্র মন্ত্র "ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে"।

(আ. বা. প. ৪ মার্চ ১৯৩১)

ভালবাসা কি মুখের কথা!

আমার দেশ, আমার জাতি—মনে হয় বটে তাকে ভালবাসি। বাঙ্গালীর ছেলে নিজের দেশকে ভালবাসবে, নিজের মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করবে তা আর বড় কথা কি? বিচিত্র কি? কিন্তু ব্যাপারটা সত্যই বড় গুরুতর, বড় কঠিন। সহজ যত মনে হয়, তত সহজ নয়। তাহলে এত দিন এ দেশটা উদ্ধার হ'য়ে যেতো। দেশ উদ্ধারের পরামর্শ তো আজ হচ্ছে না! মান্ধাতার আমল থেকে খবরের কাগজে দেশ ভক্তির বান ডাকছে। আর ফিরিঙ্গী তন্ত্রের কাগজের মুখে বহুকাল ধরে দেশভক্তির খই ফুটছে। ফল তো

অষ্টরম্ভা। কেন এমন হয়? কারণ লোকের পরামর্শে ভালবাসা যায় না। দেশকে না জানলে কেহ দেশকে ভালবাসতে পারে না। আশ্চর্য্য হইও না সত্য কথা, তোমরা দেশকে মানো না চেনো না। যদিও এই দেশে জন্মিয়াছ, বাঁচিয়া আছ, আবার পুড়িয়া ছাই হইয়া এই দেশের মাটিতে মিশিয়া থাকিবে—তবু তোমার দেশকে জাতিকে জানিবার কোন উপায় নাই।

চোখের দেখায় চেনা যায় না, জানা যায় না। প্রাণ দিয়া দেখিতে হয়। তারপর চেনা-শোনা। তোমরা প্রাণ দিয়া ফিরিঙ্গী তন্ত্রের স্বপ্ন দেখ। ফিরিঙ্গীয়ানার চশমা চোখে দিয়া—ফিরিঙ্গী-তন্ত্রের ভাবে ভোর হইয়া বাঙ্গলা দেশে দয়া করিয়া দৃষ্টি দাও। এমন 'চোখের দেখায়' কি সোনার বাঙ্গলা চোখে পড়ে? বাঙ্গালীর সঙ্গে তোমার প্রাণের যোগ নাই। বাঙ্গলার বাহিরের রূপ বরং কখনও চোখে পড়িতে পারে, কিন্তু ভিতরের পবিত্র শ্রী ত চোখে পড়ে না—মনে জাগে না। তুমি পাড়াগাঁর শ্রী—বন জঙ্গলের রূপ—বড় বড় দীঘির ঢল ঢল যৌবন—খোলা মাঠের উদার লীলা দেখিতে পাও না। তোমার চোখে বাঁশঝাড়ের সৌন্দর্য্য ফুটিবার আশা নাই। কারণ তোমার সম্বল ফিরিঙ্গীতন্ত্রের মাপকাঠি। সেই মাপকাঠিতে তুমি জগতের সব সৌন্দর্য্য মাপিতে চাও। তা দুনিয়ার সব লীলা সকল খেলা ও মাপকাঠিতে মাপা যায় না। ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্য ধারা স্বতন্ত্র। সেই পুরাতন অথচ সনাতন সৌন্দর্য্য সেদিনকার শিশু ফিরিঙ্গীর মাপকাঠিতে মাপা যায় না। বিশেষতঃ এক জাতির ছাঁচে আর এক জাতির ভাব চাপা যায় না। তাই দেশের সৌন্দর্য্যে তুমি কখনও ভাগ বসাইতে পারো না।

আর এই যে সুজলা সুফলা বাঙ্গলা ইহাকে তুমি মুখে যা বল, কিন্তু ইনি সত্যই মা তা তোমার মনে জাগে না। মানুষের প্রাণই এই মাটির মার প্রাণ। যদি নিজের প্রাণে মানুষের প্রাণ অনুভব

করিতে পারো তবেই মাটির মাঝে মায়ের প্রাণ অনুভব করিতে পারিবে।

এ অনুভবের উপজীব্য কেবল ভালবাসা, দেশের যা আছে—মাটী, ঝোড়-জঙ্গল, খাল-বিল, বাঁশের বন, ছাইয়ের গাদা, দেশের ভিকিরি, ফকির, কৃষক মজুর সর্ব্বস্বকেই ভালবাসিতে হইবে—আপনার প্রাণের মত করিয়া ভালবাসিতে হইবে। যে দিন পারিবে সেদিন তোমার দেশপ্রীতির দীক্ষা।

(১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩)

[আঃ বাঃ পঃ শারদীয় সংখ্যা ১৩৩৬-এ পুনর্মুদ্রিত]

বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি

আমি একজন ইংরেজি-পড়া সন্ন্যাসী। আজকাল অনেকানেক সন্ন্যাসী বিলাতে গিয়ে শাস্ত্রের বুকনি মিশানো-বক্তৃতা কোরে খুব হাততালি খায়। আমারও একদিন শখ হোলো যে বিলাতের হাততালি খাবো। কলিকাতা বুম্বই ও মান্দ্রাজের হাততালি খুব খেয়েছি—এখন দেখি একবার চম্পকবরণ হাতের হাততালি কেমন মিষ্টি। সন্ন্যাসীর মন—যেমনি খেয়াল অমনি উঠা।

পাঠক—তোমরা বিলাতগামী সন্ন্যাসীর রূপ বোধহয় কখনও দেখ নাই। সাধারণতঃ মাথা গোঁফ দাড়ি সব মুড়ানো—রেশমের পাগড়ি রেশমের আলখাল্লা—পায়ে বিলাতী বুট—হাতে ছড়ি মুখে চুরুট—সঙ্গে পোর্টম্যাণ্ট গ্ল্যাডস্টন-ব্যাগ স্ট্র্যাপ-বাঁধা বিলাতী-কম্বল-জড়ানো বিছানা—গলায় টাকা-মোহর-ভরা কুরিয়ার ব্যাগ। আহা মরি—সেজেছে ভাল। আমিও ঐ রকম কতকটা ঢং ধরিলাম—কেবল পয়সার অভাবে রেশমটা জুটিল না। আর বুট চুরুট ছড়ি পোর্টম্যাণ্ট ইত্যাদি আমার সংসঙ্গ অনেকদিন ত্যাগ কোরেছে। হায়রে—আমার কেবল ইংরেজি পড়াই সার। আমার ছিল—গায়ে একখানি বনাত ও হাতে একখানি কম্বল। বন্ধুবান্ধবেরা ধোরে কোরে একটা গোবদা মোট গরম কাপড়ের আলখাল্লা কোরে দিয়েছিল। দিয়েছিল তাই বেঁচেছি—নহিলে বিলাতের ঠাণ্ডায় দফা রফা হোয়ে যেতো।

বুম্বইয়ে জাহাজে উঠিবার আগে ডাক্তারে পরীক্ষা করে—পেলেগ হয়েছে কি না—আর সব বোঁচকা-বুঁচকি কলের ভিতর পুরে একরকম ঔষধ দিয়ে ধুয়ে দেয়। আমার জিনিস-পত্তর দেখিতে এলো—দেখে কিছুই নাই। একেবারেই অবাক্। একটা ব্যাগ বা পুঁটুলিও নাই। শুধু হাতে বিলেত। ডাক্তার সাহেব একটু এদিক-ওদিক চেয়ে একখানা পাস দিয়ে দিলে। আমি একেবারে নবাবের মত গিয়ে জাহাজে

উঠিলাম। আর আমার সহযাত্রীদের দুর্দশার সীমা রহিল না। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি পুলিশের গুঁতো খুব চলিতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম—কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। এ দুর্দশা কেবল দেশী যাত্রীদের—সাদচামড়া দেবদেবীর নহে।

জাহাজে উঠে ভাবিতেছিলাম ভোজনের ব্যবস্থা কি কোরে করিব। মাছ মাংস রুচে না—আর সাহেবেরা তরকারি চর্বি দিয়া রাঁধে। ঘৃত আমাদের নিকট অমৃত—তাহা কিন্তু কর্তারা মুখে করিতে পারে না—যেমন কপাল। জাহাজ ছাড়িবার সময় বড় গোলমাল। ছাড়িয়া দিলে দেখি যে কতকগুলি সিন্ধুদেশবাসী হিন্দু সওদাগর জাহাজে উঠিয়াছে। কেহ মল্টা (Malta) কেহ জিব্রল্টার (Gibraltar) কেহ তুনিস (Tunis) যাইতেছে। সিন্ধীরা সর্বত্র ব্যবসায় করিতে যায়। জাপান, মার্কিন, ইউরোপ, আফ্রিকা সকল স্থানেই ইহাদের দোকান আছে। ইহারা জাতিতে বণিক্ কিন্তু মাংস ও মদিরা খায়। সমুদ্রপারে যাইলে ইহারা জাতিচ্যুত হয় না। আমি সিন্ধুদেশে অনেক দিন ছিলাম, তাই ইহাদের মধ্যে দুই একজন আমাকে জানিত। খুব খাতির। সকাল বেলা চা ও হাতগড়া-রুটি—মধ্যাহ্নে ভাত ডাল তরকারি—অপরাহ্নে চা ও রাত্রিতে রুটি তরকারি। ইহাদের সঙ্গে রাঁধুনি ও চাকর ছিল। সে খালাসিদের চুল্লীতে পাক করিয়া আনিত। বেশ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটিত। সমস্ত দিন তাস পাশা ও সঙ্গীত চলিত। তাহাদের মদিরাপানও সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সিন্ধীরা সুরাপান করে অল্পস্বল্প। মাতাল বড় একটা হয় না। জাহাজে একদিন একজন সিন্ধী উপরোধের দায়ে একটু বেশী খেয়ে মাতাল হোয়ে পোড়েছিল। সকলে তাহাকে এত ধিক্কার দিলে যে সে বেচারী লজ্জায় মরে।

জাহাজে তিন জন বুয়র ছিল। তাহারা বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। মুক্ত হইয়া দেশে যাইতেছে ইহাদের মধ্যে একজন সেনাপতি (Commandant)। ইনি বেশ ইংরেজি

জানেন। বুয়র যুদ্ধের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস ইংরেজিতে লিখিয়াছেন। সর্বসমেত পঁচিশ-ত্রিশখানা মোটা মোটা খাতা। শীঘ্রই ইহা মুদ্রিত হবে। আমি ইহার অনেকটা পড়িয়াছি। যে জাহাজে ইনি বন্দী হইয়া ভারতে আনীত হন—তাহাতে ৫০০ পাঁচশত বুয়র ছিল। ইনি বলেন যে সেই পাঁচশতের মধ্যে কেবল ৬৪ জন যোদ্ধা আর বাকি লোক কখনও যুদ্ধ করে নাই। এলোপাতাড়ি কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাহাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। ইনি ডিওয়েটের বন্ধু। ডিওয়েট একজন কৃষক (Farmer)। লেখাপড়া পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। যুদ্ধের আগে কে জানিত যে একজন গৃহস্থ কৃষক জগন্মান্য বীর হইয়া উঠিবে। ডিওয়েটের প্রস্থান বিবরণ শুনিয়া ইনি হাসিয়া উঠিলেন। গরু-মহিষদের সঙ্গে সঙ্গে ডিওয়েটের পলায়ন—ইহা কেবল কাল্পনিক। ডিওয়েট ইংরেজদের ঘেরাওকে কিছুই গ্রাহ্য করিত না। কোলেনসো (Colenso) এবং মডার নদীর (Modder river) যুদ্ধে বুয়রেরা ইংরেজদিগকে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে চড়াও কোরে ফতে করা একেবারে অসাধ্য। তাই কীচনর জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন কখন শিকার আসিয়া পড়ে। বোথা ইংরেজের Blockhouse অর্থাৎ জালের গাঁটের মতন ছোট ছোট কেল্লা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু রসদের অভাবে বুয়রেরা বড় ঘাল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজ সেনাদের রসদ লুট করিয়া তাহাদিগকে চালাইতে হইত। ইহাতেও তাহারা পেছপাও হয় নাই। কিন্তু যখন হাজার হাজার বুয়র রমণী ও বালক ইংরেজের কারাগৃহে মরিতে লাগিল তখন তাহারা মায়াবশে ও নির্বংশ হইবার ভয়ে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিল। এই ত আমার সহযাত্রী বুয়র সেনাপতির ইতিহাসের দুই একটি কথা। আমার একটি ছোট তামার লোটা ছিল। সেইটির উপর এঁর খুব নজর পোড়েছিল। তাই আমি ঐ লোটাটি তাঁহাকে উপহাররূপে দিয়া ফেলিলাম। ভারি খুশি। কিন্তু লোটা বিনা আমার বড় দুর্দশা হইতে লাগিল।

বুম্বই হইতে অদন (Aden) পর্যন্ত সমুদ্র কিছু বিক্ষুব্ধ ছিল। তাই আমি বড় পীড়িত (Sea-sick) হোয়েছিলাম। মনে হইতেছিল কি কুক্ষণে জাহাজে উঠিয়াছিলাম। অনেকেরই আমার মতন অবস্থা হোয়েছিল। কিন্তু অদনে আসিয়া সব সারিয়া গেল। অদন—লোহিত সাগরের কটক। লোহিত সাগর অতি সুন্দর। দুই দিকে দুই ভূখণ্ডের উপকূল। মাঝে মাঝে ছোট-ছোট গ্রাম। মধ্যে নীল পয়োধি। জল ও স্থল দুইই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া চোখের ক্লান্তি হয় না। যেতে যেতে আফ্রিকার উপকূলে একটা পাহাড় দেখা গেল তাহার নাম জবল শয়তান অর্থাৎ শয়তানের পাহাড়। দুই একজন আরবদেশীয় সওদাগর বলিল যে, এখানে জিনেরা অর্থাৎ ভূতেরা রাত্রিতে বড় ধাঁ-ধাঁ লাগিয়ে দেয়। দেখা যায় যে, দিব্য দীপালোকশোভিত জাহাজ বেগে ধাবিত হইতেছে। একেবারে যেন সত্যিকারের জাহাজের ঘাড়ে এসে পড়ো পড়ো হয়—নিশান (Signal) মানে না। যখন সকলে নিরাশ হয়—ঠোকর লেগে ডুবে যাবার ভয়ে আকুল হয়—তখন কোথায় বা জাহাজ আর কোথায় বা আলোকমালা—সব একেবারে অদৃশ্য। আরব-সওদাগরের কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু নাবিকেরাও ঐ তথা বলিল। আশ্চর্যের বিষয় যে একজন লেখাপড়া জানা জাহাজি ইঞ্জিনিয়রও সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এর পরে আর কি বলিব।

অদনে খুব গরমি। কিন্তু যতই জাহাজ উত্তরে উঠিতে লাগিল ততই ঠাণ্ডা পড়িতে লাগিল। আমার শরীর তখন বেশ ভাল ছিল। আমি অনেক রাত্রি অবধি জাহাজের উপরিস্থ ছাদে (Upper deck) বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের বাহার দেখিতাম। চাঁদ উঠিলে বড়ই শোভা হয়। রাত্রিতে একরকম মাছ দেখা যায়—সেই মাছের মুখ হইতে আলো (Phosphorus) বাহির হয়। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজের সঙ্গে ছোটে। দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্র থেকে তুবড়ি বাজি উঠিতেছে। আমি ইহাদের নাম রাখিয়াছি পরী মাছ। উড়ন্ত মাছও দেখিলাম।

তবে আর ওসব লিখিব না। সমুদ্র-যাত্রার বর্ণন চর্বিত-চর্বণ হোয়ে গেছে। খোড়-বড়ি-খাড়াকে খাড়া-বড়ি-খোড় বলিয়া আর কি হবে।

অল্পে অল্পে জাহাজ সুয়েজের (Suez) খালে প্রবেশ করিল। খালটি আমাদের কলিকাতার খালের অপেক্ষা কিছু চওড়া। দুই ধারে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। মাঝে মাঝে বৃক্ষলতা-শোভিত ইষ্টিশান। খালটি প্রায় ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। এই মরুভূমির মধ্য দিয়া অত লম্বা খাল কাটা অতিমানুষিক ব্যাপার। খালের প্রারম্ভে সুয়েজ বন্দর আর শেষে সৈয়দ বন্দর।

সৈয়দ বন্দর ছাড়াইয়া ভূমধ্যসাগরে আসিয়া পড়িলাম। আমার আবার রাত্রিতে বাহিরে বোসে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কোমরে খুব ব্যথা ধরেছিল। কতকটা উত্থান-শক্তি-রহিত হোতে হোয়েছিল। মেয়ে কেটে এক-একবার জাহাজের উপর আসিতাম। সৈয়দ বন্দর থেকে তিন দিন কেবল জলরাশি। তার পরে সিসিলি দ্বীপ দেখা গেল। সিসিলির এট্না আগ্নেয় পর্বত দেখিতে অতি ভীষণ। অম্বর-চুম্বিত শিখর-দেশ হইতে অবিরত দীপ্ত ধূমরাশি উদগীর্ণ হইতেছে। ধূসরকৃষ্ণ জলদজাল কটিদেশকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের জাহাজখানি এক ইতালীয় কোম্পানীর। ইহার গম্য-স্থান জেনোয়া (Genoa) শহর। ৫ই অক্টোবর বুম্বই ছাড়িয়াছিল। ১লা নভেম্বর নেপল্‌স্ শহরে আসিয়া পঁহুছিল। ইতালীয়েরা এই শহরকে নাপলী (Napoli) বলে। ইংরেজ বাহাদুর এই সুন্দর নামটিকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। নাপলী একটি ছবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দূর থেকে ঠিক যেন চিত্রার্পিতারম্ভ বলিয়া বোধ হয়। আমার টিকিট জেনোয়া অবধি ছিল। তথায় শুনিলাম নাপলী হইতে রোম (ইহার ইতালীয় নাম রোমা) রেলে চারি ঘণ্টার রাস্তা। রোমা দেখিবার বড় শখ হইল। জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িলাম। ভয়ানক কোমরে ব্যথা নিয়ে অতি কষ্টে ইষ্টিশানে গেলাম। কিছুক্ষণ

অপেক্ষা কোরে ডাকগাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি রোমে রাত্রি নয়টার সময় পঁহুছিবে শুনিয়া একটু ভাবনা হোলো। বিদেশ ভূঁই—কি জানি কি রকম। গাড়ি খুব বেগে চলিল। আগ্নেয় পর্বত বিস্নুবিয়স অতি নিকটে। ইহারও মাথায় ধূমরাশি। বিস্ময়ের কথা যে, ইহার পৃষ্ঠে ও তলদেশে বড় বড় বসতি আছে। কতবার ভস্মসাৎ হইয়াছে তবুও ভয় নাই। রাস্তার দুই দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুন্দর সুন্দর গ্রাম। সমস্ত দেশটি যেন একখানি বাগান। বাহিরে ত এই প্রকৃতির শোভা। আবার গাড়ির ভিতরেও প্রকৃতির লীলা। আমার গাড়িতে এক যুবক ও এক যুবতী উঠিয়াছিল। যুবক একটু স্থির গম্ভীর কিন্তু নারীটি কিছু চঞ্চলা। এই যুগল মূরতির হাব-ভাব ব্যবহার দেখিয়া আমি ত একেবারে আড়ষ্ট। যুবক মাঝে মাঝে যুবতীর মুখ রুমাল দিয়া মুছাইয়া দিতেছে—পাছে কয়লার কালিমা লাগে—কখনও বা সুরা ঢালিয়া উভয়ে পান করে—আর কত যে কথা. কত যে ভঙ্গিম—বর্ণনায় কুলাইয়া উঠা দায়। গাড়িভরা ভদ্রলোক। তাহারা ওরূপ আচরণ দেখে ভ্রূক্ষেপও করিল না—যেন ওটা সচরাচর হয়ে থাকে। কিন্তু আমার প্রাণটা হাঁপ হাঁপ করিতেছিল। কেননা আমার মনে ধারণা হয়েছিল যে নারীটি বারাঙ্গনা নহে—কুলাঙ্গনা। সত্য সত্যই সে কুলাঙ্গনা। আমার ত দেখে শুনে চক্ষুস্থির। যাহা হউক এইরূপ অন্তঃপ্রকৃতির ও বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছি এমন সময় দুইটি ইতালীয় ভদ্রলোক গাড়িতে চড়িল। পরে জানা গেল যে, তাহারা মামা-ভাগিনেয়। মামা অল্প ইংরেজি জানে—ভাগিনেয় বেশ জানে। মামা একজন যোদ্ধা। তাঁহার সঙ্গে একটি খোদিত লাঠি আছে। উহাতে তিনি যত যুদ্ধ করিয়াছেন, সব উহাতে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। আমার সহিত কথা আরম্ভ হইল। আমি ইতালী দেশের সাহিত্য ইতিহাস শিল্পকলা ও রাজনীতির বিষয় কিছু কিছু জানি। যথা এঁরা—পেলিকো (Pellico) কি প্রকার দেশের জন্য কারাকষ্ট সহিয়াছিলেন—আর কবি পেত্রার্কা লরার জন্য কি প্রকার

কাঁদিয়াছিলেন—ও আরো আরো ইতালীদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা এই কম্বলমাত্র-সম্বল বাঙালী সন্ন্যাসীর নিকট শুনিলেন—তখন তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ইতালী দেশকে আমি বড় ভালবাসি। ইতালীর ভাষা অতি সুমিষ্ট। ইতালীর লোকেরা বড় সৌজন্যগুণসম্পন্ন। আমার ইতালীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পক্ষপাতিতা দেখিয়া মামা ও ভাগিনেয় খুব আপ্যায়িত হইলেন। তাঁহারা রোমনিবাসী নহেন। তাঁহাদের বড় ইচ্ছা যে, আমি তাঁহাদের দেশে যাই। যাহা হউক, আমার আর কিছু ভাবিতে হইল না। তাঁহারা আমাকে এক হোটেলে লইয়া গিয়া বাসা দিলেন। খরচ-টরচ আমার এক পয়সাও লাগিল না। রোমের বিশেষ বিবরণ আগামী সপ্তাহে লিখিব।

আমি ইংলণ্ডে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। (Oxford) উক্সপারে আছি। হাততালি খাবার খুব যোগাড় হোয়েছে। আগামী সপ্তাহে আমি একটি বক্তৃতা দিব। বিষয়—হিন্দুর চিন্তাপ্রণালী ও পাশ্চাত্য বিদ্যা। সভাপতি হইবেন এখানকার সংস্কৃত অধ্যাপক (Boden Professor of Sanskrit) এ, এ, মগ্‌দানল, এম-এ,। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটা গোলমাল শুরু হোয়েছে যে, হিন্দুদর্শনের বিষয় বলিবার জন্য একজন কে কলিকাতা হোতে এসেছে। ছেলেবেলা কলিকাতায় রাস্তায় অনেক ছুয়ো হাততালি খেয়েছি। তবে বাঙালী আর ইংরেজি হাততালিতে অনেক ভেদ। দেখি কপালে কি আছে। বিলাতের অনেক কথা আছে। আজ এই পর্যন্ত। ইতি—

তারিখ ১৩ই নভেম্বর, ১৯০২

দুই

প্রথম চিঠিতে রোমে আসা পর্যন্ত লিখেছি। এক হোটেলে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা ট্রামগাড়ি কোরে শহর দেখিতে বাহির হোলাম। খুব ঠাণ্ডা পোড়েছে আর পোড়া কোমরের ব্যথাও খুব চেগে উঠেছে। তবুও মোরে মোরে চলিলাম। শহরের কথা আর কি বলিব। দোকানগুলি এমনি সাজানো যেন এক একখানি ছবি। এত ফুলের দোকান যে দেখে বিস্মিত হোতে হয়। সৌন্দর্যকে প্রকৃতির আড়াল থেকে টেনে বাহির কোরে মাঝ মজলিসে বসাতে এরা বড়ই মজবুত। রোমনগর সাতটি পাহাড়ের উপর নির্মিত। তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। কোথাও উঁচুতে উঠিতে হয়, কোথাও বা নীচে নামিতে হয়। রাস্তাগুলি মাঝে মধ্যে বড় বড় চকে (Square) এসে পোড়েছে। চক সকল বড় সুন্দর। চারিদিকে ভাল ভাল বাড়ি ও দোকান। মাঝখানে পাথরের মূর্তি ও ফোয়ারা। ফোয়ারা দিয়ে অনর্গল স্বচ্ছ শীতল জলধারা পড়িতেছে। রোমে চারিটি বৃহৎ পয়োনালী (aqueduct) আছে। এই নালী সকল দুই সহস্র বৎসর পুর্বে নির্মিত। দূরে এক উচ্চ পাহাড়ের ঝরনা হোতে ইহাদের ভিতর দিয়া শহরে জল আসে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও অনুপম প্রস্তরমূর্তি সকলে রোমের পুরাতন কীর্তি জীবন্তভাবে পরিরক্ষিত রহিয়াছে। এইরূপে শহর দেখিতে দেখিতে উধাও মনে চলেছি এমন সময়ে ট্রামের অধিনায়ক (conductor) এসে বলিল যে, ট্রাম আর যাইবে না। নামিয়া দেখি যে এক প্রকাণ্ড দেবালয় বা গির্জার সম্মুখে এসে পড়েছি। দলে দলে নরনারী বালক-বৃদ্ধ ধনী-দরিদ্র—কেহ বা বাহির হোয়ে আসছে, কেহ বা ভিতরে যাচ্ছে। এই দেবালয় এত বড় যে, ইহার মধ্যে ও প্রাঙ্গণে বাট হাজার লোক ধরে। দেখিতে মনে হয় যে, ইহা বিশ্বকর্মা নিজহাতে নির্মাণ করেছেন। ভিতরে যাহা দেখিলাম তাহা আমার সাধ্য নয় বর্ণন করা।

বর্ণনা করিতে যাওয়া কেবল চক্ষু কর্ণে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া। মণি-মুক্তা প্রবালাদি নাই কিন্তু দেবালয়টির রজতশুভ্র মর্মরের হাস্যকৌমুদীতে যেন বিধৌত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কতশত সাধু সাধ্বী মহাজনের (Christian Saints) মূর্তি ও চিত্র স্থানটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। ইতালী দেশে পাঁচ-সাতশত বর্ষ আগে মহা মহা শিল্পী ও চিত্রকর জন্মিয়াছিলেন। এখনও ইতালীর শিল্প ও চিত্রণবিদ্যা জগতে অতুলনীয়। এই চিত্রকরেরা দেবালয়ের দেওয়ালে ভিতরে বাহিরে ছবি আঁকিতেন। জগতে যত চিত্র আছে তন্মধ্যে র‍্যাফেয়েল নামক এক দৈবশক্তি-সম্পন্ন চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত মাতৃমূর্তি না কি সৌন্দর্যে ও ভাবুকতায় শ্রেষ্ঠ। কাস্থলিক (Catholic) খৃস্টানেরা মাতৃমূর্তির বড় ভক্ত। মাতা মেরী (Mary) বালক যীশুকে কোলে করিয়া দণ্ডায়মানা। ইহাকেই মাতৃমূর্তি (Madonna) বলে।

চিত্রকর মায়ের মুখে এক অপূর্ব করুণরস ঢালিয়া দিয়াছেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে বলে যে, মা আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র অকালে নিহত হইবেন। তাই সুতস্পর্শজনিত আনন্দ বিচ্ছেদ-বিষাদে সংমিশ্রিত। মিলনানন্দের ভাগীরথী যেন ভাবী বিরহশোকের কালিন্দীর সহিত মিলিয়া মায়ের চোখের আর্দ্রকরুণভাব গড়িয়াছে। এমন মঙ্গলময়ী মূর্তি অতি বিরল। আজকাল য়ুরোপের ছবি আঁকিবার ঢং বদলিয়া গেছে। মঙ্গলভাবের লেশমাত্র নাই, কেবল রূপের ছটা ঘটা। উপাস্য মূর্তি সকলেরও এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। অধিক সৌন্দর্যবিন্যাসে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। তজ্জন্য প্রতিমার সৌন্দর্য একটু মঙ্গলভাবের দ্বারা চাপিয়া রাখিতে হয়। আমাদের দেশে এই ভক্তি-তত্ত্ব বেশ জানা আছে। এখনও য়ুরোপে অনেক দেবালয়ে প্রতিমা সকল একেবারেই সুশ্রী নয়। আর ভক্ত বিশ্বাসী কাস্থলিক খৃস্টানেরা প্রাণ গেলেও সেই সকল কুরূপ প্রতিমাগুলির পরিবর্তে সুরূপ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। যাহা হউক, রোমের এই সুবৃহৎ দেবালয়ে অদৃষ্ট স্বর্গীয় ভাব সকল—ন্যায় দয়া শক্তি ক্ষমা আনন্দ প্রেম ধ্যান

জ্ঞান ভক্তি সেবা—প্রস্তর-মূর্তিতে ও চিত্রপটে যেন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি যেদিন এই দেবালয়ে গিয়াছিলাম সেদিন কাস্থলিকদের শ্রাদ্ধপর্ব। কাস্থলিকেরা মৃত স্বজনের আত্মার কল্যাণের জন্য যজন মন্ত্রপাঠ ও দান করে। পুরোহিতেরা যজমানের হইয়া যজন ও মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। সেদিন তাই বিবিধবর্ণশোভিত যজনযোগ্য বসন পরিধান করিয়া তাঁহারা লাতিন (Latin) ভাষায় গম্ভীর স্বরে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন, আর ধূপধুনায় বেদী গৃহ সকল আমোদিত। কাস্থলিকদের আচার-পদ্ধতি অনেকটা হিন্দুদের সঙ্গে মিলে।

দেবালয়ের লাগাও পোপের (Pope) প্রাসাদ। পোপ কাস্থলিক খৃস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু। ইংরেজি ভাষায় ইঁহাকে পোপ বলে কিন্তু ইতালীয় ভাষায় পাপা অর্থাৎ পিতা বা বাবা বলে। ধর্ম বিষয়ে পোপের বিধি বা শাসনকে সমগ্র কাস্থলিকমণ্ডলী (সংখ্যা বিশ কোটি হবে) একান্ত মান্য বলিয়া স্বীকার করে। পোপের সঙ্গে আর ইতালীয় রাজার সঙ্গে এখন ঘোর বিবাদ। রোম ও তৎপার্শ্বস্থ কতকটা প্রদেশ পুরাকালের নৃপতিরা দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। বর্তমান রাজার পিতামহ এই দেবোত্তর সম্পত্তি—যাহা পোপেদের সম্পূর্ণ অধীনে ছিল—কাড়িয়া লন। পোপের কেবল প্রাসাদ ও দেবালয়টি আছে। রোম এখন রাজার। পোপ এইজন্য কেবল ইতালীয় রাজাকে ধর্মমণ্ডলী-চ্যুত করিয়াছেন। নৃপতির প্রাসাদটি আগে পোপেদের ছিল। এই প্রাসাদ এখন অভিশপ্ত ও পতিত। ইহাতে কোন পুরোহিত যজনক্রিয়া করেন না। রাজমহিষী বা রাজপুত্রেরা মণ্ডলীচ্যুত নহেন। তাঁহাদের ও রাজকুটুম্বদের জন্য প্রাসাদের গায়েই এক গৃহ নির্মিত হইয়াছে। সেখানে পুরোহিতেরা যজনক্রিয়াদি করেন। ইতালীয় লোকেরা যেমন রাজভক্ত তেমনি পোপভক্ত। তাহারা মহা ফাঁপরে পড়িয়াছে। এই বিবাদ যে শীঘ্র মিটিবে এরূপ আশা নাই। পোপ আপনাকে দেবোত্তর রোমের রাজা মনে করেন

এবং রাজাকে অপহর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন কাস্থলিক নৃপতি রোমে আসিলে অগ্রে তাঁহাকে পোপের সহিত দেখা করিয়া পরে রাজার সহিত দেখা করিতে হয়—নইলে পোপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না। রুশের সম্রাট শীঘ্রই রোমে আসিবেন। তিনি রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি কাস্থলিক নহেন। কিন্তু যেদিন তিনি পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন সেদিন তাঁহাকে রোমে যে রুশ এল্‌চির (Ambassador) বাটী আছে সেই বাটী হইতে রওয়ানা না হইলে পোপ তাঁহার সহিত দেখা করিবেন না।

রোমের দেবালয় দেখার পর আমার কোমরের ব্যথা অত্যন্ত বেড়ে উঠিল। একেবারে চলচ্ছক্তিহীন। তাই ট্রামে কোরে আস্তে আস্তে ইষ্টিশানে গিয়ে বোসে রইলাম। আমার রোম দেখা হোয়ে গেল। দেশে ফিরে যাবার সময় ভাল কোরে পারী (Paris) ও রোম নগর দেখিয়া যাবো মনে করেছিলাম।

আমি যখন ইষ্টিশানে গেলাম তখন বেলা প্রায় চারিটা। গাড়ি রাত্রি নয়টার সময়। চুপ করে বোসে আছি—ভাবছি কি করি এমন সময় এক বহুভাষাবিৎ কর্মচারী (Interpreter) এল। ইহার কাজ বিদেশীদের সাহায্য করা। বেচারি আমাকে খুব খাতিরযত্ন করলে, টিকিট কিনে দিলে ও গাড়িতে চড়িয়ে দিলে। একেবারে লণ্ডনের টিকিট লইলাম। টিকিটটা একখানা আট-দশ-পাতা ছোট-খাতার মতন—পাতে পাতে ছাপ মারা অর্থাৎ যতগুলি টিকিট যাচাই করিবার (Checking) ইষ্টিশান আছে তাহাতে ততগুলি পাতা। প্রত্যেক জায়গায় এক একখানা কোরে পাতা ছিঁড়ে নেয়। ইতালী ভাষায় লণ্ডনকে লণ্ড্রা (Londra) বলে। কেন যে আমরা দেশ ও নগরগুলিকে ইংরেজের মতন বিকৃত কোরে বলি তা ত বুঝিতে পারি না। কালকোটাকে ইংরেজ কালকাটা (Calcutta) বলে আর আমরা একটু শুদ্ধ কোরে বলি কলিকাতা। কলিকাতা কথাটা না সাপ না বেঙ। ইংরেজের অনুকরণ করিলে কিরিঙ্গি ছাড়া

আর কিছু হওয়া যায় না। আর ও ভেবে কি হবে। গাড়ি আপন মনে লণ্ডার দিকে ছুটিল। পরদিন সকাল বেলা নয়টার সময় তুরীন (Turin) নগরে আসিল। খুব শীত রোমে। প্রত্যেক বাড়ির নীচে আগুন রেখে দিয়েছিল। একটা কোরে কাঁটা বা হাতল আছে—সেটা বামদিকে সরালে গাড়ি খুব গরম হয়—মাঝামাঝি রাখলে মাঝামাঝি হয় আর ডানদিকে সরালে খুব ঠাণ্ডা হয়। তুরীন ইষ্টিশানে দেখি আর এক বন্দোবস্ত। প্রত্যেক গাড়িতে দুটো কোরে মোটা মোটা চৌকোণা লোহার থামের মতন কি রেখে গেল। তার উপর বেশ পা রাখা যায়। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গাড়ি যখন আরও উত্তরে উঠিতে লাগিল তখন পা দুটো ঠাণ্ডায় কালিয়ে যেতে লাগিল। কি জানি বাপু লোহার থামগুলো কি জন্যে দিয়ে গেছে। আমি তার উপর পা একেবারে দিই নি। হঠাৎ কিন্তু একবার তার উপর পা পোড়ে গেছে আর দেখি যে বেশ গরম। পা দুটো গরম কোরে বাঁচিলাম। তখন দেখি থামগুলি গরম জল পোরা—যাত্রীদের পা গরম রাখিবার জন্য। আমার গাড়িতে .কহ ছিল না যে বুঝিয়ে দেবে। গাড়ি আল্‌পস্‌ (Alps) পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়িল। ভয়ানক ভয়ানক গিরি-সঙ্কট ও পর্বতের পেটের (Tunnel) ভিতর দিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এক-একটা পেট পার হইতে কম-বেশি ১০।১৫ মিনিট কোরে লাগে। এখানকার কী মনোহর দৃশ্য! দুই দিকে উচ্চ পর্বতমালা। তাহাদের শিরোদেশ স্থানে স্থানে তুষারমণ্ডিত। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ছোট ছোট গ্রাম আর সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় হরিৎ-শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে কল্লোলিনী নির্ঝরিণী সকল মেঘমণ্ডলের ছায়াপথের ন্যায়—দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের ন্যায়—পর্বত-বক্ষ শোভিত করিয়া রেখাকারে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামগুলি যেন এক-একটি আশ্রম। প্রত্যেক গ্রামে একটি কোরে দেবালয় বা গির্জা আছে। এখানে সভ্যতার প্রকোপ কিছু কম তাই ধর্ম বুঝি শহর থেকে পালিয়ে এসে এই

পার্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেমেয়েগুলি বেশ নাদুস-নুদুস। গালগুলি পাকা করমচার মত লাল।

পর্বতের অত্যুচ্চ বরফান প্রদেশে কাম্বলিক সন্ন্যাসীদের (Monk) মঠ আছে। ইঁহাদের কাজ ধ্যানধারণা করা—গ্রন্থ লেখা আর অতিথিসেবা করা। এই মঠ সকলে বড় বড় কুকুর আছে (St. Bernard's dog)। তাহারা আহার-পানীয় লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পথভ্রান্ত ক্ষুধার্ত পথিকদিগকে আহার দেয় ও পথ দেখায়। আর যদি শীতে বিকলাঙ্গ হয় তাহা হইলে পৃষ্ঠে করিয়া মঠে লইয়া আসে। এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে (France) ফরাস দেশে আসিয়া পড়িলাম। প্রকৃতি এই দেশটিকে বড় ভালবাসে। শুনেছি য়ুরোপে এমন সুন্দর দেশ আর নাই। সেই রকমই বোধ হোলো। ইতালীও মনোরম কিন্তু একাধারে এত সৌন্দর্য নাই। যেমন বড় বড় পাহাড় তেমনি নদী ও সমতল ভূমি। যাহা হউক, গাড়ি ত এক নিশ্বাসে রাত্রি ১১ এগারটার সময় পারী নগরীতে এলো। নাপলীতে ১লা নবেম্বরে জাহাজ থেকে নামি। সেই দিন রাত্রিতে রোমে আসি। পরদিন ২রা রবিবার রাত্রিতে রোম ছাড়ি। তার পরদিন রাত্রিতে পারী। পারী নগরী আর দেখিলাম না। পরদিন বেলা নয়টার সময় গাড়ি। তাই কাজে কাজে শীতে হি হি করিতে করিতে একটা হোটেলে গেলাম। শুধু শোবার জন্য প্রায় দুই টাকা লইল। শোবার আরামের কথা আর কি বলিব কম্বলে শোয়া অভ্যাস কিন্তু আয়েস-বোধটা বেশ আছে বুঝা গেল। আমার প্রকোষ্ঠে একটা স্প্রিং খাট—শুলেই একহাত নেবে যেতে হয়। তার উপরে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা। দেওয়ালে একটা বোতাম টিপিলেই ঘরময় বিজলীর (electric) আলো। আর বড় বড় আরশি টেবিল, কাপড় রাখিবার দেরাজ আর ঘড়ি আর একটা হারমোনিয়ম। আরাম করে শুয়ে নেওয়া গেল। কম্বলে শুয়ে শুয়ে হাড়-মটমটানি রোগ ধরেছিল। হাড় জুড়িয়ে গেল। তবে বৈরাগ্যটা না জুড়লেই বাঁচি। পারী নগরী

হইতে রেলে নয়টার সময় গাড়ি ছাড়িল। সমুদ্রের বন্দরে বেলা ১২টায় পৌঁছিল। তার পরে জাহাজ। আবার তার পরে গাড়ি। অবশেষে উপনীত লণ্ডনে। তখন সন্ধ্যা। সেখানে সেই রাত কাটিয়ে তার পরদিন ৫ই উক্ষপারে (Oxford) আসিলাম। এখানে সেই অবধি আছি। এখানে প্রায় ১৮।০টা কালেজ আছে। দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্রেরা পড়িতে আসে। শহরের দুই ধারে নদী। ইহার বর্ণনা পরে লিখিব।

এখন আমার হাততালি খাবার কথা। এক চোট হোয়ে গেছে। গত মঙ্গলবারে আমি—হিন্দু চিন্তা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা (Hindu Thought and Western Culture)—বিষয়ে বক্তৃতা করি। এখানকার সংস্কৃত অধ্যাপক (Boden Professor of Sanskrit) এ. এ. মগ্‌দানল এম-এ সভাপতি ছিলেন। লোকজন মন্দ হয় নাই। কলিকাতার জর্জ ট্রিভিলিয়ান (Trevelyan) উপস্থিত ছিলেন। আমার বক্তৃতার মর্ম এই যে, জীবনপথের জটিল সমস্যা ভঞ্জন করিতে য়ুরোপীয়েরা কেন হিন্দু চিন্তাপ্রণালীর সাহায্য না লয়। যুদ্ধের সময় ভারতের সৈনিক চাই। কিন্তু প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির যুদ্ধের সময় ভারতের দর্শন কেন না চাই। হিন্দু জাতি কেমন করিয়া সমস্যা ভঞ্জন করে তাহার দুই একটি নমুনা দেখাইলাম আর বলিলাম—শুধু সুখ্যাতি করিলে হইবে না—হাতে-কলমে কোরে দেখিতে হবে—তা হোলে সুফল ফলিবে। খুব হাততালি। লোকে আরও বক্তৃতা শুনিতে চায়। আমিও তাই চাই।

নামটা একটু রোটে গেছে। ছোকরা মহলে কথা চলেছে। অধ্যাপকেরাও কানাকানি করিতেছেন। যাঁরা সিভিলিয়ানদের পড়ান তাঁরা আমার খুব বন্ধু হোয়েছেন। এবং দুচারজন যারা সিভিলিয়ানি পাস কোরেছে ও শীঘ্র ভারতে যাবে তারাও বক্তৃতা শুনে খুশি হোয়েছে। এখানে কলেজ ১৩ই ডিসেম্বরে বন্ধ হবে। তার মধ্যে আমি তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা করিব। প্রথম—হিন্দুর আস্তিক্যতত্ত্ব (Hindu

Theism)—দ্বিতীয় হিন্দুর নৈতিকতত্ত্ব (Hindu Ethics)—তৃতীয় হিন্দুর সমাজতত্ত্ব (Hindu Sociology)। আমার ভাগ্য ভাল। বেলিয়ল (Balliol) কালেজের প্রধান অধ্যাপক (Principal—এখানে Master বলে) ডাঃ কেয়ার্ড (Dr. Caird) আগামী বারে সভাপতি হইবেন। ইনি বর্তমানে ইংলণ্ডের একজন প্রধান দার্শনিক। সকলেই বলিতেছে এটা বড় সম্মানের বিষয়। বাস্তবিক আমি এখানে অজানিত অপরিচিত—কোন সুপারিশ চিঠিপত্রও আনি নাই। তবে ভাগ্যক্রমে আমার মাসিক পত্রিকায় (Twentieth Century) বেদান্তের আলোচনা মগ্‌দানল সাহেব পড়িয়াছিলেন—তাই বাঁচোয়া। তাই ত তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। আবার তার পরে ডাঃ কেয়ার্ড সভাপতি। আঙুল ফুলে কলাগাছ। এখন শেষ থাকিলে হয়। আগে থেকে ঢাক বাজিয়ে শেষে অপ্রস্তুত হওয়া বড় লজ্জার বিষয়। দেখি কিরকম হাততালি জমে। তারপর ডঙ্কা মেরে দেশে ফিরে যাবো। নহিলে চুপি চুপি পুনর্মূষিকো ভব।

ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা কিছু কিছু দেখেছি। এখন যাত্রা-বৃত্তান্ত সাঙ্গ হোয়েছে। এইবার একটু একটু সার কথা লিখিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

উষ্কপার

তারিখ ২০শে নভেম্বর

বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি

বিলাত-যাত্রীর দুখানি চিঠি লিখেছি। এখন আমি বিলাতবাসী—তাই প্রবাসীর ছাঁদে লিখিতে বসেছি।

বিলাত কথাটার মানে কেহ কেহ বোধ হয় জানেন না। বিলায়েৎ শব্দে পারসীতে স্বদেশ বা বাড়ি বুঝায়। যাহা ইংরেজের বিলায়েৎ বা দেশ তাহাকে আমরা বিলাত বা বিলেত বলি। আমি অনেক দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি—বিদেশ বোলে কোন কষ্ট কখনও অনুভব করি নাই। কিন্তু এবার সন্ন্যাসীগিরি ঘুরিয়ে দিয়েছে। কেবল আলু-সেদ্দো আর কপি-সেদ্দো খেয়ে খেয়ে বিম্নি হয়ে গেছে। মনে হয়, দেশে ছুটে যাই আর একটা ঝালঝাল তরকারি ও তেঁতুল-চেরার টক খেয়ে জিভটাকে শানিয়ে নি। একটু সুরা আর মাংস গ্রহণ করিতে এখানকার বন্ধুরা আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু আমি রাজি নহি। আর যা করি না করি—আমিষ, মদিরা ও ইংরেজি পোশাক একান্ত পরিবর্জনীয়। আমার স্বর্গীয়া পিতামহী বলিতেন—ছেলেগুলো নেকৃচর দিয়ে দিয়ে উচ্ছন্ন গেল। আমি ত উক্তপারে এসে তিন তিনটে বক্তৃতা দিয়েছি। উচ্ছন্ন ত গেছি আর এই বক্তৃতার চোটে বঙ্গবাসীতে চিঠি লেখাও হয় নাই—পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।

এখানে প্রথম দিন রাস্তায় বেরিয়ে মহা বিপদ। ছেলেরা দেখ দেখ (look look)—বোলে আমার পানে ছুটে আসে—পুরুষেরা মুচকে হাসে—আর মেমসাহেবেরা একটু শিউরে উঠে বা অল্প দন্তরুচি-কৌমুদী বিস্তার করে। কেননা আমার রঙ ময়লা অর্থাৎ আমি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। লোকের ভিড় ঠেলে যাওয়া যায় কিন্তু নজরের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠিতে হয়। তবে রক্ষা যে, বেশী বাড়াবাড়ি করে না—সামলে আঁতকে উঠে বা হাস্যরস ছড়ায়। কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে, আমি একটা তাদের কাছে রকমারি জিনিষ। আমার পোশাক

এখন মন্দ নয়, কারণ শীতের জ্বালায় একটা পা পর্যন্ত লম্বা গরম কোট দিয়ে গেরুয়ার ঝক্‌মকানি ঢাকতে হয়েছে। যখন কোন সভায় যাই তখন কোটটা খুলে রাখি। আমি মনে করেছিনু কেবল আমারই এই দুর্দশা। তা নয়। আমার সব দেশী ভায়াকে নজর শিহরুণি আর মৃদুমন্দ হাসি সহিতে হয়। তবে ইংরেজের পুষ্যিপুত্তুর সেজে হ্যাটকোট পরিলে—কতকটা গোঁজামিল দিলে বেঁচে যাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে নিস্তার নাই। যদি রংটা খুব মটরডালবাটার মতন হয় আর খুব পুষ্যিপুত্তুরি করা হয়—তা হোলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পোশাক যদি অন্যরকম কর—তা রেশমের জুব্বাই পর আর তাজই মাথায় দাও—একেবারে হৈ হৈ পোড়ে যাবে। অনেকে বোধহয় জানেন না যে, যেমন চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার-দিগকে খোঁচাখুঁচি থেকে বাঁচাবার জন্যে কাঠগড়ার ভিতরে রাখে তেমনি কোরে—অভিষেক উপলক্ষে সমাগত আমাদের দেশীয় সৈন্য-দিগকে এখানে রাখতে হোয়েছিল। তবে বড়মানুষি কোরে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে সাত খুন মাপ। ইংরেজ ঐশ্বর্যের কাছে পদানত। কিন্তু একবার আলাপ হোয়ে গেলে এখানকার লোকেরা অতি ভদ্রভাব ধারণ করে—হাসি-টিট্‌কিরি সব ছেড়ে দেয়। কিন্তু যদি আবার একটু মনান্তর হয় ত অমনি blackie nigger, অর্থাৎ কালো সম্ভাষণটা অনেক সময় ইংরেজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে সব ভারতীয় ভায়ারা এই কালো রঙের উপর কটাক্ষের জ্বালায় ত্রস্ত। রাস্তায় একজন ভারতবাসীর সঙ্গে আর একজনের দেখা হোলে এক হাত দূর সাত হাত হয়—পাছে মিল হোলে গোঁজাটা বেরিয়ে পড়ে এবং হাসির পাত্র হোতে হয়। আমাদের দেশে কালোয়-ধলোয় মিল উচ্চ-অঙ্গের মিল—যথা রাধা-কৃষ্ণ—গঙ্গা-যমুনা। কিন্তু সভ্যতার নতুন বাজারে কালোয়-ধলোয় মিশ খাবে না, খাবে না। ভ্রাতৃভাবগ্রস্ত দুচার জন কালো কালো সংস্কারককে একবারে বিলেতের রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই তাঁরা ভাবের বুলি ছেড়ে দেবেন। আর বেশী কিছু করতে

হবে না তাঁদের মুখ বন্ধ করাতে। যতদিন সভ্যতার বড়াই ততদিন মিল অসম্ভব।

এখানে একজন দেশী ভাই আছেন—তাঁর স্বদেশের নামে বমি আসে, আর বিলেত এই কথা শুনলেই লাল পড়ে। এর কারণ আছে। সভ্যতার একটা দিক আছে যেটা বড়ই মধুর। এত ছটা ঘটা মাধুরী যে মন একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যায়। একে ত প্রকৃতি অমনিতেই পুরুষকে পেড়ে ফেলেছে, তার উপর আবার রঙ চড়ালে বাঁচা দায়। কলিকাতার জলের কল দেখে একজন বলেছিল—"কি কল বেনিয়েছে কোম্পানি সাহেব।" বিলেত দেখিলে সেইরকম একটা কিছু বলিতে ইচ্ছা যায়। একবার দোকান সাজান দেখিলে মনে হয় যেন রূপের বাজারে এসেছি। মাছের দোকানে মাছ সাজিয়ে রেখেছে—যেন ফুলের কাতার। খুব নিশ্বাস না টানিলে গন্ধ পাওয়া যায় না। অত কথায় কাজ কি—বড় বড় অখাদ্য মাংস এমনি সাজিয়েছে যে, হিন্দুর ছেলে হোয়েও দুচার বার নজর না দিয়ে থাকা বড় মুশকিল। কি মাছ-মাংসের দোকান—কি শাক্-সব্‌জির দোকান—কি বসন-ভূষণের দোকান—যা দেখ—যেন চারিদিকে ফুলের মালা গেঁথে রেখেছে। আর শৃঙ্খলার একেবারে চূড়ান্ত। কাতারে কাতার লোক চলছে, একটুও কোলাহল নাই। হাজারে হাজার ঘোড়া গাড়ি দৌড়িতেছে কিন্তু ঠিক যেন কলের পুতুল। একবার যদি পাহারাওয়ালা হাত তোলে ত অমনি সব গাড়ি খাড়া। লণ্ডনের রাস্তায় এত লোক যে মনে হয় বুঝি মেলা বসেছে। তার উপর ট্রাম অমনিবস ভদ্র লোকের গাড়ি ভাড়াটে গাড়ি বাইসিকল মটরকার বেগে ধাবমান। এত ভিড় কিন্তু ঠেলাঠেলি নাই—চেঁচাচেঁচি নাই—শৃঙ্খলার বিশেষ পরিণতি না হোলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার অত সুনিয়মে চলে না। আর রাস্তা-ঘাট ঘর দুয়ার সব এত পরিপাটি যেন ঝকমক করিতেছে। বাড়িগুলি যেন এক-একখানি ছবি। আমাদের কলিকাতার চৌরঙ্গী বা ইংরেজটোলা লণ্ডনের ভাল জায়গার একটি মেকি—কাপি বা

অনুকরণ। আর আয়েসের কথা কি বলিব। খাওয়া-দাওয়া নাওয়া-শোয়া বসা-দাঁড়ান সব কাজে এত আরাম কোরে তুলেছে যে ইন্দ্রলোকে এর চেয়ে আর কি হোতে পারে তা ত ভেবে পাওয়া যায় না। আমি এখানে দুটি আরাম সম্ভোগ করেছি। স্নান আর ক্ষৌরি। ক্ষৌরির কথাটাই বলি। একটি পাথরের টেবিল—তার উপরে একখানি প্রকাণ্ড আয়না। সম্মুখ একখানি কেদারা। কেদারার পিছনটি স্প্রিং-এ উঠান-নামান যায়। তাহাতে অর্ধেক চিৎপাত হোয়ে ঠেসান দিয়ে বসিতে হয়। তার পরে সাহেব নাপিত "Good-morning" গুডমর্নিং কোরে ঈষদুষ্ণ গরম জলে গোলা সুগন্ধ সাবান বুরুস দিয়ে—দাড়ি ও গোঁফ ঘষে ও মিষ্টি কথা বলে। পাঁচ-সাত মিনিট ফুলের মতন বুরুস বুলিয়ে ক্ষুর ধরে। ক্ষুর এমনি দাড়ির উপর চালায়—যেন তুলি। তার পরে আবার সাবান ঘষা। আবার উজান কামানো। কামিয়ে একটা নরম স্পন্‌জ গরম ও ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে—ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল পাথরের টেবিলে লাগান আছে—মুখে বুলায় ও সাবান পুছিয়ে দেয়। তার পর এসেন্সের পিচকারি—আবার তার উপর পাউডার। এত কারখানা—আর তুমি মজা কোরে বোসে বোসে আয়নাতে দেখ সাহেব পরামাণিক কেমন তোমার কেয়ারি-করিতেছে। কি যে আয়েস তা বুঝিয়ে উঠা দায়—তবে পিচকারি ও পাউডারের সুখটা আমি ভোগ করি নাই—কেন না ওটা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। এত বিলাস সুখ এখানে আছে কিন্তু নিষেধের জ্বালায় সে সব অঙ্গীকার করিতে পারি না। বঙ্গবাসীর আর কেহ পত্রলেখক হোলে ভাল হোতো। কত নাচ-তামাসা আহার-পানের মজা। কিন্তু আমার কপালে তা নাই।

উদ্দাম-প্রবৃত্তি যুবকদের প্রথম দৃষ্টিতে মনে হোতে পারে যে তারতে না জন্মানই ভাল ছিল। তাই দেখা যায় যে, যত যুবক এখানে আসে—অধিকাংশই সাহেব হোয়ে সাহেবি বিলাসিতায় ডুবে মরে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে মোহ ঘুচে যায়। এখানকার গৃহস্থদের জীবনে

শান্তি নাই। এত বেশী জিনিস-পত্তর দরকার যে তারা কুলিয়ে উঠিতে পারে না। আর দিনকের দিন খুটিনাটি বাড়ছে। আমি অতি সামান্য রকমে একটি গৃহস্থের বাটীতে থাকি। তবু আমার বাসাভাড়া ও খাবার জন্যে মাসিক ৬৩৲ দিতে হয়। আমার একটি বসিবার ঘর ও একটি শোবার ঘর। ঘর দুটি ছোট ছোট কিন্তু এমনি সাজান যে কলিকাতার বড় মানুষের বৈঠকখানা হোতে কোনো অংশে কম নয়। টেবিল কেদারা কোচ দেরাজ ও ভাল ভাল ছবিতে বসিবার ঘরটি সুশোভিত। নীচে কারপেট—জানালায় সাপের খোলসের মতন পরদা। শোবার ঘরে স্প্রিং-এর খাট—শুইলেই এক হাত নেবে যায়—তার আবার গদির উপর গদি। একদিন একটা পরদা কি রকম লাগান হয় নাই—তাই গৃহিণী আমার নিকট ক্ষমা চাহিতে এসেছিল। আমি মনে করিলাম ভাল রে ভাল—তোমার পরদা কোচ সরিয়ে নিয়ে যাও—আর কিছু ভাড়া কমিয়ে দাও। কিন্তু এখানে এর চেয়ে সস্তা বাসা পাওয়া যায় না। আর যাদের স্ত্রী-পুত্র আছে—তাদের যে কত কি আবশ্যক, তার অবধি নাই। তাই এখানে ভদ্রলোকেরা ব্যস্ততার চক্রে পিষ্ট। জীবন ধীরে সুস্থে চালালে চলে না। যেন কেবলই ভিড় ঠেলে চলিতে হয়। আমাদের দেশেও ওইরূপ দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। তবে সেখানে একমুষ্টি অন্নের জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় আর এখানে সাপের খোলসের মতন চিকণসই পরদা ও দারা-সুতের নিমন্ত্রণ খাইবার পোশাকের জন্য ছুটোছুটি করিতে হয়। আমাদের যেমন এক-মুষ্টি অন্ন তেমনি এদের পরদা ও বিলাস বেশ—নহিলে মানসম্ভ্রম একেবারে থাকে না।

আর একটি বড় ভয়ের কথা। এখানকার কর্মজীবী লোকেরা বড়মানুষদের উপর বড় চটা। সেদিন একটি মকর্দমায় একজন বড় ঘরের মেয়ের ৭৫০৲ টাকা জরিমানা হোয়ে গেছে। এঁর একটি পাগলাটে কন্যা আছে। ইনি তার প্রতি বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। তাই বালক-বালিকার প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা এঁর নামে নালিশ

করেছিল। এ আবার বিলাতের এক উদ্ভুট্টে ব্যাপার। মা-বাপ যদি একটু কড়া হয় ত অমনি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভার হাতে পড়িতে হয়। যা হউক—জজ এই নিষ্ঠুর মাতাকে কেন জেলে দিলে না—কেবল জরিমানা করলেন—এই নিয়ে একেবারেই হুলুস্থুল পড়ে গেল। কর্মজীবীরা সংবাদ-পত্রে ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে, কেবল বড়মানুষের ঘর বোলে এই অল্প সাজা দেওয়া হয়েছে—আমাদের ঘর হোলে নিশ্চয়ই জেল হোতো। জজকে একেবারে উত্তম ফুস্তম কোরে তুলেছিল। ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে বড়মানুষে আর গরিবে একটা ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব দাঁড়াইতেছে। এখানে একটি কর্মজীবীদের বিদ্যালয় আছে। দেশ-বিদেশ হোতে ছুতোর রাজমিস্ত্রী কামার দরজি—এইরূপ লোকেরা এসে পড়াশুনা করে। তারা একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছে। কিন্তু তাদের বড়মানুষদের উপর যে রাগ দেখলাম তাতে বড় ভয়। এরা ভাল লোক কিন্তু দায়ে পোড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে, এরা সামলে উঠতে পারে না। তাই এরা বর্তমান সমাজের দ্রোহী হোয়ে উঠিতেছে আর যাদের তেলা মাথায় তেল—এরা তাদের দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। আমি ইহাদিগকে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের কথা অল্পস্বল্প বলিলাম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িয়া কৌলিক কর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা শুনিয়া ইহারা বিস্মিত হইল কিন্তু ইহা যে শান্তিপ্রদ তাহা বার বার স্বীকার করিল। ইহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। এই সমাজদ্রোহিতা—সভ্যতার একটি অঙ্গ। ইহাই ধর্মঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্মীতে শত্রুতা বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সে-ই খুব মেরে দেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকিলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্য-ভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই ত গেল ভয়ের কথা। সভ্যতার একটি শোচনীয় ব্যাপার আছে। সেটি ভয়ানক দারিদ্র্য। শহরে ভারি শোভা—পূর্ণমাত্রায় আয়েস ঐশ্বর্য—কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের অলিতে গলিতে বড়ই দারিদ্র্য। দেখিলে প্রাণ ফেটে যায়। ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘর তাতে স্বামী-স্ত্রী-ছেলেমেয়ের গাদাগাদি। ঘোর শীত অগ্নি নাই—এখানে ঘরে আগুন নহিলে তিষ্টিবার জো নাই—বস্ত্র নাই আহার নাই। সকলে কাজ করিবার জন্য লালায়িত কিন্তু শহরে কাজকর্ম পায় না। এমন একজন আধজন নয়—শত শত সহস্র সহস্র এই অমরাবতীর ঐশ্বর্যের মধ্যে কত লোক শীতে ও অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। কী দুঃখের কথা—কী লজ্জার কথা—আবার এমনই চমৎকার আইন যে ভিক্ষা করিবার হুকুম নাই। রাস্তায় দেখিতে পাইবে যে দীনহীন রমণীরা ছেলে-কোলে শীতে হি-হি কোরে কাঁপছে আর দুই-একটা শুকনো ফুলের তোড়া বা ভাঙ্গা দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রি করবার ছল কোরে ভিক্ষা চাহিতেছে। বড় বড় ঘাঘরা—টুপি কিন্তু তাহাদের পানে কেহ ফিরেও চায় না। সেদিন একজন রমণী আমার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলের তোড়া বিক্রি করতে এলো। আমি ভারি গরীব তবুও তাকে এক শিলিং—বারো আনা দিলাম। কিন্তু অমনি একজন ইংরেজ নারী বোলে উঠল—ছি—কালোমানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নিলি। যাহা হউক, এত ধনের মধ্যে অনাহারে মরে যায়—ইহাই বড় প্রাণে লাগে। সেদিন দুইটি স্ত্রীলোকের কথা শুনে অশ্রুবারি সংবরণ করিতে পারি নাই। তারা দুটি বোন। একজন অনাহারে মরে পড়ে আছে আর একজন ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষেপে গেছে। পুলিশ এসে মরা ও ক্ষেপা দুজনকে বের করে নিয়ে গেল। এমন সভ্যতার মুখে ছাই। আমি ত দেখে শুনে ধিক্কারে মরি। আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রংচং-এ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি আমাদেরই ইষ্টদেবতা—ঠেলাঠেলি মারামারিতে আমাদের কাজ নাই। জিগীষার কাড়াকাড়ি

হোতে ভগবান্ রক্ষা কর। হিন্দুসন্তান সভ্যতায় প্রবৃত্তিপরায়ণতা হোতে বাঁচুক ও নিষ্কাম হইয়া কুল-ধর্ম পালনে রত হউক।

বিলেতে এসে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না। সংখ্যা দর্শনে বলে যে প্রকৃতি যখন অবগুণ্ঠন খুলে আপনার স্বরূপ জানায় তখন পুরুষের মুক্তি হয়। এখানে প্রকৃতি অবগুণ্ঠিতা নহে। মাঠে ঘাটে হাটে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখে। এখানকার পুরুষেরা তবে সাংখ্যমতে মুক্ত। সাংখ্যমতে হউক আর না হউক আমাদের বিলাত-প্রবাসী দেশী ভায়াদের মতে সাহেবেরা মুক্ত পুরুষ। কেননা প্রকৃতিকে তারা অবাধে দেখে। এইরূপ মুক্তি দেশে আমদানী করিবার জন্য এরা ব্যস্ত। বাস্তবিক এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একটা অদ্ভুত কাণ্ড। আমাদের দেশে যে নাই তাহা নয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যায়—বাজার করে, ঘুরে ফিরে বেড়ায়। কিন্তু এখানে রকমই আলাদা। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা চলেছে—কেহ দৌড়িতেছে—কেহ হাসিতেছে—ভ্রূক্ষেপই নাই। আবার কত স্বামী-স্ত্রী হাতধরাধরি কোরে চলেছে। যুগল মূর্তি দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু যুগল মূর্তির বিশেষ খেলা প্রণয়-সূত্রে চলে—পরিণয়-সূত্রে নহে। প্রায়ই দেখা যায়—কুমার-কুমারীরা বাহুবন্ধনে মিলিত হোয়ে বিহার করিতেছে—কিংবা আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে বা বোসে রয়েছে। আমি একটু নির্জন জায়গা পছন্দ করি। তাই অপরাহ্নে প্রায় ঝোপঝাড় ঘেঁষে বেড়াইতে যাই। বাগানে এ সব ঝোপ তৈয়ারী করা। কিন্তু ক্রমশঃ দেখি যে সবগুলিই প্রেমালাপে পরিপূর্ণ। তাই আমাকে এখন সামলে চলতে হয়। কিন্তু এখানকার লোকেরা প্রণয়ের সুতো পাকানকে একটা অবশ্যকর্তব্য মনে করে। যাহাদের বিবাহ স্থির হোয়ে গেছে তারা অত ঘোরাঘুরি করে না। কিন্তু বিবাহ স্থির কি অস্থির—সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই পুরুষপ্রকৃতি কুঞ্জপুঞ্জের বিরলতা খোঁজে। ইহা ভাল কি মন্দ—তার বিচার আবশ্যক নাই। তবে আমাদের দেশে এই প্রণয়ের

করপীড়ন বা উৎপীড়ন যাতে না রপ্তানী হয়—সেই দিকে দৃষ্টি থাকিলেই ভাল।

আগামী বারে উক্ষপারের বিবরণ লিখিব মনে করিতেছি। ইহা একটি অতি পুরাতন বিদ্যালয়ের স্থান। বাইশটা না তেইশটা কালেজ আছে। এক একটা কালেজ পাঁচ-সাত শত বৎসরের। স্থানটি অতি রমণীয়।

উক্ষপার

তারিখ ২রা জানুয়ারি, ১৯০৩

দুই

অক্সফর্ড নগরকে সংস্কৃত ভাষায়—উক্ষপার—শব্দে অভিহিত করিলে মন্দ হয় না। ইংরেজিতে অক্স্ অর্থে উক্ষ—আর ফোর্ড অর্থে পার। তা হোলে অর্থ ত বজায় থাকেই আর শাব্দিক মিলও কতকটা হয়। নগরটি তিন দিকে দুইটি নদীর দ্বারা বেষ্টিত। নদী দুটি আট-দশ হাত চওড়া হবে। স্রোত অতি মৃদু এবং জল সুনির্মল। নগরের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। কতকগুলি গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশই ছাত্রদের ক্রিকেট বা ফুটবল বা গল্ফ খেলিবার নিমিত্ত অতি যত্নে ও ব্যয়ে সুরক্ষিত। মাঠের অপর পারে আবার শ্যামলবৃক্ষাচ্ছাদিত ছোট ছোট পাহাড়। নদী, মাঠ ও পাহাড়—তিন মিলে স্থানটিকে অতি রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। পুরাকাল হোতে এই জায়গায় বিলাতী সন্ন্যাসীদের (মঙ্ক) বড় বড় মঠ ছিল। সেই মঠের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের জন্য আয়তন (কালেজ) নির্মিত হইয়াছিল। কালেজ কথাটির ধাতুগত যে অর্থ—আয়তনেরও সেই অর্থ। সংস্কৃতে কালেজকে আয়তন বলে—সেটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ধনবান ভক্তেরা ছাত্রদিগের আবাস নির্মাণ

গির্জা। সাতটার সময় শেষ আহার (ডিনার)। এই রাত্রি-ভোজনের পর ছেলেরা প্রায়ই সব বেড়াতে বেরোয় বা থিয়েটারে যায়। রাত বারটার মধ্যে কিন্তু সকলকেই ফিরে আসতে হয়। এখানে খেলা আমোদটা খুব অধিক। পড়াশুনার চাপ বড় বেশি নয়। দুই মাস করিয়া পড়া হয় আর পাঁচ হপ্তা ছুটি। আর গ্রীষ্মকালে একটা মস্ত লম্বা চারি মাসের অবসর। প্রত্যেক কালেজে একজন কোরে অধ্যাপক (Tutor) আছেন—যিনি ছেলেদের অধ্যয়ন-বিষয়ে সাহায্য করেন ও কোন্ কালেজে গিয়ে কোন্ বিষয়ের বক্তৃতা শুনিলে ভাল হয়—তাও ঠিক করিয়া দেন। একটা কালেজে হয় ত ইতিহাস ভাল হয় আর একটা কালেজে হয়ত দর্শন বা ন্যায় ভাল। ছেলেরা এ-কালেজ থেকে ও-কালেজে ছুটোছুটি করে আর ভিন্ন ভিন্ন কালেজের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনে। তেইশটা কালেজ বটে—তবে সর্বসুদ্ধ বোধ হয় দু হাজার ছেলে হবে।

এখানে 'বডলিয়ান লাইব্রেরি' নামে একটি পুস্তকাগার আছে। তাহাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ পুস্তক। বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যান্ত খোলা থাকে। প্রত্যেক পাঠককে টেবিল চেয়ার দোয়াত কলম ও কাগজ দেওয়া হয়। একখানি কাগজে পুস্তকের নাম ও নম্বর (তালিকায় সব ঠিক করা আছে) লিখিয়া দিলেই অমনি একজন কর্মচারী পুস্তকখানি দিয়া যায়। এখানে বড় বড় লোকেরা আসিয়া লেখাপড়া করে। অনেকে আসে যায় কিন্তু টুঁ শব্দটি নাই। ইহা সরস্বতী দেবীর একটি পীঠস্থান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পড়িবার জন্য একটি কপর্দকও দিতে হয় না। কেবল একজন মেম্বরের দ্বারা উপনীত হইলেই হইল। বাস্তবিক একবার এখানে গেলে আর সহজে ফিরে আসিতে ইচ্ছা করে না।

যারা শ্রমজীবী বা মসীজীবী নয়—তারা সকলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বেড়াতে যায়। আমিও তার মধ্যে একজন। এখানের একটি সুবৃহৎ উদ্যান আছে। হন্ হন্ কোরে চলিলে পনেরো মিনিটে ঘুরে

আসা যায়। ইহা একেবারে নদীর ধারে। মাঝখানে মস্ত মস্ত খেলার মাঠ আর চারিধারে বৃক্ষলতা। এই উদ্যান হইতে একটি সুদীর্ঘ পথ বাহির হইয়াছে। এই পথটির দুইধারে নদী। ছেলেদের নৌকা বাওয়ার সুবিধার জন্য ক্রোশখানেক ধোরে নদীটিকে আটকের দ্বারা কাঁপিয়ে সদাই জলপূর্ণ কোরে রাখা হয়। তাতে যে জল উপচে উঠে তাহা পরে একটি খালের দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই খালটি আটকের কাছে গিয়ে আবার নদীতে মিলেছে। নদী ও খালটির মাঝখানে এই পথটি তৈয়ারী। ইহার দুই পার্শ্বে সারি সারি এলম্ গাছ। শীতে এখন গাছগুলিতে একটিও পাতা নাই। এই পথটি অতি নিভৃত শান্ত। আমি এই রাস্তায় প্রায় বেড়াইতে যাই। এ রাস্তা ছাড়িয়ে একটা ছোট পাহাড়ে উঠি। আবার পাহাড় থেকে নেমে নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামে যাই। যাওয়া-আসাতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। পল্লীগ্রামে চারিদিকে ক্ষেত ও বাগান। এমন আধ হাত জায়গা দেখিতে পাওয়া যায় না, যার উপর মানুষের কারিকুরি নাই। গোচারণের মাঠগুলির ঘাসও বেশ কেয়ারী করা। চারিদিক একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতিকে ছেঁটেছুঁটে দোরস্ত কোরে যেন সাজানো হোয়েছে। প্রথমটা দেখিলে বড় ভাল লাগে। তার পরে কিন্তু মনে হয়—খোদার উপর কিছু বেশি মাত্রায় খোদকারী করা হোয়েছে। স্বভাবের স্বাভাবিক শোভাটা লোপ পেয়েছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কত-না বন-জঙ্গল। কিন্তু তাতে একটা পরমানন্দের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়—যেন সৌন্দর্যের মেলা লেগেছে—শ্রীনিবাস যজ্ঞি কেঁদে বোসেছেন—ফেলাফেলি ছড়াছড়ি। আর এখানে যেন হিসাব কোরে গুণে-গেঁথে ফুল-ফল-শস্য-গাছপালা আমদানী করা হোয়েছে।

লোকে বিলাতের শীতের বিষয়ে আমায় বড় ভয় দেখিয়েছিল। আর এখানে আমার সাহেব বন্ধুরা প্রায়ই আমায় দয়াপ্রকাশ কোরে বলেন—শীত সহিতে পারিতেছ ত। আমার কিন্তু মনে হয়—পঞ্জাবে

এখানকার চেয়ে শীত অধিক। এখানে আমি যদি একটু বেড়িয়ে আসি ত অমনি দরদর কোরে ঘাম পড়ে। ঘরে সদাই আগুন জ্বালাতে হয় কিন্তু আমার ত তত আবশ্যক বোধ হয় না। আমি সাতটার সময় উঠি আর একচক্র ঘুরে আসি। তখন অন্ধকার, ঠিক যেন আমাদের দেশে পাঁচটা বেজেছে। আর আমার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা তথৈবচ। তার উপর আবার মাংস মদিরা খাই না। লোকে বলে তোমার ধাতে গরমি বেশী। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি আমার মেজাজ একেবারেই গরম নয়। এখানকার শীত আমার বেশ লাগে। আমার শরীর বড় ভাল আছে। বোধ হয় যেন দশ বৎসর পরমায়ু বেড়ে গেছে। তবে পয়সার অভাবে ভাল কোরে দুধ ও ফল খেতে পাই না। তা না হোলে বোধ হয় বিশ বৎসর বেড়ে যেতো। যাক্—বড়াই করিব না। নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ—অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়। কেবল মনে মনে বড় রাগ হয় যে, এখানে দিনের পর দিন চলে যায়—তবু সূর্য উঠে না। আকাশ সদাই মেঘে ঢাকা। যদি একদিন সূর্য উঠিল ত লোকের মুখে আর হাসি ধরে না। সূর্যের তাপটা কিন্তু কি রকম। বেলা একটার সময় যেন কলিকাতার আটটা বেজেছে। তাই তাদের হাসি দেখে আমার হাসি পায়।

আমার চেহারা ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠেছে। আমি চুনোগলি ছাড়িয়া চৌরঙ্গীর ঘেঁষাঘেঁষি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিতে পারি। তবু আমায় দেখে রাস্তায় শিহরণি-আতকানি-হাসি ঘোচেনি। এখানে একজন ভারতবাসী আছেন। ইনি ঝন্‌ঝনে সংস্কারক। ইংরেজদের উপর খুব টান। এঁর রঙটা একেবারে নবজলধর শ্যাম। কিন্তু আমার কাছে এর বায়নাথ্যা ভার্জেন নাই। সেদিন আমি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনিও আমায় খুলে বললেন যে মাঝে মাঝে ছেলেদের দল একে তাড়া করে। আমার কপাল ভাল যে, অতটা দুর্দশা এখনও হয় নাই। ইংরেজের উপর বেশি টান বোলেই

বুঝি এঁর সঙ্গে এত টানাটানি। ইনি ইংরেজের মতন পোশাক করেন। তবে যেদিন নাইট ক্যাপ (Night-Cap) ছেড়ে কালো রঙের উপর লাল পাগ্‌ড়ি চড়ান সেদিন একেবারে—ত্রাহি মধুসূদন।

এই বিদ্যার পীঠস্থানে কতকগুলি মহাবিদ্যা আছেন—যাঁরা কেবল নূতন খুঁজে বেড়ান। এঁরা ভারতবাসীদের সঙ্গে ভাব করিতে বড় অভিলাষিণী। কেহ প্রবীণা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ মধ্যম-বয়স্কা, কেহ-বা যুবতী। এঁদের চালচলনে শীলের কোন অভাব নাই। কিন্তু দেশের সমাজ বা সমাজ বন্ধন—এঁদের ভাল লাগে না ছট্‌কে বেরুতে পারিলে এঁরা বাঁচেন। আমায় দুই-একবার নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন। কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় সব হোলো কিন্তু আমি বড় ঘেঁষ দিই না। সব সওয়া যায়, কিন্তু যারা নিজের দেশের উপর চটা—যে দেশেরই তারা হোক না কেন—তাহাদিগকে সওয়া যায় না। এরকম পুরুষও অনেক আছে। উচ্চপারে যাঁরা বিদ্বান্ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন—তাঁরা ভারতের উপর বিশেষ ভক্তিমান্ নহেন। তবে গুর্‌খা ও শিখ ভারি যোদ্ধা আর রাজা-রাজড়ারা রাজভক্ত—এইটুকু স্বীকার করেন।

মাইণ্ড (অর্থাৎ মনঃ) নামক একটি দার্শনিক পত্র আছে। যত বড় বড় ইংরেজ দার্শনিক—তাঁরা সকলেই ইহাতে লিখেন। হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান—নামক আমার বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে লিখে মাইণ্ডের সম্পাদকের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে প্রবন্ধটি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না—কেননা তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য এক বৎসরের কপি জমে পোড়ে আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বেদান্তের কথা শুনে হেসে বলিলেন—খুব একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু এখানকার কালে ওসব চক্ষুবুজুনি দর্শন আর চলিবে না।—কথা চলিতে লাগিল। কিছু আকৃষ্ট হোলেন। আমায় আর একদিন কথাবার্তার জন্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার প্রবন্ধটা রেখে এলাম। তার পরে যেদিন গেলাম সেদিন তিনি বলিলেন—প্রবন্ধতে নূতন কথা আছে—যে রকম ব্যাখ্যা করা হোয়েছে

তাতে বোধ হয়—বেদান্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত—আমি এ প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।—আমার প্রবন্ধে জীব ও জগৎ যে মিথ্যা ও মায়ার রাজ্যে যে কোন স্বাধীনতা নাই—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যে মায়িক অলীকতার প্রতিবাদ আছে তাহারও খণ্ডন করা হইয়াছে। যাহা হউক আনন্দের বিষয় যে, আমার প্রবন্ধ মাইণ্ডের মতন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় বাহির হইবে। আরও আরও অনেক বিদ্বান্ এখানে আছেন যাঁরা দেশের মাথা—কিন্তু ভারতের দর্শন-জ্ঞান তাঁদের কাছে কোন পুরানো কালের বৃহৎ জন্তুর (ম্যামথের) মত—মিউজিয়মে রেখে দিবার জিনিস। মোক্ষমূলর অনেক দিন উক্তপারে পরিশ্রম করিয়াছেন বটে কিন্তু তার ফল দাঁড়িয়েছে যে বেদ অল্প-অল্প-সভ্য কৃষকদের গান—উপনিষদ সকল প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষামাত্র—বর্ণাশ্রমধর্ম ব্রাহ্মণদের অত্যাচার—যা কিছু ভারতবর্ষের সার তা বৌদ্ধধর্ম আর জগৎ অলীক—এটা খুব সাহসের কথা বটে তবে প্রলাপ। বেদান্তের মহাবাক্য—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও যেমন রজ্জু ভ্রমবশত সর্পরূপে প্রতিভাত হয় তেমনিই ব্রহ্মই অবিদ্যাপ্রভাবে দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত—এই সার কথা কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছেন কি না—সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। যে সন্ন্যাস-পারম্পর্য ধরিয়া এই অদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে তাহার সঙ্গ না করিলে বেদান্ত-বোধ সুদুর্লভ।

যাঁহারা সমাজদ্রোহী নহেন—প্রতিষ্ঠাবান সুধী—তাঁহারা যদি হিন্দু-দর্শন-চিন্তার সমাদর করেন তবে সুফল ফলিবে। কিন্তু এ সফলতা হুজুক্‌মের কাজ নয়। ইংরেজ সহজে ভেজে না। তুড়ি দিয়ে যে উড়িয়ে দেবে—তা হবে না। আর আমার মত সামান্য লোকের দ্বারা ত কিছু হবেই না।

আমার বিশ্বাস যে ভারত জ্ঞানবলে বিশ্বজয়ী হইবে। এই বিশ্ববিজয়ী ইংরেজকে অগ্রে জ্ঞানযোগে জয় করিয়া আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া চাই। ইতি—

৯ই জানুয়ারি, ১৯০৩

তিন

আমি গতবারে লিখিয়াছি যে, পঞ্জাবে এখানের চেয়ে শীতের প্রকোপ অধিক। তিন চারি দিন থেকে আর তাহা বলা চলে না। একেবারে হাড়ভাঙা শীত পড়েছে। গত সপ্তাহে দু তিনদিন বৃষ্টি হয়। সেই জন্য নদী উপচে উঠায় তটস্থ মাঠগুলি জলময় হোয়েছিল। শীতের চোটে মাঠের জল সব জমে বরফ হোয়ে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারধবল ভূমিখণ্ড সূর্য কিরণে রঞ্জিত হোয়ে, অপ্সরাদের নর্তন প্রাঙ্গণের ন্যায় দেখাইতেছে। যথার্থই এখানে নৃত্য হয়। চক্রবিশিষ্ট কাষ্ঠ বা লৌহ-পাদুকার সাহায্যে নরনারী এই বরফের উপর দিয়া রথের মত ঘর্ঘর শব্দে অতিবেগে ছুটিয়া বেড়ায় বা ঘুরপাক খায়। নদী দুটি প্রায় জমে এসেছে। আর দু-এক দিন এই রকম ঠাণ্ডা থাকিলেই চলে পারাপার হওয়া যাবে। কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়াছিলাম। বরফের বড় বড় থান নিয়ে নদীর মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিলাম। সব চুরমার হোয়ে গেল – কেননা মাঝখানেও জল পাথরের মত জমে গেছে। আমার খুব ফুর্তি। শীত বেশ মিঠাকড়া লাগল। আর আমি একেশ্বর রাজার মত বিহার করিতে করিতে আনন্দে ডুবে গেলাম। একেশ্বর—কেন না ঠাণ্ডায় লোকজন অতি অল্পই সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিল। ইংরেজেরা ভারি শীতকাতুরে। মদ খায় মাংস খায়—তবু হি হি হি করে; আর আগুনের কাছে বসিতে পারিলে বাঁচে। আমার শীতসহিষ্ণুতা দেখে এরা বিস্মিত হয়। গতকল্য দু-জন ইংরেজ থিওসফিস্টের সঙ্গে খুব আলাপ-পরিচয় হইল। আমায় শীতে কাবু করিতে পারে না দেখে একজন আভাস দিলে যে, আমার বোধ হয় যোগবল আছে। আমি যদি কথাটাতে সায় দিয়ে একটু গম্ভীর ভাবে যোগমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতাম তা হোলে খাতিরটা বোধ হয় একটু

জন্মিত। অমনিতেই যথেষ্ট হোয়েছিল তাই আর স্নান করিবার প্রয়োজন ছিল না।

গেল সোমবারে এখানকার একজন অধ্যাপক আমার গাড়ি কোরে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মাথায় মলিদার টুপি ও গায়ে পীতবর্ণের বনাত ছিল। রাস্তায় বড় বাহার হোয়েছিল—লোকে হাঁ করে দেখিতে লাগিল। গোটাকতক ছোঁড়া হো হো করে হেসেও উঠিল। আর আমি কর্ কর্ করে ইংরেজি কথা কহিতেছি দেখে মেম-সাহেবেরা একেবারে অবাক্। এইরূপ ধবলশ্যাম যুগলমূর্ত্তি অশ্বযানে অতি দ্রুতবেগে চলিলাম। দেড় ক্রোশ দূরে লিট্‌ল্‌-মোর নামক এক গ্রামে আমরা উপনীত হইলাম। এই গ্রাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরকালই প্রসিদ্ধ থাকিবে। এখানে স্বর্গীয় নিউম্যান বাস করিতেন। ইনি একজন ধর্ম্মবীর। ইংলণ্ডে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তার গতি—বিশ্বাস ও ভক্তির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন সেই গৃহে আমরা গেলাম। সেখানে এখন আর একজন অধ্যাপক বাস করেন। ভিতরে গিয়া দেখি যে, মল্লিখিত এক ইংরেজি প্রবন্ধ মেজে খোলা রহিয়াছে ও পাতায় পাতায় পেন্সিলের আলোচনা ঘন-সন্নিবিষ্ট। অধ্যাপক আসিয়া উহা সম্ভাষণ করিয়া আমার সহিত মায়াবাদ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমার তখন বেড়াবার শখ চেপেছে। আমি তাঁকে আর একদিন আসিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইলাম। প্রবন্ধে মায়ার বিষয়ই লেখা ছিল। মায়া কথাটা শুনিলে ইংরেজ চমকিত ও স্তম্ভিত হয়। আমরা দীন হীন জাতি—আমাদের বাঁচা-মরা শালগ্রামের শোয়া-বসার মতন দুই সমান। জগৎকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা মনে হয়। অনেক মারপেঁচ কোরে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না। কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হবে। আমাদিগকে পরাজয় কোরে তারা সম্রাট হয়েছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার

ফাঁকি আর কিছুই নয়—এই স্বীকার কোরে একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হোতে হবে ও জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করতে হবে। ইংলণ্ডে অল্পস্বল্প বেদান্তের কথা রটেছে কিন্তু যাঁরা রটান তাঁরা মায়ার বাঁধে এমনি আটকেছেন যে, মায়াবাদে আর পঁহুছিতে পারেন না। পুরুষেরা অবিদ্যাকে সদ্বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর অবিদ্যারা পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া মাথায় চড়িয়া বসিয়াছেন। কাজেই একটা কিম্ভূতকিমাকার গাউন-পরানো বেদান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। তবে রক্ষে যে বিলাতি-মার্কা মায়াবাদের বা মায়া-সাধের প্রাদুর্ভাব অতি কম।

যাহা হউক সেই গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা গ্রামান্তরে গেলাম। চাষাভুষা দেখে মনে ধারণা হয়, যে, ইংরেজরা আমাদের মতই মানুষ। সেই চাষ করে, মরাই বাঁধে, গুরু চরায়। তবে চারি কোটি না পাঁচ কোটি লোক ধরাখানাকে সরা কোরে তুলেছে কেমন কোরে। ঐক্য ও পুরুষকারের জোরে। সমস্ত ইংরেজজাতির মধ্যে একটা বাঁধন আছে—সেটা কিছুতেই ছেঁড়ে না। এত ভয়ানক দলাদলি ও রাগা-রাগি যে তার সিকিও আমাদের দেশে নাই। অনেকেই ত রাজমন্ত্রীদিগকে ও গভর্ণমেণ্টকে গাল দিয়া ভূত ভাগায়। কিন্তু বিধিপূর্বক আইন পাস হইলেই সব ঠাণ্ডা। অনেকেই প্রতিবাদ করে কিন্তু বিধি কিছুতেই লঙ্ঘন করে না। ইংরেজের নিজের জাতির উপর ভারি টান। বুয়র যুদ্ধে স্বদেশীয়ের রক্তপাত হোয়েছে শুনে গভর্ণমেণ্টের শত্রুরা সব মিত্র হোয়ে গেল; আর বুয়র পরাজয়ে এক প্রাণ হয়ে উঠে পড়ে লাগল। এই ত গেল একতা। ভাল কোরে পর্যবেক্ষণ কোরে দেখলে বুঝা যায় যে ইংরেজের—তা কৃষকই হউক বা বণিকই হউক বা অধ্যাপকই হউক—চোখে মুখে পুরুষকার মাখান। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করিতে সবাই বদ্ধপরিকর। এইরূপ প্রকৃতিজয়ে বেশ একটা নিষ্কাম ভাব আছে। যদি ইংরেজ মনে করে যে, অমুক তারিখে কোন তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশিখরে ধ্বজা গাড়িবে

—তাহা হইলে সেই দিনে তুষারোহ স্থানে কেশরী চিহ্নিত নিশান পত-পত করিয়া উড়িবেই উড়িবে। উত্তর কেন্দ্রের অপর পারে কি আছে দেখিব—প্রাণ যায় বা থাক। কত জাহাজ তুষারগর্ভে বিলীন হইল—কত লোক মরিল—তথাপি আবিষ্কার করিবার পণ ভঙ্গ হইবে না। কোন আর্থিক লাভ নাই—কেবল একটা জয়ের আনন্দ—ঈশ্বরত্বের আত্মতুষ্টি—এই জিগীষাকে জ্বালাইয়া রাখে। কিন্তু এই নিষ্কাম ভাব লোপ পাইয়া যাইতেছে। লালসার বহ্নিতে সমগ্র জাতিটা জ্বলিতেছে।

আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতি-জয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না ও বুঝিতে চান না।

হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্ব সম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধন। ঈশ্বর হইতে গেলে ঐশ্বর্যশালী হইতে হয়। যাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই, সে ঐশ্বর্যের অধিকারী নহে। কিন্তু যিনি স্বাধিকারের প্রাচুর্য ও বাহুল্যগুণে প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই প্রভু—তিনিই ঈশ্বর—ঐশ্বর্যের স্বামী। রাজা নিজভুজবলে মৃগয়া করিতে সমর্থ—তথাপি অস্ত্রধারী অনুচরেরা তাঁহাকে অনুসরণ করে। অনুচরের তাঁহার প্রয়োজন নাই। তাহারা কেবল বাহুল্যমাত্র। মৃগয়াপক্ষে তাহাদের থাকা না থাকা সমান কথা। রাজার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা ঐশ্বর্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে মাত্র। কিন্তু যে ভীরু বা কাপুরুষ শত বা সহস্র রক্ষী বিনা আত্মরক্ষা করিতে পারে না তাহারই অনুচরবর্গের যথার্থই প্রয়োজন আছে। অনুচরেরা তাহার যেমন দাস সেও তদ্রূপ তাহাদিগের দাস। সে প্রয়োজনের বশগামী। অনুচরবর্গ সত্ত্বেও ঈশ্বরত্ব তাহার নাই।

প্রকৃতিকে ব্যবহার-ক্ষেত্রে জয় করিয়া—তাহাকে সেবাদাসী করিয়া

কি ফল যদি তাহার সঙ্গ ব্যতিরেকে শান্তিভঙ্গ হয়। এরূপ জয়—জয় নহে কিন্তু পরাজয়—কেবল দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা।' আমি যদি বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া আমার দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারি কিন্তু তাহার ক্ষিপ্র সংবাদ বহন বিনা রাত্রিতে আমার নিদ্রা না হয় তাহা হইলে ধরিতে গিয়া কেবল ধরা পড়া হয় মাত্র। যদি কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া নররক্ত পাত করিয়া মরুভূমির গর্ত হইতে স্বর্ণ আহরণ করি—আর সেই স্বর্ণ লইয়া স্বার্থের সহিত স্বার্থের ঘোর সংঘর্ষ ঘটে—সেই কাঞ্চন লইয়া মারামারি পড়িয়া যায়—সেই হেমপ্রভা বিচ্যুত হইলে আমার শয্যাকণ্টকী পীড়া হয়, তাহা হইলে পুরুষকার আর গোলামিতে কি প্রভেদ।

হিন্দুর প্রকৃতি-জয় ওরূপ নহে। প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দুস্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর নিকট তিনিই নরশ্রেষ্ঠ যিনি ভূমা অনন্ত সর্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামরূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবা করে বটে কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ সকল ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য তাঁহার নিকট কেবল বাহুল্যমাত্র। উহার থাকা না-থাকা তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মস্থিতি সেখানে অনাত্ম বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্বই হিন্দুর আদর্শ।

আজ হিন্দু জাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পূর্ব সাধনার লক্ষণ এখনও বর্তমান। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে অতি অল্পই প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহার আচার-ব্যবহার

আদানপ্রদান কঠোর সংযম দ্বারা নিয়মিত। সংসারের ভোগৈশ্বর্যকে লাঞ্ছিত করিয়া যেন তাহার দৈনিক কার্যের সমাধান হয়। গৃহস্থ ছাড়িয়া নৃপতির প্রাসাদে যাও—দেখিবে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি—মনি-মুক্তা হীরা-জহরৎ শালদোশালা কিংখাবে প্রকোষ্ঠ সকল সমাকুল। সেই সকল ধনরত্নবসনভূষণ কিন্তু বাহুল্যরূপে বিরাজিত। রাজা উহাদের অধীন নহেন। সে সকল কখন ব্যবহার করেন কখন পরিহার করেন। ঐশ্বর্যের আধিক্যে প্রয়োজন কোথায় পলায়ন করিয়াছে। রাজার মহিমা-বর্ধনের জন্যই মণি-মাণিক্যাদির কেবল প্রয়োজন—অভাব পূরণের জন্য নহে। হিন্দুর হয় সম্ভোগসামগ্রীর অল্পতা—সাধাসিধে চালচলন—নয় ত ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি বাহুল্য আড়ম্বর। প্রয়োজনের সুদীর্ঘ পরম্পরার নিগড় হিন্দুকে বাঁধিয়া রাখে না।

কিন্তু য়ুরোপে ইহার বিপরীত ভাব। য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুঁটিনাটি সামগ্রীর আদি-অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন করপ্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায় পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুর-বিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রবৃত্তির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা-গণ্ডা সুদে-আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে না। প্রকৃতি যেমন ইংরেজের দাস, আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস।

ধান ভানিতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছি। ঘণ্টা দুই বেড়িয়ে আমরা শহরে ফিরে এলাম। গ্রামগুলি দেখে কেবল আমার মনে হোতে লাগিল যে এখানে একটা বাঙ্গালীর আড্ডা করিলে মন্দ হয় না। ছাত্রেরা গ্রাম থেকেই অনায়াসেই উরূপায়ে পড়িতে আসিতে পারে—কেননা বড় বড় ঘোড়ার গাড়ি সদাই যাতায়াত করিতেছে।

ব্যবসায়ীরাও থাকিতে পারেন। লণ্ডন ও এখান হইতে বারমিংহাম দেড় ঘণ্টার পথ। একটি ছোট গ্রামের মতন হোলে ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়ান যায়।

সেদিন একটি ছেলে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করিতেছিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে একর্ডিয়ন বাজাইতেছিল। বোধ হোলো বৈষ্ণবের ছেলে যেন গাহিতেছে। বড় মিষ্টি সুর। আহা—তার নাকে যদি একটি তিলক থাকিত তা হলে সোনায় সোহাগা হোতো। এখানে শুধু ভিক্ষা করিবার যো নাই। তবে গান গেয়ে বা বাস্ত বাজিয়ে ভিক্ষা করিতে পারা যায়। একজন অন্ধ একটি ছোট মেয়ের হাত ধোরে রাস্তা দিয়ে গাহিতে গাহিতে যায়। পাড়া একবারে মাতিয়ে তুলে। ইংরেজের সুরে কেমন একটা ধুপধাপের ভাব আছে কিন্তু এর গলাটি এমনি মোলায়েম যে একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যেতে হয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার পর তৃতীয় বক্তৃতাটি অতি বিলম্বে হইয়াছিল। সভাপতি ডাঃ কেয়ার্ডের সময় ছিল না বলিয়া তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আর বক্তৃতার সময় ছিল না। কালেজ সব বন্ধ হোয়ে গেল। পাঁচ হপ্তা পরে আবার খুলিবে। তখন বক্তৃতা আরম্ভ করা যাবে। বারমিংহামে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বক্তৃতা ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইবে।

উক্সপার,
১৬ই জানুয়ারি

চার

সত্যি কথা বলিতে কি—বিলিতি সভ্যতার আড়ম্বর আমার একেবারে ভাল লাগে না। প্রকৃতিকে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি আমার দুচক্ষের বিষ। হোতে পারে আমার স্বভাব একঘেঁয়ে হোয়ে গেছে, তাই বুঝি মধুও পান্‌সে পান্‌সে লাগে। প্রকৃতিকে একেবারেই ছুঁতে নেই, তবে

না ছুঁলে চলে না—তাই বিধিনিষেধের অধীন হোয়ে ওষুধ গেলার মত স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এখানে বিধিও নাই নিষেধও নাই—রাস্তা খোলা। আর এড়াবারও জো নেই। প্রকৃতি গায়ে এসে পড়ে। সম্ভোগবহুল সভ্যতার আবর্তে এসে পড়েছি। খুব ঘুরপাক নাকানি-চোবানি খাচ্ছি। ঘুরপাকে মজা যে নাই তা বলিতে পারি না। বঙ্গবাসীর পাঠকদিগকে সেই মজাটুকু পাঠিয়ে দিতেছি।

গেল হপ্তায় লণ্ডনে গিয়েছিলাম। ইস্টিশান থেকে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যাচ্ছি, আর হঠাৎ পুলিশ এসে মাঝরাস্তায় থামিয়ে দিলে। দেখি লোকে লোকারণ্য, ব্যাপার কি—না, রাজা সেই রাস্তা দিয়ে যাবেন। আমার পাশে একজন ইংরেজ আরোহীকে বলিলাম যে আমার কপাল ভাল—আজ রাজদর্শন হবে—আমরা বিশ্বাস করি যে রাজদর্শনে পুণ্য হয়। সে বলিল, তোমাদের অদ্ভুত ভক্তি। এই রকম বলাবলি কচ্ছি আর ক্রুহামগাড়ি কোরে রাজাধিরাজ ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড পাপ-চোখের সামনে এসে উপস্থিত। গাড়ি দ্রুতবেগে চলেছে—কেবল চকিতের দেখা। কিন্তু তাতেই প্রাণমন পুলকিত হোয়ে গেল। মনে হোলো যেন শক্তিরূপিণী মহামায়া বিজলী হাসি হেসে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। মহাশক্তি হিমগিরির সিংহ ত্যাগ কোরে যেন ব্রিটিশ-সিংহকে বাহনরূপে বরণ করেছেন। মহেশ্বরীর মায়ার খেলা কে বুঝিতে পারে।

লণ্ডনে আমার একটি ছাত্র আছে। সে এখানে সওদাগরি করে। তার বেশ দুপয়সা রোজগারও হয়। ভারতবর্ষে বারো বৎসর পূর্বে আমার কাছে পড়ে এনট্রেন্স পাস করেছিল। সে আমার তারি খাতির করে। সেই ছাত্র আমাকে ভোজনাদি যথারীতি করায় এবং সকল রকমে যত্ন করে। দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটার সুবিধা থাকিলে খুব ফুর্তি হয়। তাই লণ্ডনে খুব ঘুরে বেড়িয়েছি।

লণ্ডনের ভিতর ট্রামগাড়ি নাই। বাহিরে আশে পাশে যেতে গেলে ট্রাম পাওয়া যায়। শহরের মাঝে কেবল অমনিবস্। ইহা এক রকম

প্রকাণ্ড গাড়ি। ভিতরে ২২ জন ও ছাদে ২৪ জন বসিতে পারে। বড় বড় দুটা ঘোড়ায় টানে। মাইল-করা এক আনা ভাড়া। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িও বিস্তর। ব্রুহামগাড়িকে আধখানা কোরে কেটে ফেললে যে রকম হয় সেইরকম ইহার আকার। দুটি লোক বসতে পারে। কোচুয়ান ছাদের পেছন দিকে কোচবাক্সে বসে ও প্রয়োজন হোলে ছাদে একটি ছিদ্র দিয়ে আরোহীর সঙ্গে কথা কয়। কি মাইলে বার আনা ভাড়া পড়ে। অধিক ছয় আনা করে বেশি লাগে। এখানে গাড়িওয়ালাদের সঙ্গে বকাবকি একেবারেই করিতে হয় না। রাস্তা ও বাড়ির নম্বর বোলে চক্ষু বুজে গাড়িতে উঠে পড়ো আর অনতিবিলম্বে নির্ভাবনায় গম্যস্থানে হাজির—যেন কলের খেলা। ভাড়া নিয়ে দস্তুর নেই। যা নিরীখ করা আছে তাই দিতে হবে। গৃহস্থ ও সাধারণ লোকে অমনিবসেই চড়ে আর শৌখীন লোকে ভাড়াটে গাড়ি চড়ে। এই অশ্বযান ছাড়া তিন রকম বাষ্পযান আছে। এক সোজাসুজি রেলগাড়ি, আর-এক নীচভুঁই রেল, আর তৃতীয় পাতাল গাড়ি। নীচভুঁই রেল বড় কিছু আশ্চর্য কারখানা নয়। রাস্তার দশ-বিশ হাত নীচে দিয়ে গাড়ি চলে। মাঝে মাঝে টনেল সুড়ঙ্গ আছে, কিন্তু প্রায়ই মাথার দিক খোলা। রাস্তার লোক সাঁকো বা পুলের উপর দিয়ে সেই সব রেলরাস্তা পার হয়। কিন্তু আজব কারখানা সেই পাতাল গাড়ি। এ নামটি আমি রেখেছি। ইংরেজিতে টিউব অর্থাৎ সুড়ঙ্গ রেল বলে। এই পাতাল রেল আন্দাজ ১২ মাইল লম্বা হবে। জমির ৬০ হাত নীচে এই সুড়ঙ্গ কাটা আছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে রেলগাড়ি যাতায়াত করে। মাইলে মাইলে ইস্টিশান। দু-আনা ভাড়া—তা এক মাইলই হোক আর দশ মাইলই হোক। ধনী-দরিদ্র বড়-ছোট সব এক শ্রেণী। টিকিট কিনে একটি কাচের বাক্সে ফেলে দিতে হয়। আর একটি লোহার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তারপর একজন কর্মচারী এসে কি একটা কল টেপে, আর অমনি সুড় সুড় কোরে লোহার ঘরটি নীচে নামে। প্রায় পঞ্চাশ ৫০ হাত নীচে গিয়ে

সেই ঘরটি আটকে যায়। তার পর পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাকি ১০ হাত নেবে প্লাটফরম পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলোয় একেবারে ফুরফুট্টি। সুড়ঙ্গের এক মুখ থেকে ক্রমাগত কলের দ্বারা হাওয়া চালিয়ে নওয়া হচ্ছে, তাই হাঁপ ধরে না। কিন্তু হাওয়াটা যেন একটু ঘন-ঘন বোধ হয়। দু মিনিট তিন মিনিট অন্তর গাড়ি। গাড়িও একেবারে আলোয় ভরা। গাড়ি থেকে নেমে আবার লোহার ঘরে গিয়ে দাঁড়াইলে সুড়সুড় কোরে উপরে উঠা যায়। ইহাকেই বলে পাতাল গাড়ি। এটা একটা সভ্যতার বাহাদুরি বা জ্যানপিটেগিরি। পাতাল দিয়ে রেল চালানো কিছু আবশ্যক ছিল না। এজন্য এখানকার লোকে বড় জ্বালাতন হয়েছে। যাদের বাড়ির নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ গেছে তারা রাত্রিতে এক রকম গম্‌গমানি শব্দ শুনিতে পায়—ঘর-দোর যেন টল্‌ছে—এইরকম তাদের বোধ হয়। আর যারা সুড়ঙ্গে কাজ করে তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কখন কখন কোন বাড়ি ধ্বসে যায় আর রেল-কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ সহিতে হয়। ৬০ হাত নীচে সুড়ঙ্গ কেটে গাড়ি চালান একটা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে বটে। তবে শেষ রক্ষা হোলেই ভাল। প্রকৃতি সভ্যতার এত অত্যাচার সহ্য করিতে না পেরে শেষে না প্রতিশোধ লয়।

লণ্ডনে আমার চোখে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস একটি হাইড পার্ক—প্রকাণ্ড বাগান। কলিকাতার বিডনস্ট্রীট সারকুলার রোড হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোড দিয়ে যতখানি জায়গা ঘেরা যায় হাইড্ পার্ক ততটা হবে—বেশী ত কম নয়। ইহা বৃক্ষলতাপুষ্পে সুশোভিত ও বড় বড় তৃণাচ্ছাদিত মাঠপূর্ণ—দেখিলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ আছে। তাহাতে মরালাদি জলচর পক্ষী সকল ক্রীড়া করে। মাঝে মাঝে আবার মনোহর দ্বীপ। সন্ধ্যার সময় যখন সমস্ত পার্কটা ইলেক্‌ট্রিক আলোকমালায় ভূষিত হয় তখন মনে হয় যেন অমরাবতী ধরাধামে অবতীর্ণা। ইহা প্রণয়িজনের বিহারবন—ভাবুকের চিন্তাভবন—অলসের আরাম—গলাবাজি বক্তৃতার রঙ্গভূমি—

চোরছেঁচড়ের আশ্রয়—কর্মক্লিষ্ট কেরানীর প্রাণ। মনে হয়, লোক-ভারাক্রান্ত লণ্ডন যেন এই স্থান দিয়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে।

লণ্ডনে চুরি-জুয়াচুরি-খুন লেগেই আছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক। পৃথিবীর সবজাতি এখানে বর্তমান। তাই সবরকম দুষ্কর্মও মূর্তিমান্। সেদিন একটা বড় মজার চুরি হয়ে গেছে। বড় রাস্তার ধারে এক জহুরীর দোকান। বহুমূল্য আংটি সকল কাচের জানালার ভিতর সাজান রয়েছে। হাজার হাজার লোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে আর একটা লোক একখানা পাথর নিয়ে ধাঁ করে জানালায় মার্‌লে। আংটি সব ছড়িয়ে পড়িল। টপাটপ্ সব কুড়িয়ে নিল। জুয়াচোরের দলেরা সেইখানে ভিড় কোরে দাঁড়িয়েছিল। তারা কতকগুলা কুড়িয়ে দোকানদারকে দিলে কিন্তু অধিকাংশ পাচার কোরে ফেলল। যে লোকটা পাথর মেরেছিল সে হৈ হৈ কোরে সরে পালাবার যোগাড় করেছিল কিন্তু পুলিশ ভারি জবর—পাকড়াও করে ফেললে। চোর কিছু দুঃখিত নয়। ছমাস বা এক-বৎসর জেল খেটে এসে সে কিছু মেরে দেবে। এক একটা আংটি ১০০০্ বা ১৫০০্ টাকা দামের। জহুরী বেচারি একেবারে অবাক্। দিন-দুপুরে সদর রাস্তায় চুরি।

আমি একজন বন্ধুর বাড়িতে দিন কয়েকের জন্য অতিথি হোয়ে রয়েছি। সেদিন গৃহিণীর বোন্‌ঝি ও তার সুইটহার্ট মিষ্টপ্রাণ অর্থাৎ প্রণয়ী এসেছিল। তারা দুদিন ছিল। এরা ভদ্র গৃহস্থ। প্রণয়ী বছর পঁচিশের হবে ও প্রণয়িনী বছর কুড়ি। আমি এদের গল্পচ্ছলে আমাদের দেশে স্বামী ও স্ত্রী কিরূপ ব্যবহার করে এবং পরস্পরের ভালবাসা কেমন আড়ালে লুকিয়ে রাখে—তাই বর্ণনা করেছিলাম। কুড়ি বছরের সেই যুবতী আমায় বলল যে, বোধ হয় আমাদের এই প্রণয়ব্যবহার তোমায় ভাল লাগে না। বিবাহ-বন্ধ না হইলেও তারা দুজনে সদাই মুখোমুখি কোরে বোসে থাকে আর পরস্পরকে আদর করে। মেসো

মহাশয় ঠাট্টা করে বললেন যে—ও প্রণয় দুদিনের—বিয়ের পর সব জুড়িয়ে যাবে। এ ঠাট্টা যুবতীর সইল না। তাই মেসো মহাশয় আরো চেপে ধরলেন ও বললেন—মনে নেই—তোমার মাসীর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে তুমি আমার সুইটহার্ট ছিলে। বোন্‌ঝি গ্রীবা বাঁকিয়ে বলিল যে ওরকম সুইটহার্ট আমার ঢের ছিল। কত যুবক আমার প্রণয়ের ভিখারী হয়েছিল।

মেসো মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন—তিনি জবাব দিলেন—হ্যারি পার্কিন্‌স্‌কে মনে আছে? হাঁ, আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বটে কিন্তু আমার এই বর্তমান সুইটহার্ট আমার ঠিক মনের মত হোয়েছে। সুইটহার্ট বেচারি বড় কথা-টথা কয় না। তিনি প্রণয়িনীর জুতা বুরুশ করিয়া দেন—কাপড়-টাপড় ঝেড়ে দেন আর কেবল এক দৃষ্টিতে সেই প্রণয়িনীর রূপমধু পান করেন। আর এদিকে প্রণয়নীর মুখে খই ফোটে। আমার গল্প তার বড় ভাল লেগেছিল। অনেকক্ষণ ধোরে আমার কাছে তারা বসে থাকত ও গল্প শুনত। আমিও মিষ্টি মিষ্টি কোরে মধুরে কেমন কোরে মঙ্গলভাব মিশাতে হয় তা আমাদের হিন্দু আচার-ব্যবহারের গল্প কোরে বলেছিলাম। অক্সফোর্ডে এক স্ত্রীলোকদের সভা আছে। আমাকে সেই সভায় হিন্দুগৃহস্থালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়েছিল। এক অধ্যাপকের ঘরণী ভারি বিদুষী—সভাপতি (পত্নী) ছিলেন। মেয়ের পাল সভায় উপস্থিত আর দু-দশজন পুরুষও ছিল। আমাদের ছোট মেয়েরা কি রকম পুণ্যপুকুরে যমপুকুরের ব্রত করে—গোলাপ টগর পাতায়—বলেছিলাম। হিন্দু-বিবাহের বিবরণ শুনে তারা ভারি খুশি। ঢেলাভাঙ্গানি শয্যাতোলানী বাসর-ঘর ইত্যাদিও বলতে হয়েছিল। ছাঁদনাতলায় বর কানমলা ও কীল খায় শুনে রমণীদের কেবল হো হো হাসি। ঘাটে নাইতে গিয়ে মেয়েরা কি রকম কমিটি করে—শাশুড়ী কেমন কনে-বউকে শায়েস্তা করে, স্বামী-স্ত্রী অন্যের সামনে বিশেষ গুরুজনের সমক্ষে দেখাদেখি বা কথা কইতে পারে না—আমরা ভালবেসে বিয়ে করিনে, বিয়ে করে

ভালবাসি—এসব কথা বর্ণনা করেছিলাম। শেষ কথা যে আমরা তোমাদের মতন কেবল জুতার ফিতা বেঁধে দিয়ে বা জুতা বুরুশ করে স্ত্রীলোকের সম্মান করি না। কিন্তু আসলে করি। আমার ভ্রাতৃবধু যদি বিধবা হয় তাহলে সেই বিধবা ও তাহার পুত্রকন্যাকে আমার ভরণপোষণ করিতে হয়। সেইরূপ বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে আহার বসন যোগাইতে হয়। স্ত্রীলোক আমাদের নিকট অবশ্য প্রতিপাল্য। আমরা আমাদের স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার করি—এরূপ নিন্দা তোমরা বিশ্বাস করিও না। বক্তৃতার শেষে বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা এসে আমায় বললেন যে, পাদরি ও জানানা-লেডিদের মুখে ভারতের নিন্দার কথা আমরা অগ্রাহ্য করিব। একজন সাহেব বললেন যে, এই রকম বক্তৃতা বিলাতের শহরে শহরে হওয়া উচিত।

ভারতের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয় তাহাই একান্ত বাঞ্ছা।

অক্সফোর্ড, ৬ই মার্চ ১৯০৩ বি, উপাধ্যায়

পাঁচ

বসন্তের সমাগম হয়েছে। শীতের প্রকোপ আর নাই। প্রকৃতি আবার নবজীবন পেয়েছে। ছ মাস ধোরে গাছগুলিতে একটিও পাতা ছিল না। উলঙ্গ ঊর্ধ্ব-বাহুর মত দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কে যেন নব কিশলয়-বসন পরিয়ে দিয়েছে। আর অনেক গাছে কেবল ফুল—পাতা এখনও দেখা দেয় নাই। এই ফুলের হাসি দেখে কালিদাসের কথা মনে পড়ছে।—

কুসুমজন্ম ততোনবপল্লবা
স্তদনু ষট্পদকোকিলকূজিতম্।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্মধু
দ্রুমবতীমবতীর্য বনস্থলীম্॥

প্রথমে কুসুম-জন্ম, তারপর নবপল্লব, তারপর ভ্রমর ও কোকিলের কূজন। এইরূপে বসন্ত আবির্ভূত হয়। বিলেতেও সেই কালিদাসের বসন্ত। এখানে পাখীর ডাক এত মিষ্টি লাগে যে মনে হয় যেন কানে মধু ঢেলে দিচ্ছে। কার্তিক মাস থেকে প্রায় চৈত্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত কিছু সাড়া শব্দ নাই, তার পরে একেবারে ঝঙ্কারে চারিদিক পরিপূরিত— তাই বুঝি প্রাণটা এত কেড়ে নেয়। এমন তরু নাই যাতে বিহগ নাই, এমন বিহগ নাই—যে কলধ্বনি করে না। এমন কলধ্বনি নাই— যাহা মুগ্ধ করে না। কি কপচান কি পিস—বিরহীর বাঁচা দায়। তবে আমার ভাগ্যগুণে বিরহ জ্বালা নাই তাই এখনও বেঁচে আছি। মাঠে-ঘাটে এত ফুল যে দেশটা এক প্রকাণ্ড মালঞ্চের আকার ধরেছে। দফাদিল (Daffodil) কুসুমে মাঠ সব একেবারে বিছিয়ে গেছে। সত্যি সত্যিই দফাদিল—দিল অর্থাৎ মনের দফা রফা। আর করকাশ (Crocus) ফুলের রঙ-বেরঙের ঘটা দেখলে চোখ ফেরান দায়। প্রেমরোষগুলি (Primrose) বাস্তবিক যেন এক একটি অভিমানিনী—রোষভরে চেয়ে রয়েছে। যশোমণি (Jessomini) ও বোলাটের (Violet) কথা আর কি বলবো—যে দেখেছে সে মজেছে।

এখানে ছেলে বুড়ো সব একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। মুখে হাসি আর ধরে না। সূর্যদেবের অনুগ্রহ খুব হয়েছে। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত চৌদ্দ ঘণ্টাকাল আকাশে অবস্থিতি করেন আর ছঘণ্টা গোধূলি। ষোল ঘণ্টা দিনমান। কিন্তু পৌষ মাসে ছঘণ্টা দিন আর তাও সূর্যদেব প্রায় মেঘে বাদলায় ঢাকা থাকেন। বেলা ছটার সময় রৌদ্রে দিগ্‌দিগন্ত ফেটে পড়ছে কিন্তু রাস্তায় জনমনুষ্য নাই। সকলের জানালা দরজা বন্ধ। পড়ে ঘুমুচ্ছে। এখানে ঘড়ি ধোরে কাজ চলে – বেলা দেখে নয়। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে খাওয়া শোয়া কাজ-কর্মের সব এক সময়।

অন্ধকারের পর এত আলো তাই লোকের খুব আনন্দ। এরা

প্রকৃতির সৌন্দর্যে এত মজে যায় যে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণও বোধ হয় লুচি-মণ্ডা পেয়ে এমন আত্মহারা হয় না। ফুলভরা মাঠে বালক-বালিকা যুবক-যুবতী সত্যি সত্যি গড়াগড়ি দেয়।

আমি এখানে একটি বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, ইংরেজের নিকট প্রকৃতি—সম্ভোগের বস্তু বলিয়াই আদৃত হয়, তাই তাদের পক্ষে রূপের পূজা বা প্রতীক বা উপাসনা অসম্ভব। হিন্দু-সন্তান কি প্রকার রূপের পূজা করে স্বরূপলাভের জন্য তাহা শুনে ভাল ভাল লোকেরা বলেছিল যে রূপের পূজাকে আর কখনও নিন্দা করিবে না।

রূপের দুইটি ভাব—মধুর ও মঙ্গল। মাধুর্য ও কল্যাণের সমাবেশ স্বরূপের ভূমানন্দ। কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়া মধুরকে মঙ্গলভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও ব্যবহার করি। যাহার আকর্ষণে মাদকতা জন্মে, ইন্দ্রিয় বিলোড়িত হয়—তাহাই মাধুর্য। সম্ভোগের আবর্তে মাধুর্যই জীবনকে টানিয়া আনে। মঙ্গল কিংস্বরূপ। আত্মদানই মঙ্গল। পূর্ণতা যখন উপচিত হইয়া অপরকে ভরপুর করে, বাসনাকে সমাহিত করে, সম্ভোগের প্রমোদকে বিশুদ্ধানন্দে পরিণত করে, তখনই শিব-স্বরূপের দর্শন হয়। সালঙ্কারা নবপরিণীতা বধূর চপলমাধুরী মুগ্ধ করে, প্রিয়জনকে অপর আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু ভূষণ-বিরহিতা আলুলায়িতকেশা কল্যাণময়ী মাতা দান করিতেই ব্যস্ত—আত্মদান ভিন্ন অন্য কোন কার্য নাই। অল্পজলা স্রোতস্বতী কলকলরবে নাচিতে নাচিতে ধাবিত হয়—মধুরতা যেন দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত। আর তুষারপরিপুষ্টা আপূর্যমাণা ভাগীরথী আত্মসলিলদানে কত শত প্রবাহকে পূর্ণ করিয়া মাতৃপদে বরণীয়া হইয়াছেন। অনেক ফল ফুল তরুলতা আছে বটে, কিন্তু কদলীবৃক্ষ মঙ্গলের পরিচায়ক। কোন অনুষ্ঠানে স্নেহরূপা রম্ভা তরুর অভাবে—তথায় শতসহস্র নবমল্লিকার সদ্ভাব থাকিলেও—মঙ্গলের যেন অধিষ্ঠান হয় না। কেন—কদলীবৃক্ষের ন্যায় আত্মদ আর কে আছে? পর্ণ—ভোজনপত্র। সার—আহার সামগ্রী। শল্ক—যজ্ঞকের

ব্যবহার্য। আর প্রাণবিসর্জন-সমন্বিত কন্যাদান দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

যতদিন প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবে ততদিন রূপের সাধন করিতেই হইবে। অনিত্য রূপকে নিত্যস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ না করিলে প্রবৃত্তি-পরায়ণ মানবের পক্ষে স্বরূপলাভ অসম্ভব। মাধুর্যশালী বস্তু প্রতীক হইতে পারে না কেননা তাহা প্রবৃত্তিকে সম্ভোগমুখিনী করে। যাহা মহান্ মঙ্গলময়, যাহা আত্মদান করে, তাহাই সেই শিবস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া স্বীকৃত। গীতাশাস্ত্রে জ্যোতিষ্কের মধ্যে তপন, পাদপের মধ্যে অশ্বত্থ, গিরির মধ্যে হিমালয় নদীর মধ্যে গঙ্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ —ইত্যাদি বিভূতিমান্ কল্যাণময় বস্তুই প্রতীক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। যখন কোন ভক্ত অশ্বত্থের মূলে জলসেচক করে, তখন ভূমার মঙ্গলভাবই পূত হয়। যখন কুলকামিনীরা পয়স্বিনী গাভীর পরিচর্যা করে, ভালে সিন্দুর লেপন করিয়া তাহাকে মাতৃপদে বরণ করে, তখন অনন্ত করুণাই উপাসিত হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা সূর্যদেবকে বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করেন তখন হিরণ্ময় পুরুষই স্তুত হন। অবিশেষকে জানিতে গেলে—বিশেষ বস্তু, বিশেষ স্থান, বিশেষ কালকে তাঁহার বিশেষ অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গঙ্গোত্রী পবিত্র তীর্থ, সাধারণ গ্রামে বা নগরে সে পবিত্রতা নাই। গ্রহণের কাল—অন্যান্য কালের অপেক্ষা দান-পূজায় অধিকতর উপযোগী। সাধুভক্তগণের আবির্ভাব বা তিরোভাবের তিথি অপরাপর তিথি অপেক্ষা নিশ্চয়ই সম্মানার্হ। অশ্বত্থ অন্য বিটপীর অপেক্ষা পূজ্যতর। গঙ্গা মাতৃস্থানীয়া, যে-সে নদী নহে। রূপকে এই প্রকার স্বরূপের বিগ্রহ বলিয়া উপাসনা করিতে হয়। রূপকে সাধন-সামগ্রী না করিলে প্রবৃত্তির তাড়না হইতে বাঁচা দায়।

ইংরেজেরা প্রকৃতির রূপকে ভালবাসে, কিন্তু রূপের সাধন জানে না। মধ্য সভ্যতার শাস্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে পবিত্রতার বা মঙ্গলভাবের আরোপ নাই।

প্রকৃতির মাধুরী লইয়া কত না গীত—কত না গাথা! কিন্তু যে সকল বস্তু আনন্দ ও কল্যাণময় তাহার আদর নাই। ক্রোটন আর অর্কেরিয়া লইয়াই ব্যস্ত। অশ্বত্থ বা কদলী বা বিল্বতরুর কোন সম্মান নাই। প্রকৃতি কেবল সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে। তাহার মঙ্গলময় রূপ তিরস্কৃত হইয়াছে। আর এদেশে সম্ভোগের ভাব অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে মঙ্গলভাব দেখা সুকঠিন ব্যাপার। ছয়-সাত মাস স্বভাব যেন একেবারে মৃতপ্রায়। তার পরে সৌন্দর্যে ফেটে পড়ে। এতদিন সংযমের পর দি গোটাকতক দিন আমোদের সময় মাধুর্য সম্ভোগ না করা যায় তাহলে জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিবে।

আমার রূপের পূজার ব্যাখ্যা শুনিয়া এক মস্ত অধ্যাপক-পাদরি আমায় লিখিয়াছেন যে রূপসাধনের তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও মনোহর। এরা অনেকে মনে করেন যে, যদি ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে এই হিন্দুভাব নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জগতের ঘোর অনিষ্ট হইবে।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করি। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, বর্ণধর্মই হিন্দু জাতিকে চিরজীবী করিয়াছে। কত জাতি লোপ পাইয়াছে কিন্তু হিন্দু এখনও বর্তমান। হিন্দু যেরূপ ঝড় তুফান বিপ্লব সহিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত আর ইতিহাসে নাই। ইংরেজের একতা রাজনীতির উপর নির্ভর করে। আমি এদের বলিয়াছি যে, আগে দেখাও যে রাজনৈতিক একতা এত ঝড় তুফান সহিতে পারে, তবে আমাদের শিক্ষকতা করিতে আসিও। মিছামিছি বর্ণধর্মের নিন্দা করিও না।

আর বক্তৃতার ফল এই হয়েছে যে, জন কয়েক অধ্যাপক এক কমিটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—যাহাতে অক্সফোর্ডে হিন্দু দর্শনের শিক্ষা হয়। এই সঙ্কল্পের সফলতা অর্থের উপর নির্ভর করে। তাই বিধাতার মুখপানে চেয়ে চুপ করে আছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার হাবভাব যত বুঝিতেছি তত আমাদের দেশে সংস্কারকদের উপর আমার রাগ বাড়িতেছে। সভ্যতার যে ভাল দিক

আছে তাহা ঢের বুঝান হইয়াছে। তবে আমরা গুণই জেনেছি, গুণাগুণ ভাল করে বুঝিনি। শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে, এখানে শতকরা চল্লিশ জন বিবাহ করিতে পারে না। গরীব ভদ্রগৃহস্থের বিবাহ করা দায়। যদি তাহারা সমান ঘরে বিবাহ করে তাহলে সমাজে গৃহিণীর মর্যাদা রাখিতে গিয়া গাউনের খরচাতেই প্রাণ অস্ত—একেবারে ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন। আর যদি নীচু ঘরে বিবাহ করে তাহলে একঘরে হতে হয়—নিজের সমাজে নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হয়। এই সভ্যতার তত্ত্বটি আমি অতি অন্তরঙ্গ ভাবে জানিয়াছি, বাহির থেকে বড় একটা জানা যায় না। অর্থাভাবে প্রজাপতির নির্বন্ধ রহিত হয়ে প্রবৃত্তির যদৃচ্ছাচারিতা ক্রমশই বাড়িতেছে।

এখানে বিপুল ঐশ্বর্য কিন্তু দরিদ্রতাও খুব। শতকরা ত্রিশ জন দরিদ্র অর্থাৎ কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করে। তার মধ্যেও আবার অনেকে তাও তাও পারে না।

শুনলে বিশ্বাস হয় না যে, এখানকার অধিকাংশ শ্রমজীবিরা মাংস খেতে পায় না। মদিরাটুকু (Beer) চাইই-চাই কিন্তু মাংস কিনিবার পয়সা তাদের জুটে না। কেবল রবিবার দিন মাংস খায়—আর অন্য দিন রুটি পনীর আলু ইত্যাদি খায়। একদিকে যেমন অর্থ বাড়িতেছে, অপর দিকে তেমনি অভাব বাড়িতেছে। প্রতিযোগিতা যে সভ্যতার মূল, তাহার ফল এইরূপ হইবেই হইবে। এখানে কলেতে (factory) অপরিণীতা স্ত্রীলোক সকল কাজ করে। তারা যে রোজগার করে তাতে তাদের কিছুতেই চলে না। তাই তারা প্রায় সকলে পেটের দায়ে দুশ্চরিত্রা হয় এ একেবারে জানা কথা। তবুও এমনি প্রতিযোগিতার (Competition) চাপ যে তাদের পাওনা বাড়ান বড়ই মুশকিল।

অর্থ যে কি অনর্থ ঘটিয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না। যদি বড় মানুষ হয় তাহলে তার ছেলেমেয়ের বিবাহোপলক্ষে খানা ও মজলিসে গরীব পিতামাতার ভাইভগ্নীর নিমন্ত্রণ হবার জো নাই। ভ্রাতৃ-

ভাবাপন্ন সংস্কারকেরা এই সভ্যতার ফলটি একটু তলিয়ে যেন দেখেন। তাহোলে তাঁদের জাতিভেদের উপর বিদ্বেষ ঘুচে যেতে পারে।

আর একটা কথা বলি। স্বাধীন প্রেমে বড় একটা বিভ্রাট ঘটেছে। পণ-ভঙ্গের (Breach of Promise) মকদ্দমায় কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। কোন যুবক যদি কোন যুবতীকে বাগ্‌দান কোরে বিবাহ না করে তা হোলে খেসারত নালিশ চলে। এই রকম নালিশ অনেক হচ্ছে বোলে হাকিমেরা দণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছেন সেদিন এক গরীব যুবকের পণভঙ্গের দরুন ৭৫০০৲ টাকা দণ্ড হয়েছে অর্থাৎ যুবতী এই টাকাটা যতদিনে পারে কিস্তিবন্দি কোরে আদায় করে নিতে পারবে। কিস্তিবন্দিটা অবশ্য আয় অনুসারে হবে। যুবতীরা যত প্রেমপত্র—সব নম্বর ডাকেট (docket) ও ফাইল কোরে রাখতে আরম্ভ করেছে—কি জানি যদি প্রণয়ীর নামে নালিশ করতে হয়। তারাও গ্রিমেণ্ট (Agreement) লিখিয়ে নিতে আরম্ভ করেছে। সেদিন কোর্টে পণ-ভঙ্গের মকদ্দমায় এক গ্রিমেণ্ট দাখিল হয়েছিল। তার মর্ম এইরূপ—আমার প্রণয়ী (ভাবী স্বামী) আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে—তা আমি জানি কিন্তু যদি কোন আকস্মিক কারণে আমায় বিবাহ না করে তাহলে আমি ১৫০৲ টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব আর সব প্রেমপত্র (Love-letters) ফিরাইয়া দিব। এই গ্রিমেণ্টের জোরে যুবক ১৫০৲ টাকাতেই রেহাই পেয়েছিল। প্রেমেও ব্যবসাদারি—বাহবা সভ্যতা।

ডাকের আর সময় নাই—আজ এই পর্যন্ত।

অক্সফোর্ড, বি. উপাধ্যায়

২৭শে এপ্রিল, ১৯০৩

ছয়

এখানে এখন রাত নয়টা পর্যন্ত গোধূলি থাকে। আবার ওদিকে রাত তিনটের সময় বেশ ফরসা হয়। ঠিক ধরতে গেলে ঘণ্টা চারি-পাঁচ রাত থাকে। সূর্যের কিরণকে রৌদ্র বলে—কিন্তু এখানে একেবারে রুদ্রভাব নেই। দা-কাটা কড়া তামাকে আর বাবু মহলের ভ্যালসায় যত তফাৎ আমাদের দেশের এবং এখানকার রোদে তত তফাৎ। তবে বেলা দুটা-তিনটার সময় একটু মিঠেকড়া রকম হয়। সেই সময় গাছের তলায় বড় আরাম। হাওয়া যে কত মিষ্টি লাগে তা বলে উঠা দায়। এখানে গ্রীষ্মে হাওয়া খাওয়া আর মধু খাওয়া দুই-ই এক।

কালেজের ছাত্রদের খুব নৌকা-বহার ধুম পড়ে গেছে। অধ্যাপকদের কন্যারা এবং শহরবাসী গৃহস্থের মেয়েরা সব অপরাহ্ণে নদীর ধারে বেড়াতে আসে। যুবক ছাত্রেরা এবং ঐ যুবতীরা নৌকা-রোহণ কোরে কখন বা ধীরি ধীরি কখন বা দ্রুতগতি দূরে দূরে ভেসে চলে যায়। কেহ কেহ আবার কোন তীর তরুচ্ছায় তরীটিকে বেঁধে অলসতার মাধুর্য সম্ভোগ করে। তবে একটা কড়া নিয়ম আছে। ছাত্রেরা বড় ঘরের বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে কিন্তু যে মেয়েরা দোকানে কাজ করে নীচে ঘরে—তাদের সঙ্গে রাস্তায় কথাটি পর্যন্ত কহিলে ছাত্রটি শাস্তি পায়। সন্ধ্যার পর ছয় সাত জন দারোগা (Proctor) ঘুরে বেড়ান। এক-একজন দারোগার সঙ্গে দুজন করে ষণ্ডামার্ক লোক থাকে। তাদের ছেলেরা নাম রেখেছে ডালকুত্তো (Bull dog)। যদি কোন ছেলে ঐ রকম নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে কথা কয় বা বেড়াতে যায়, তা হোলে দারোগা তার নাম ও কোন্ কালেজের ছাত্র তা লিখে নেয়। অনেক ছেলে পালাতে চেষ্টা করে ও অলিগলি ঘেঁষে দৌড় দেয়। ডালকুত্তোরা অমনি পেছু পেছু ছোটে ও গ্রেপ্তার করে আনে। দারোগা রিপোর্ট কোরলে

ছেলেদের খুব সাজা হয়। তবে ছেলেরা খুব ত্যৈরের। দারোগাকে ফাঁকি দিতে বেশ জানে।

আমার নিজের কথা বড় একটা বঙ্গবাসীতে লিখিনি। লিখিলেই মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এখানে কতকগুলা ভূতুড়ে বা ভূতের গল্প প্রিয় লোক আছে। তারা মনে করে যে, হিন্দু হোলে পরের মন জানতে পারা যায়, দেওয়ালের ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, প্রেতসিদ্ধ হওয়া যায়। জাত ইংরেজ কি না তাই কেবল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দিকে নজর—ভক্তি বা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হবে এ সব কথা মাথায় যায় না। এরা আমায় পাকড়াও করেছিল। বক্তৃতার উপর বক্তৃতা। ভারি হৈ চৈ পোড়ে গিয়েছিল। যদি কাগজে সে সব লিখি বা লেখাই তা হোলে ধারণা হবে যে কি একটা ব্যাপার হয়েছে। কিন্তু সত্যের অপলাপ একটুও হবে না—যদি বলা যায় যে এরা অতি অকর্মণ্য লোক। আবার এদের মধ্যে মেয়েমানুষই ঢের। ভারতের যে কি দুর্দশা তা বলা যায় না। যত মেয়ে তেড়ে ফুড়ে ভারতের দর্শনতত্ত্ব শিখতে আসে। শুধু শিখতে আসে তা নয়, আচার্য হোতে চায়। এই সব মেয়েরা আমায় ধরেছিল। লণ্ডনে এক মস্ত শৌখিন লোকদের আড্ডায় (Sesame club) আমায় নিয়ে গিয়ে খানা দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি যে শৌখীন মেয়েরা সন্ধ্যাবেলার পোশাক পোরে এসেছে। সন্ধ্যার পোশাক মানে—অর্ধেক বুক ও হাত খোলা আমার ত দেখেই আক্কেল গুড়ুম। কোন রকমে কপি ও আলু-সিদ্ধ (বিলাতে আমার ঐ ভরসা) খেয়ে চম্পট দিলাম। মিস্টর স্টর্ডি বোলে একজন আছেন তিনি খুব হিন্দুস্থান ভক্ত। তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে হিন্দুর দর্শনজ্ঞান চলে কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছেন। তিনিও বলেন কতকগুলি মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ বড় মনোযোগ দেয় না। তিনি তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন।

কিসে এখানকার বিদ্বানেরা বেদান্ত দর্শনের আস্বাদন পায় তার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ

সরস্বতীর ছুটি পাশ্চাত্ত্য পীঠস্থান। কিন্তু এখানকার কোন দার্শনিক অধ্যাপক হিন্দুদর্শনের বিষয় কিছুই জানেন না। যা বা জানেন তা সব বিপরীত। ডাক্তার কেয়ার্ড প্রভৃতি দার্শনিকেরা তাঁদের গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন যে বেদান্ত এক পুরানো কালের দর্শন—এখনকার বিদ্যার কাছে তাহা আর খাটে না। এ সব দার্শনিকদের কাছে মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিৎ দাঁড়াইতে পারেন না। এদের কথা সকলেই গ্রাহ্য করে। অক্সফোর্ডে আমি অল্পস্বল্প চেষ্টা করেছি, তাহার আভাস আগেই দিয়েছি। অল্পদিন হোল কেমব্রিজে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ত্রিনীতি কালেজে তিনটি বক্তৃতা করি। বিষয়—(১) হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম, (২) হিন্দুর ধর্মনীতি, (৩) হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Dr. Metaggarp সভাপতি ছিলেন। নিজের সুখ্যাতি করতে নেই, বক্তৃতা তিনটি খুব জমেছিল। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিল। বক্তৃতার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, অধ্যাপকেরা পরামর্শ করছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া যাবে কিনা। যদি সুপরামর্শ হয় তা হোলেই মঙ্গল, নইলে আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। এক দিনের কর্ম নয়, এক জনেরও কর্ম নয়। ইংরেজের ছেলেরা বেদান্ত পড়লে য়ুরোপেরও মঙ্গল ও ভারতের মঙ্গল। এরাঁই ত গিয়ে আমাদের অধ্যাপক ও হাকিম হন।

বক্তৃতা দিয়ে খুব নিমন্ত্রণ খাওয়া গিয়েছিল। একজনেরা আমায় বেশ কোরে ফলাহার করিয়ে ১০৫৲ টাকা দক্ষিণা দিয়েছে। আমি একেবারে অবাক্। এখানের দস্তুর বক্তৃতার জন্যে টিকিট করা। কিন্তু আমি টিকিট করি নে, কেননা তত্ত্বজ্ঞান বিক্রি করতে রুচি হয় না। তাই বড় খরচের টানাটানি হয়। কাপড়-চোপড়ও ছিঁড়ে গিয়েছিল—নূতন করতে গেলে অনেক খরচ। একটা লম্বা গরম জামা করতে ৪০৲ টাকার কম হয় না। ভগবান্ জুটিয়ে দিলেন। এখন একটু আরাম করে বেড়াতে পারবো।

কেমব্রিজে ষাট-সত্তর জন ভারতীয় ছাত্র আছে, তার মধ্যে বাঙ্গালী

জন দশেক। আমারও দুটি ছাত্র এখানে পড়ে। একজন নিজে হাতে পায়স ও মোহনভোগ তৈয়ারী করে খাইয়েছিল। অতি উপাদেয়। বিলেতে বসে পায়স ও মোহনভোগ খাওয়া রাজার কপালেও ঘটে ওঠে না। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাদের মেম-রাঁধুনীকে বাঙ্গালা তরকারি করতে শিখিয়েছে। ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে ধড়ে প্রাণ এসেছে। আর একজন হিন্দুস্থানী ছাত্র দেশ থেকে আমের আচার এনেছিল, তাই খেয়ে জিভটার সাড় হয়েছে। বোধ হয় আচারের জোরেই বক্তৃতাগুলো ভাল হয়েছিল।

কতকগুলি পাদরি আমাদের দেশের ভয়ানক শত্রু। তারা ছুটি নিয়ে আসে আর এখানে এসে আমাদের নিন্দা করে। এক ভয়ানক নিন্দা যে, আমরা আমাদের স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করি। কেমব্রিজে একজন পাদরি ঐ রকম খুব কুৎসা কোরেছে। দেশী-ছাত্রেরা লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূত হয়েছিল। তারা ছাত্র, তাদের কথা বড় কেহ শোনে না। আমি আসাতে সেখানকার মেয়েরা আমাকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়েছিল। তাদের বড় জানতে ইচ্ছে আমরা স্ত্রীলোকদের প্রতি কিরূপ আচরণ করি। অনেক কথা তাদের বলেছিলাম। দুই একটা বিষয় লিখছি।

আমি তাদের বলেছিলাম যে, তোমাদের পুরুষেরা কেবল তোমাদের জুতো ঝেড়ে দিয়ে সম্মান করে কিন্তু কাজের বেলা সব ফাঁকি। আর আমরা স্ত্রীলোকদের জুতা সাফ করিনে বটে কিন্তু যথাসাধ্য ভরণপোষণ কোরে সম্মান করি। আমার বিধবা ভ্রাতৃজায়া বা ভগিনী ও তাদের পুত্রকন্যাদিগকে যদি আমি প্রতিপালন না করি তা হোলে আমি সমাজে একজন অতি অধম লোক বোলে গণিত হব। বিবাহকালে কন্যার পিতা কিছু-না-কিছু অলঙ্কার বা অর্থ দিতে বাধ্য। সেই অলঙ্কার স্ত্রীধনরূপে গ্রাহ্য। তাহাতে স্বামীর বা পুত্রের কোন অধিকার নাই। যাহাকে ইচ্ছা সেই স্ত্রীধন আমাদের মেয়েরা দিয়া যাইতে পারে। যদি কাহাকেও দত্ত না

স্ত্রীলোকদের এরূপ ক্ষমতা দশ বৎসর আগে ছিল না। আর হয় তা হোলে কন্যারা সেই স্ত্রীধনের অধিকারিণী হয়। তোমাদের আমাদের স্ত্রীলোকদের ক্ষমতা গৃহস্থালী ব্যাপারে একপ্রকার অসীম। তোমাদের দেশে বিধবা মা-বোন গতর খাটিয়ে খায় আর পুত্র এবং ভ্রাতা গাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া খেয়ে জুড়ি চড়ে। বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা বড় শুভফলপ্রদ নহে। তোমরা মনে কর যে, পরিণয় এক চির-মধু-যামিনী (Perpetual honey-moon) সম্ভোগের ব্যাপার আর উদ্দামপ্রবৃত্তি যুবকযুবতীরা ভোগবাসনা নিরত হইয়াই প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। শতকরা একজনও মঙ্গলভাব-প্রণোদিত হইয়া উদ্বাহবন্ধন স্বীকার করে না, তাই তোমাদের সমাজে এত শিথিলতা দাঁড়াইতেছে। বিবাহের মাধুর্য যেমনি পুরানো ও পানসে হয়ে যায়, অমনি চঞ্চলতা এসে গৃহের মঙ্গললক্ষ্মীকে দূর করে দেয়। হিন্দুর আদর্শ ভিন্ন। হিন্দু পিতৃঋণ-পরিশোধার্থে বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহ সম্ভোগের জন্য নয়। পিতৃত্ব ও মাতৃস্বরূপ মঙ্গলভাব করণের জন্য। হিন্দু তাই চঞ্চলস্বভাব যুবক-যুবতীর হাতে পরিণয়ের গুরুভার দেয় না। পিতামাতাই ভাল কুলশীল দেখে পাত্রপাত্রী স্থির করে। কতকগুলি পাদরি গূঢ় কথা বুঝতে পারে না, তাই মিথ্যা আমাদের নিন্দা করে। এই বক্তৃতার পর কেমব্রিজ শহরে খুব একটা গোল হয়ে গেছে। আমার কালেজেতে বক্তৃতার দিন এক পাদরি কি আমাদের দেশের বিরুদ্ধে বলতে উঠেছিল, অমনি সভাপতি তাকে দুই ধমক দিলেন আর শ্রোতৃ-বর্গের হাততালির চোটে তাকে একেবারে দাঁড়িয়ে মাটি করে দিলে।

এখানে মেয়েদের বড় কষ্ট। চেহারা ভাল না হোলে বিয়ে হয় না। বাপের টাকা থাকলে সুবিধে হোতে পারে, কিন্তু বড়ই মুশকিল। যদি ঢিপকপালী বা চিরুণদাঁতী হয় তা হোলে কেউ তাদের গ্রাহ্য করে না। যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীর দল এত বেশী যে পায়ে ঠেকে। বিলেতে মেয়ের সংখ্যা অধিক, শতকরা ৬০। এই অবিবাহিতা মেয়েদের অধি-কাংশকে খেটে খেতে হয়। গৃহস্থের মেয়েরা তাই লেখাপড়া শেখেও মেয়ে স্কুলে ডাকঘরে তারঘরে দোকানে ও অন্যান্য জায়গায় চাকরি পায়।

কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডে ও কেমব্রিজে মেয়েদের পড়তে দিত না। এখন পড়তে দেয় কিন্তু উপাধি B.A, M.A. Degree দেয় না। একজন বিদুষী স্ত্রীলোক এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিন্দা করছিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, ঘরে একে ত তোমাদের শাসনে পুরুষ অস্থির আকার, উপাধিধারিণী কেলো হোলে সেনেট সিনডিকেটে পুরুষদের উত্তম্ কুস্তম্ করবে। এতটা সহ্য যায় না। এই কথা বলাতেই একেবারে খুব হাসি। সেখানে আরো অনেক অধ্যাপিকা ছিলেন। এঁরা আমার বক্তৃতা শুনে তাঁদের মেয়ে-কলেজ দেখাতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে খুব খাতির করে ছিলেন। তাই সাহস কোরে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে পেরেছিলাম।

এখন আর আমার বক্তৃতার গোল নাই। বঙ্গবাসীতে নিয়মিত চিঠি লিখতে চেষ্টা করবো। ইতি—

৫ই মে, ১৯০৩ বি. উপাধ্যায়

নয়

আমি অক্সফোর্ডে যে গৃহস্থের বাড়িতে থাকি তারা সামান্য রকম লোক কিন্তু ভদ্র। কর্তা প্রায় একশত টাকা মাসিক রোজগার করেন —অর্থাৎ আমাদের দেশের ২৫।৩০৲ টাকার কেরানীর মত অবস্থাপন্ন। গৃহিণী সুশিক্ষিতা—বিবাহের পূর্বে শিক্ষকের কার্য করিতেন। তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র। বড় মেয়েটি এক কারমে কেরানীর কাজ করে। আমাকে এরা সকলেই খুব খাতির যত্ন করে। আমি একটি বড়ঘরে থাকি। ঘরটি ফুলদার রঙীন কাগজে মোড়া। মেজে কারপেট বিছানো। একটি সোফা (Sofa), ইজিচেয়ার (Easy chair) তিনখানি গদি-মোড়া কেদারা, তিনটি ত্রিপাই (Tripoy) ও একটা বড় মেজ। দেওয়ালে খান বারো নানা রকমের ছবি সাজানো আছে। আর এক-খানা গিলটির কাজ-করা দেওয়া বড় আরশি আছে, তাতে উঠতে

বসতে আমার চাঁদমুখ দেখতে পাই। আহা যদি নিজেকে ভালবাসতাম তা হোলে কি আনন্দই না হোত। কিন্তু আমার কপাল এমনি মন্দ যে, যাদের সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা তারা প্রায় সকলেই আমার চেয়ে সুশ্রী—নয় গুণবান্। তাই ছেলেবেলা থেকে নিজের উপর বড় ভাবভক্তি হয় না। তবে চেহারা যে একেবারে মন্দ তা নয় কিন্তু ভালবাসার যুগ্যি নয়। যাক্ নিজের কথা। ঘরটিতে দুটি জানালা। তাতে নেটের ফুলকরা পরদা টাঙান। স্প্রিং-এর একখানি খাট বেশ গদিপাতা। দেশে কম্বলে মাদুরে শুয়ে বৈরাগ্যসাধন করতাম। এখানে বৈরাগ্য-টৈরাগ্য কোথায় ভেসে গেছে। প্রাতে উঠে মুখহাত ধুয়েই খাওয়া। দু পেয়ালা চা—চার টুকরা রুটি, একতাল মাখন ও এক পেলেট পরিজ (Porridge) অর্থাৎ সিদ্ধকরা কোন শস্য—আমি রোজ বেলা ৮৷৷০ টার সময় উদরসাৎ করি। ইহাকে উপবাস-ভঞ্জন (Breakfast) বলে। তারপর বেলা একটার সময় লাঞ্চ (Lunch) অর্থাৎ মধ্যাহ্নের আহার। ভাত ডাল আলুভাজা কপির তরকারী রুটি মাখন ও ফল ইত্যাদি খাই। আবার চারিটার সময় টোস্ট অর্থাৎ রুটি মাখনে ভাজা—কেক আর দু পেয়ালা চা অবাধে গ্রহণ করি। রাত্রি আটটার সময় ডিনার (Dinner) অর্থাৎ প্রধান আহার। আমি প্রায়ই আলু, বরবটি ও কলাই শুঁটির তরকারি রুটি ও পুডিং (Pudding) খাই। এখনও শেষ হয় নি। শোবার আগে এক পেয়ালা গরম দুগ্ধ পান করি। দেশে যদি এত খাই তা হোলে দু চার দিনেই শমন-ভবন গমন করিতে হয়। তবু আমি এখানে একজন মস্ত সাধু। মাছ মাংস ডিম কিছু খাই না—কি কোরে বাঁচি তাই সবাই অবাক। এখানকার নিরামিষাশীরা (Vegetarian) ডিম খায়, কেননা ডিমের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এখানে যেমন খাওয়া তেমনি পরিশ্রম করা চাই। ছ সাত মাইল অন্ততঃ রোজ না বেড়ালে অসুখ করে। আমার শরীর বেশ শুধরে গেছে। চেহারা লাল হোয়ে উঠেছে। কিন্তু মাসে ৫০টি করে টাকা দিতে হয়। এর চেয়ে সস্তা হয় না। গৃহিণী

মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন করেও খাওয়ান। আর ডিম খাইনে বোলে প্রায়ই ডিম না দিয়ে কেক্ তৈয়ারী করেন। কাপড়-চোপড় নিজেই কেচে দেন, ধোপার খরচ লাগে না। বাড়িতে ইস্ত্রি করবার বন্দোবস্ত আছে। ইজের মোজা ছিঁড়ে গেলে খুব ভাল রকম নিজে রিপু কোরে দেন। গৃহিণী বড় পরিশ্রমী। দাসী নাই। সমস্ত দিন রান্না ও ঘরকন্নার কাজ তাঁহাকে করিতে হয়। আমার উপর এঁর কিছু ভক্তি হয়েছে। এক একদিন সময় হোলে আমার কাছে এসে ধর্মোপদেশ নেন। সংসারের ভাবনার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি কি প্রকারে মিশাইতে হয় তাহা আমি এঁকে বলি। তাই অনেকটা গুরুর মতন সেবা পাই। ছোট ছোট মেয়েগুলি সদাই ব্যস্ত পাছে আমার খাবার-দাবারের কোন ত্রুটি হয়। বড় মেয়েটি একদিন আমায় খাবার দিতে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে একটু নুন ছড়িয়ে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি। সে বললে যে আসতে আসতে নুন ফেলে দিয়েছিল। নুন ফেলা বড় অলক্ষণ। তাই ঐরকম কোরে অলক্ষণের কাটান করিতে হয়। আমাদের দেশেও অনেক স্থানে এই রকম প্রথা আছে—যেমন তেল পড়ে গেলে সেই জায়গায় একটু জলের ছিটে দিতে হয়। এখানে ঐপ্রকার অনেক সরল প্রথা আছে। সভ্যতার প্রকোপে আমাদের দেশে ভারতবর্ষে কত না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার-ব্যবহারকে কুসংস্কার বোলে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। সভ্যতার দেশেই কিন্তু কুসংস্কার বেশী। গৃহিণীর এক ভগ্নী তার মামাতো ভাইকে বিয়ে করবে বোলে ক্ষেপেছে। মামা ভয়ানক চটেছেন। ছেলেকে বিষয় দেবে না বোলে ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রণয়িযুগল অটল। তাই গৃহিণী দুঃখ কোরে আমায় বলছিলেন যে, মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনে বিয়ে বড় মন্দ। একটা ইংরেজিতে ছড়া বললেন—সেটা আমি ভুলে গেছি। তার অর্থ এই যে, ঐপ্রকার বিয়েতে স্বাস্থ্য ও অর্থনাশ হয়, আর বন্ধ্যাদোষ হয়। বললেন—যতগুলা আমি দেখেছি ততগুলা ঐরকম। তার সাক্ষী আমাদের পাড়াতেই এক ঘর বুড়ো-বুড়ী স্বামী-স্ত্রী আছে। তারা খুড়তুতো ভাই

বোন। তাদের সব টাকা ও ব্যবসায় নষ্ট হোয়েছে—ছেলেপিলে হয় নাই আর তারা রোগে জীর্ণ। এত দেখে-শুনেও তাঁর বোনের কেন এমন কুমতি হোলো তাই বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমরা সকলেই জানি যে, ইংরেজের প্রাণ অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নির্ভরটা কতদূর তা বোধ হয় অনেকেই জানে না। বিলেতে প্রতি বৎসর প্রায় ছয় কোটি মণ গম আমদানি হয়। মার্কিণ মুলুক হোতে তিন কোটি মণ আসে। কানেডা হোতে পঁয়ষট্টি লাখ মণ ও হিন্দুস্থান হোতে ষাট লাখ মণ গম আসে। বাকি অন্যান্য দেশ যোগায়। গম ছাড়া ময়দা ১ কোটি ৮০ লাখ মণ। যবও প্রায় অত। জুয়ারি (Maize) তিন কোটি মণ। ভেড়ার মাংস দেড় কোটি মণ ও ১০ লাখ মণ শূকরের মাংস বিদেশ থেকে আসে। তাই ইংরেজের ব্যবসাগত প্রাণ।

মিস্টার চেম্বারলেন এখানে এক ভারি গোল বাধিয়েছেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন যে, উপনিবেশের আমদানি মালের উপর মাশুল কম কোরে অন্য দেশের মালের উপর মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। উপনিবেশ সকল আমাদের পরিবারভুক্ত; তজ্জন্য তাদের মাল ও দেশের মাল এক মনে করা উচিত। আর তা হোলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ও উপনিবেশ সকলের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হবে ও বৃটিশ সাম্রাজ্য বললাভ করবে। এখন মুশকিল এই যে,শস্য,মাংস ও অন্যান্য মাল উপনিবেশ হোতে খুব কম আসে। তাই বিদেশীয় মালের শুল্ক বাড়ালেই আহারীয় দ্রব্যের দর চোড়ে যাবে। এই কথা নিয়ে কাল পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় হুলস্থুল বেধে গিয়েছিল। রাজস্ব-সচিব মিস্টার রিচি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে, ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি মিস্টার চেম্বারলেনের প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত। সচিবে সচিবে মতভেদ বড় দেখা যায় না। উদারপক্ষের (Liberal) মেম্বরেরা ভারি খুশি। গবর্ণমেন্টকে খুব চেপে ধরেছে। আর গবর্ণমেন্টের পক্ষের মেম্বরেরা অনেকেই চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর এক বিপদ। যে শিক্ষাবিধি (Education Act)

পাশ হোয়েছে তাতে লোকেরা ভারি চটেছে। ইংলিশ চার্চের (Church of England) বিরুদ্ধ সম্প্রদায়েরা (Nonconformist) মনে করে যে, এই বিধি অনুযায়ী চলিলে সব ইস্কুল ইংলিশ চার্চের হাতে আসিবে। তাই তারা শহরে ধর্মঘট কোরেছে যে, শিক্ষার জন্য যে ট্যাক্স তা কেউ দেবে না। বড় বড় লোক এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। যারা ট্যাক্স দিচ্ছে না তাদের আসবাবপত্র সরকারে নীলাম করে ট্যাক্স আদায় করছে কিন্তু লোকে তবুও শুনছে না। বিদ্রোহ ক্রমশঃই বাড়ছে। ইংরেজ বিধির বড়ই বশ, কিন্তু তারা ধর্মহানির ভয়ে এবার বিধির বিরোধী হোয়েছে। গবর্ণমেণ্টের বড়ই বিপদ।

ইংরেজ হিন্দুজাতিকে নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছে। জাতি শ্বেতবর্ণ না হোলেই কাফ্রি বা জুলুদের মত অসভ্য—এইরূপ এদের ধারণা ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে তারা সে ধারণাটা হৃদয়ে পোষণ করতে বড় সুবিধা পায় না। হিন্দুজাতি যে ইংরেজের অপেক্ষা সভ্য তার আর কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে পদে পদে এদের চোখ ফুটছে কিন্তু পূর্বসংস্কার ছাড়িতে চায় না। আমরা ইংরেজ বা ইয়ুরোপীয়—আমরাই সভ্য—আর সব অসভ্য—এই বুলি। ডাক্তার ফেয়ারবেয়ারন (Dr. Fairbairn) ও ডাক্তার ড্যাড (Dr. Dadd) আমাদের দেশে দর্শন শিখাইতে গিয়েছিলেন। ভাল কথা। কিন্তু গিয়ে দেখিলেন যে, হিন্দুর দর্শন তাঁদের দর্শনের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। তাই বড় একটা পসার হোলো না। এই রাগ। দাও গালাগালি হিন্দুদিগকে। ডাক্তার ফেয়ারবেয়ারন উক্সপারে আছেন। বেদান্তের সম্বন্ধে জানিতে এখানে অনেক অধ্যাপক উৎসুক,কিন্তু ইনি একেবারে বীতরাগ। হিন্দু দর্শনের উপর এঁর কিছু শ্রদ্ধা নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে, এখানে ইনি গাঁয়ে-মানেনা-আপনি-মোড়ল গোছের লোক। আমাদের দেশের লোক মনে করেছিল যে, কোন একটা দিগ্‌গজ এসেছেন। কিন্তু উক্সপারে এঁর প্রতিপত্তি ভারি কম। ডাক্তার ড্যাড ত স্পষ্ট লিখেছেন যে, হিন্দুরা মিথ্যাবাদী ও দুশ্চরিত্র। যে ইংরেজ ভারতে যায় সে-ই হিন্দুর

বিষয় কিছু-না-কিছু লেখে। এখানে এত বই বেরিয়েছে যে, আমরা তার খবরই জানি না। কিন্তু প্রায় সবগুলি হিন্দুর নিন্দায় ভরা। এর উপায় কি! উপায় রাঙ্গা পায়। আমাদের দেশীয় ধুরন্ধরেরাও হিন্দুর নিন্দা করিতে ছাড়েন না। রমেশবাবুর 'হিন্দু-সভ্যতা' নামক পুস্তকখানিতে হিন্দুর নামকে যে কি মাটি কোরেছেন তা বলা যায় না। তাঁর গ্রন্থের মর্ম যে, আমরা কোনও পুরাকালে একটু আধটু সভ্য ছিলাম— তা আবার সে সভ্যতাটুকুও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে লোপ পেয়েছে। যাক্ তাঁর আর নিন্দা করিব না। তিনি দেশ-হিতৈষী। ইংরেজের কাছে তিনি আমাদের দারিদ্র্যের ওকালতি করেন—তাঁর মঙ্গল হোক।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বেদান্তদর্শন শিক্ষা হয় সেই বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। যদি হয় ত বড় ভাল হয়। কতকগুলো বিলাতি ভূতুড়ে লোক আর বিলাতি মেয়েমানুষের হাত থেকে হিন্দুয়ানির পাণ্ডাগিরি যতদিন না যায়, ততদিন অমঙ্গল বই মঙ্গল নয়। যারা উচ্চশিক্ষিত তারা ঐ অর্ধশিক্ষিত প্রেতাত্মা-মহাত্মা-গ্রস্ত উদ্ভুট্টে বিলাতি হিন্দুদের ঘৃণা করে। এই পাণ্ডার দল—দর্শন কি বস্তু তার বড় খোঁজ রাখে না কিন্তু কেবল নিজেদের দেশের নিন্দা ও কুৎসা করে আর না বুঝে-সুঝে হিন্দুর বিষয় নিয়ে চীৎকার করে। যত স্বদেশদ্রোহী আর নব-নব-কৌতূহল-বিলাসিনী নারীগণের দ্বারা এই দল পরিপুষ্ট। হিন্দুত্বের যে এখানে কি দুর্দশা—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। অথচ আমাদের দেশে হৈ চৈ পোড়ে গেছে যে, বিলেতে হিন্দুয়ানির আদর বাড়ছে।

উপ্সলার দার্শনিক সভা আমায় নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অনেক অধ্যাপক এই সভায় আসেন। এইরকম বলিতে বলিতে যদি কিছু ফল হয়। আগামী রবিবারে ঐ সভার অধিবেশন হবে।

উপ্সলার,

১১ই জুন, ১৯০৩

বিলাত-ফেরত সন্ন্যাসীর চিঠি

মহামায়ার কৃপায় আমি দেশে ফিরে এসেছি। বেঁচে গেছি, হাড় জুড়িয়েছে। কি আড়ষ্ট হোয়েই না বিলেতে থাকতে হোতো। সকাল বেলা বুটস্যুট এঁটে শয়ন-ঘর থেকে যে বেরুনো—আবার সেই শোবার সময় রাত্রিতে রাজ-সাজ খোলা। সমস্ত দিন মোজাবন্ধ কোমরবন্ধ গলাবন্ধ প্রভৃতি নানারূপ বন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। খাবার সময় যে একটু হাঁ করে খাবো তার যো নেই। আবার যদি খেতে খেতে আওয়াজ হয়—একটু সপ্-সপ্ চপ্-চপ্ মড়-মড় বা কট্ কট্—তা হোলে নিন্দার আর সীমা থাকে না। এখানে ঘরে এসে হাঁ করে খেয়ে বাঁচি। আর দধি-সন্দেশের হাপরানি-ধ্বনি প্রাণটাকে আবার মধুময় কোরে তুলেছে।

দেশে এসে বিশুদ্ধ বাঙালী খাওয়া খেতে বড়ই স্পৃহা হোয়েছিল। আমার ঘরদোর নাই, তবে গৃহস্থ বন্ধু-বান্ধবদের কৃপায় সব খেদ ঘুচে গেছে আহা সজ্‌নে সড়সড়ি কি মিষ্টি—যেন বিরহীর পুনর্মিলন সুখের আভাস পাওয়া যায়—

সজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।
আমার ডাক পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥

সজ্‌নে—বাস্তবিকই তুমি বিপদের বন্ধু। আবার লাউডগা-ভাতে —কচুর শাক, মোচার ঘণ্ট ও কচি আমড়ার টক খেয়ে মনে করেছি যে পারতপক্ষে বঙ্গমাতার কোল ছেড়ে আর কোথাও যাব না। বন্ধুদের কৃপা আমড়ার টকের চেয়েও ঢের বেশীদূর গড়িয়েছে। কাঁচাগোল্লা রসগোল্লা ক্ষীর পায়েস ইত্যাদি চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়ের দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করেছি। হা হতভাগ্য ইংরেজ, তোমার কপালে রসগোল্লা নেই, তাই ভেবে আমার ঘুম হয় না। তুমি হিন্দু দর্শন পড়িবে স্বীকার করেছ। কিন্তু তোমার আড়ষ্ট জিভ যদি কোনদিন জামাই-ভক্ত

রসগোল্লার রসে সাঁতার দেয়—তুমি বুঝতে পারবে যে আর্যজাতি কত মহৎ এবং কত রসিক।

দুই একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আমার বঙ্গবাসীর চিঠিতে কুরুচি আছে বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। কোন এক ভদ্রলোকের বাগানে একটি বকুল গাছ আছে। একটি ব্রাহ্ম প্রতিবাদ করেন যে ঐ অশ্লীল বৃক্ষটি রাখা উচিত নহে। ভদ্রলোকটি বলেন যে বকুল গাছের থাকা না থাকার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, কিন্তু ঐ বকুলে যে একটি অশ্লীল পাখী অর্থাৎ কোকিল এসে বসে তার উপায় কি। আমিও তদ্রূপ নিরুপায়। প্রণয় বিরহ বা রূপমধু-পান ইত্যাদি প্রয়োগ প্রবাসীর চিঠিতে অনিবার্য। যাহা হউক এখন তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে একটা আসল কথা বলি।

ইয়ুরোপীয়দিগের প্রায়ই এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতেছে যে, শ্বেতাঙ্গ জাতি মানবকুল-শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য জাতি—গৌর শ্যাম ও কৃষ্ণ—তাহাদিগের দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছে। এই প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা যেন একটা আসুরিক ভাব। ইহা পৃথিবীতে অনেক অমঙ্গল আনিয়াছে ও আনিবে। এই ভাব প্রবল হইলে ভারতের যে কী হানি হইবে তাহা প্রকাশ করা কঠিন। এই বিপদ কাটাইবার জন্য একটি উপায় অনেকদিন থোরে আমার মনে হইতেছে। যদি ভারত পুরাকালের ন্যায় আবার পৃথিবীর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়—যদি য়ুরোপ হোতে ছাত্রসকল ভারতবর্ষে দর্শন ন্যায় স্মৃতি সাহিত্য পাঠ করিতে আসে তাহা হইলে ভারতের প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের শ্রদ্ধা হইবে এবং ঐ আসুরিক ভাবের হ্রাস হইবে। ভারত যে এখনও জগতের গুরুস্থানীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে, তাই আজ অর্ধশিক্ষিত ইংরেজ ভারতবাসীদিগকে কাউপার (Cowper) ও পোপ (Pope) মুখস্থ করাইয়া সাহিত্য শিখাইতেছে ও মারটিনোর (Martineau) ব্যাখ্যা করিয়া দর্শন শাস্ত্র উপদেশ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর

কি আছে। এই আত্মবিস্মৃতি কিসে যায়? আমি ভাবিলাম আমাদের শাস্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয় তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে ও ইংরেজেরও মঙ্গল হইবে। তজ্জন্য বিলাত-যাত্রা করিয়াছিলাম। গিয়া দেখি মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের প্রয়াসে ভারতের কিছু সম্মান বাড়িয়াছে বটে—কিন্তু সে সম্মান না হওয়া ভাল ছিল। ইংরেজের ধারণা জন্মিয়াছে যে হিন্দুজাতি এক সময়ে বড় ছিল, কিন্তু এখন মরিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার ঠাটমাত্র বজায় আছে। যেমন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মিউজিয়মে কোন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের কঙ্কাল দেখিতে যান ও বিচার করেন যে, এই জীব কতদিন বাঁচিয়াছিল—কেনই বা এখন লোপ পাইয়াছে—তদ্রূপ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। আমরা এককালে বড় ছিলাম কিন্তু এখন সভ্যজগতের কাছে আমরা একটা কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু হোয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি এই সংস্কার দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে হিন্দুজাতি এখনও জীবন্ত। সহস্র সহস্র বৎসর হইয়া গিয়াছে তথাপি কালের প্রভাবে হিন্দু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। কত সভ্য জাতি ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে কিন্তু হিন্দুজাতি মরণকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। কত উৎপাত কত শোষণ কত বিপ্লব ভারতকে বিতাড়িত ও বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। অন্য কোন দেশ ভারতের ন্যায় প্রপীড়িত ও দলিত হইয়াছে কি না সন্দেহ, তবুও হিন্দু সপ্রাণ ও সতেজ। ইহার কারণ কি? বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বৈতজ্ঞান হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন ও চিরসহায়। হিন্দুর যোগ-দর্শন স্মৃতি-সাহিত্য বিধি-ব্যবস্থা আচার-ব্যবহার-সংস্কার অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট। অদ্বৈতমুখীন নিষ্কাম ধর্মপালনে হিন্দু রক্ষিত ও বর্ধিত হইয়াছে আমার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া কেমব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। হিন্দু দর্শন তথায় নিয়মিত

রূপে পঠিত ও আলোচিত হয়—এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি কমিটি গঠিত করিয়াছেন। একজন উপযুক্ত হিন্দু পণ্ডিত প্রেরিত হইলে এই কমিটি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহাকে তিন বৎসরের জন্য হিন্দু-দর্শনের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করাইবেন। নয় হাজার টাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে প্রদান করিতে হইবে। এই নয় হাজার টাকা অধ্যাপকের বেতন স্বরূপ—বার্ষিক তিন হাজার টাকা করিয়া তিন বৎসর দেওয়া হইবে। আছেন কি কোন মহাজন যে এই নয় হাজার টাকা দিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত? বিলাতে হিন্দুর দ্বারা হিন্দু-দর্শন অধ্যাপিত হইলে আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘুচিতে পারে ও ভারত যে সকল জাতির গুরু, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ আরম্ভ হইবে। কিন্তু যতদিন না ইয়ুরোপীয়েরা ভারতে হিন্দুর জ্ঞান ও ব্যবহার-শাস্ত্র শিখিতে আসে ততদিন আমার মন উঠিবে না। ভারতে এক বিশ্বজনীন সরস্বতীর পীঠস্থান কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার স্বপ্ন সদাই দেখি। স্বপ্ন যাহাতে সত্য হয় তাহার অল্প-স্বল্প আয়োজনও করিতেছি। তবে তাহা বীজবপন মাত্র। ফলের কথা অনেক দূর।

ইংরেজ যদি বেদান্তের অদ্বৈতবিজ্ঞান শিক্ষা করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের নিজের ধর্ম ও শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, আর তাহাদের সর্বনেশে আসুরিক ভাব দূর হইবে। এইরূপে তাহাদেরও মঙ্গল এবং আমাদেরও মঙ্গল সাধিত হইবে। বিলাত দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হোয়েছে যে সভ্যতা সামাজিকতা লৌকতা আচার-ব্যবহার—এই সকল বিষয়ে হিন্দুজাতি ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বড়। যে নব্য সংস্কারকেরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা দেখিয়া হিন্দুকে হীন মনে করেন তাঁহারা অত্যন্ত কৃপাপাত্র। আমাদের দেশে এক্ষণে যে অনাচার বা কুসংস্কার নাই তাহা নহে। আর ইংরেজের কাছে যে কিছু শিখিবার নাই তাহাও নহে। কিন্তু একথা প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুর আন্তরিক উদারতা ও উন্নত ভাবের নিকট ইংরেজের বাহ্য রঙ চঙ কিছুই নয়।

আমি বারমিংহাম্ নগরে একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের বাটীতে অতিথি হোয়েছিলাম। তাঁহার পত্নী বড় বিদুষী। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের দেশের কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বিদ্যার আদর কি প্রকার তা জানিতে বড়ই ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন। আমি বলিলাম যে, খুব নীচজাতি ছাড়া এমন হিন্দু নাই যাহারা অল্প-স্বল্প লিখিতে পড়িতে জানে না। কেন-না হিন্দুর বিদ্যাশিক্ষা ঋষি-ঋণ শোধ করিবার জন্য—নিজের গৌরবের জন্য নয়। আমাদের হাতে-খড়ি দেওয়া যে একটি ধর্মকার্য তাহা শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁরা বলিলেন যে, আমরা কত আইন-কানুন কোরেও এপ্রকার লেখাপড়ার প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা দাঁড় করাইতে পারি নাই। আমাদের পণ্ডিতদের উপাধি শুনিয়া তাঁরা বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর (Ocean of Learning)—ন্যায়বাচস্পতি (Lord of Wisdom in Logic)—তর্করত্ন (Jewel in Disputation) ইত্যাদি উপাধির কথা বোলেছিলাম। শেষ উপাধিটি শুনিয়া দার্শনিকের পত্নী বললেন—জন (দার্শনিকের ঐ নাম)—তুমি ভারি তার্কিক—তুমি তর্করত্ন উপাধিটি গ্রহণ কর। বাস্তবিক সেদিন কবে আসবে—যেদিন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের কাছ থেকে উপাধি পেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

ইংরেজের পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। আমি উক্তপারে দিন কতকের জন্য এক বাসায় ছিলাম। একটি বৃদ্ধা ও তাহার কন্যা সেই বাসাটি রেখেছে। তারা সমস্তদিন দাস্যবৃত্তি কোরে আপনাদের ভরণপোষণ করে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধার পুত্র একটি জাহাজের কাপ্তেন—বেশ দু-পয়সা পায়। কিন্তু সে নিজে ভদ্রলোকের মত থাকে ও সব টাকা খরচ করে। মা ও ভগ্নী যেমন দাসী তেমনই আছে। বেশ-বিলাসের খরচ কমাইয়া মা ও ভগ্নীকে যে কোন রকম আর্থিক সাহায্য করা উচিত সে ভাবনা কাপ্তেন বাবুর মনেই হয় না। ইংরেজ-সমাজের চক্ষে এরূপ ব্যবহার কিছু

অন্যায় বোলে বোধ হয় না। এরকম ব্যাপার আকছার দেখা যায়। ছেলে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে, আর বাপ-মা দাস্যবৃত্তি কোরে জীবিকা নির্বাহ কোচ্চে। বাপ-মার সঙ্গে যখন এইরূপ সম্বন্ধ তখন অপর অপর কুটুম্বদের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকের সম্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে কিরকম হয় তাহা ইংরেজদের হিন্দু-জাতির কাছে ভাল কোরে শেখা দরকার। কিন্তু উল্টাস্রী দাঁড়িয়েছে। নব্য বাবু-সংস্কারকেরা বলেন যে, আমাদের ঐ বিষয় ইংরেজের কাছে শেখা উচিত। ইংরেজের কাছে স্ত্রীলোকের আদর শিখতে গিয়ে সংস্কারকেরা কি বিপদই যে ঘটাইয়াছেন তা অনেকেরই জানা আছে। স্ত্রীলোকের আদর বলিলে—ইংরেজের কাছে কেবল নিজের পত্নীর আদর বোঝায়—মা বোন ভাজ ভাইঝি বা অন্য কোন কুটুম্বিনীর বোঝায় না। তারা মরুক বাঁচুক আর ভিক্ষা করুক তাতে আমার কি। এইরূপ শিক্ষা ইংরেজের কাছে পাওয়া যায়।

ইংরেজের সভ্যতা, আচার ব্যবহার ও শীলের কথা পরে আরও লিখিব। এখন একটা কথা বোলে চিঠিটা শেষ করি।

আমি একদিনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ স্টেড্ সাহেবের (Mr. Stead) অতিথি হোয়েছিলাম। তাঁহার আপিসে একটি সভা হয়, সেখানে আমি বক্তৃতা করি। মিস্টার স্টেড্ আমার সঙ্গে অনেক গল্পগাছা করেন। তিনি বোল্লেন যে, তাঁর একটি ডবল (Double) আছে অর্থাৎ তাঁহার শরীর হইতে হুবহু আর একটি স্টেড্ সাহেব বাহির হয়। এই ডবলটি যথেচ্ছ বিচরণ করে। তিনি বোল্লেন যে, একবার তাঁর কোন এক রমণী বন্ধুর জ্বর (Influenza) হয়। সেই ডবল—তাঁহাকে তিন দিন তিন রাত সেবা করে। ঐ রমণী সুস্থ হোয়ে মিস্টার স্টেড্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে আসে। স্টেড্ সাহেব একেবারে অবাক্। তিনি ঐ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এইরূপে এই ডবলটি অবাধ্য ছেলের মত যেখানে খুশী ঘুরে বেড়ায়। আমার শুনে পিলে চম্‌কে গেল। স্টেড্ সাহেব কি আনন্দে একবার

ঘর থেকে বাহিরে গিয়েছিলেন। তার পর যখন ঘুরে ঢুকছেন আমার তারি আতঙ্ক হোলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি আসছেন, না আপনার ডবল আসছেন। তিনি হেসে বোল্লেন—আমি—আমার ডবল নহি। আমি আবার ভয়ে ভয়ে বলিলাম, কি করে জানবো। তিনি উত্তরে বলিলেন যে, আমার চুল পাকা আর আমি চুরুট খাই কিন্তু আমার ডবলের চুল পাকা নহে, আর সে চুরুটও খায় না। আরও যে কতরকম ভূতুড়ে গল্প করিলেন তাহা লিখিলে বঙ্গবাসী ভোরে যায়। আমি ত সকাল বেলাই চম্পট দিলাম। আর ভূতের ভয়ে তাঁর সঙ্গে বড় একটা দেখাশুনা করিনি, আর কোন সম্পর্কও রাখিনি। তবে তিনি আমাদের দেশের বন্ধু। আসিবার সময় দেখা করে এসেছিলাম। তিনি কেমব্রিজের কমিটির কথা আগেই শুনেছিলেন। অত্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ প্রকাশ করলেন। ইতি। তারিখ—

৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতা

আমার ভারত উদ্ধার

যখন আমার বয়স চৌদ্দ পনরো, তখন সুরেন বাঁড়ুজ্যে একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ করেন। কালী বাঁড়ুজ্যে, আনন্দমোহন বসুও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। লেকচারে লেকচারে দেশ মাতিয়া উঠিল। আমার ত খাওয়া-দাওয়া নাই; শ্যামের বাঁশী শুনিয়া যেমন গোপীজন উন্মত্ত—আমিও তদ্বৎ। আমার পিতামহী বলিতেন—নেকচারেই দেশটাকে খেলে।

লেকচার না শুনিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত—কিন্তু লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া যখন বাড়ি ফিরিতাম তখন মনে হইত—প্রাণটা যেন খালি খালি—ভরে নাই। এই রকমে বৎসর দুই কাটিয়া গেল—এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কালেজে উঠিলাম। তখন বয়স সতরো বৎসর। ঐ কাঁচা বয়সে প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করিতে লাগিল। সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে ভারত উদ্ধার করা—কিছুতেই পোষাইবে না—মনে হইতে লাগিল। ছেলেমানুষ—সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে মনে মিলে না—বলিলেই ত লোকে জ্যাঠা বলিয়া উড়াইয়া দিত। একদিন প্রাণের আবেগে ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি তখন মট্‌স লেনে রাজা শ্রীযুত সুবোধ মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাটিতে থাকিতেন। তিনি আমায় চিনতেন না। কিন্তু আমার পিতৃব্যদেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু বলিয়া—আমার সহিত তিনি খুব হৃদয় খুলিয়া কথা কহিলেন। পরিচয়ের পরই আমি তাঁহাকে হুম্ করিয়া বলিলাম—Not through pen but through sword—অর্থাৎ কলমবাজিতে হইবে না, তলোয়ারবাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে। প্রথমে তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন—চুপ চুপ—ঐ যে—উনি সরকারী কর্মচারী বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর ভগবানবাবু ডেপুটী সেইখানে বসিয়াছিলেন। তারপর তিনি ধীরে

ধীরে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে মানবজাতি আর তত বর্বর নাই—এখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে—বিশেষতঃ ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার দূতস্বরূপ (apostle)—তাই এ কালে বৈধ আন্দোলনই (constitutional agitation) যথেষ্ট, পাশবশক্তি প্রয়োগের আর অবকাশ নাই।—আমি ত এই কথা শুনিয়াই অস্থির হইয়া উঠিলাম। যত শীঘ্র পারিলাম বিদায় লইয়া বাটী আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি করি, কোথায় যাই ?

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া—জল্পনা কল্পনা করিয়া স্থির করিলাম, —গোয়ালিয়রে গিয়া সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব। চারিজন বন্ধু জুটিলাম। আমার টাকাকড়ি কিছুই ছিল না। দুই মাসের কালেজের মাহিনা মাত্র দশ টাকা সম্বল। আর তিনজন বন্ধুরও তথৈব চ, তবে আমার অপেক্ষা কিছু ভাল। ঐ অল্প টাকা লইয়া, বাড়ি হইতে পলাইয়া রেলে উঠিলাম। যা পয়সা ছিল তাহাতে ইটাওয়া ইস্টিশান পর্যন্ত চারিজনের যাওয়া চলে। ইটাওয়ায় অবতরণ করায় শুনা গেল যে, সেখান হইতে গোয়ালিয়র ছত্রিশ ক্রোশ দূর। প্রাণের আবেগ এত যে কোন বাধা-বিঘ্নতে মন দমে না। একরাত্রি ইটাওয়া থাকিয়া আমরা গোয়ালিয়র রওনা হইলাম। আমাদের—গোয়ালিয়র যাত্রার মত সুখের যাত্রা—আর কাহারও বোধ হয় কখনও কপালে হয় নাই।

গ্রীষ্মকাল—সকাল বেলা—পাঁচটা বাজিয়াছে। চারিজন বাঙালী যুবক—বয়স সতরো কি আঠারো ভারত উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে চারিটি কি পাঁচটি করিয়া টাকা আছে কিন্তু—মনে মনে সিংহবল। প্রথমেই যমুনা পার হইতে হইল। তার পরে অনেক দূর হাঁটিয়া গিয়া চম্বল নদী পাইলাম। চম্বল পার হইয়া আরও কিছু দূরে গিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া—একটি বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। আমরা পরামর্শ করিলাম যে—দিনের বেলায় বিশ্রাম

করিব ও রাত্রিতে হাঁটিব। এইরূপ মনে করিয়া সেই গাছতলায় চারিজনে শুইয়া বসিয়া রহিলাম। সঙ্গে কিছু খাবার ছিল না—তেপান্তর মাঠ—বালি আর কণ্টক-গুল্মে ভরা। একটা বোতলে আধ পোয়াটাক ছোলা ভিজান ছিল—তাই চর্বণ করিয়া আত্মারামকে তৃপ্ত করিতে লাগিলাম। আর কিছু ছাতু ও গুড় ছিল—তাহাও কোন রকমে গলাধঃকরণ করিলাম। এইরূপে বসিয়া আছি—এমন সময় দেখি যে একদল হিন্দুস্থানী সেই পথ দিয়া যাইতেছে। উহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা কোথায় যাইবেন? আমরা বলিলাম—গোয়ালিয়র। সে বলিল—আমরা গোয়ালিয়র মহারাজের সিপাহী—ছুটির পর পুনরায় গোয়ালিয়র যাইতেছি—আসুন—আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা বলিলাম—বড় রৌদ্র, রাত্রিতে পথ চলিব। সে হাসিয়া বলিল—এ দেশে রাত্রিতে পথে ভয় আছে, দিনমানেই যাওয়া ভাল। এই কথা শুনিয়া আমরা তল্পিতল্পা লইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। রাস্তা আর ফুরায় না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—তবুও সিপাহীরা চলিতেছে; আর আমরা সিপাহী নহি—কিন্তু সিপাহী হইব—এই ভাবনায় ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সময়—সিপাহীরা বড় রাস্তা ছাড়িয়া মাঠ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। আমাদের মনে শঙ্কা হইল—এরাই ত ডাকাত নয়। আমাদের মধ্যে আমি ও আর একজন বলশালী ছিলাম। আমরা দুইজন আগে আর আমাদের পিছনে—আর দুইজন বন্ধু রহিল। আমরা আর তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া চলিলাম না। একটু সরিয়া সরিয়া চলিতে লাগিলাম—খুব সতর্ক—যদি চড়াও করে ত আটক করিব। এইরূপ ভয়ে ভয়ে কিছুদূর গিয়া শেষে দেখি যে—সিপাহীরা একটি গ্রামে গিয়া পঁহুছিল। তখন আমাদের সকল শঙ্কা দূর হইল। দেখি যে এক প্রকাণ্ড কেল্লা—কেল্লার চতুর্দিকে ঐ গ্রামটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কী যোগাযোগ—কী আনন্দ। সঙ্গের সঙ্গী সিপাহী—আর আশ্রয় দুর্গতল। কোথায় গেল ভাবনা চিন্তা—

কোথায় গেল ভয়! ঠিক্ যেমন রণডঙ্কা শুনিয়া যুদ্ধের ঘোড়া তালে তালে পা ফেলে, সেই রকম প্রাণটাও তালে তালে নাচিয়া উঠিল।

কেল্লাটির নাম গোহদ। গ্রামের নামও গোহদ। গোহদে সে রাত্রিতে কিছুই পাওয়া গেল না—কেবল মহিষের দুধের ডেলা ক্ষীর। তাহাই কিছু কিছু খাইয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে হাত মুখ ধুইয়াই আবার রওয়ানা। বেলা দশটা আন্দাজ একটি গ্রামে পঁহুছিয়া স্নানাহারের যোগাড় করা গেল। সিপাহীরা খুব মোটা মোটা চপাটি আর একটু পুদিনার চাট্‌নি দিল। উহাই ক্ষুধার চোটে খাইয়া আরাম করিতে লাগিলাম। আবার বেলা চারিটা না বাজিতে বাজিতে সিপাহীরা উঠিল। আমরাও তৈয়ার। আমাদের সঙ্গে একটি মুটিয়া তল্পিদার ছিল। সে বলিল যে, সে আর চলিতে পারে না। কাজেই তাহাকে বিদায় দিয়া, আমরা নিজেরা আমাদের মোট ঘাড়ে করিলাম। কী বাহার—কী বাহার! কবে এই বাঙলা দেশের সহস্র সহস্র যুবক তোজদান বন্দুক ঘাড়ে করিয়া রণক্ষেত্রে কুচ করিবে। ঐ মোট ঘাড়ে করিয়া বেগবতী পাহাড়িয়া নদী সকল পার হইলাম। অবশেষে সন্ধ্যা আসিল—চাঁদ উঠিল। ঝুর্‌ঝুর্ দক্ষিণে বাতাস—মাঠভরা জ্যোৎস্না—আবার মাঝে মাঝে বিলোল কটাক্ষ হরিণের পাল—প্রাণে কি আর প্রাণ থাকে। আমাদের মধ্যে একজন সুকণ্ঠগায়ক ছিলেন, তিনি গাহিলেন—

"কত কাল পরে বল ভারত রে
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।"

আমাদের আশার আগুন দশগুণ জ্বলিয়া উঠিল—মরমে মরমে বেদনার সাড় হইল। এই প্রকারে ছাতু চনা চপাটি খাইয়া—শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে আনন্দে বেদনায় আমরা অবশেষে গোয়ালিয়রে পঁহুছিলাম। খাস গোয়ালিয়রকে লস্কর বলে। সিন্ধিয়া মহারাজের উহা রাজধানী। রাজধানীর এক ক্রোশের মধ্যেই ইংরেজের একটি ছাউনি

আছে। উহাকে বলে—মুরার। ঐ মুরারে গিয়া আমরা প্রথমে একটি সরায়ে নামি। তার পরদিন খবর পাইয়া বাঙালী বাবুরা একটি কালীবাড়িতে আমাদের বাসা করিয়া দেন। পাঁচ-সাত দিন সেইখানে থাকি ও লক্ষ্ণৌ যাতায়াত করি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজনের পিতা আসিয়া উপস্থিত। তিনি একজন পুলিশ বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। কেমন করিয়া যে তিনি খবর পাইলেন—তাই ভাবিয়া আমরা অবাক্। শেষে বুঝিলাম, আমরা আমাদের একজন বন্ধুকে দেশে চিঠি লিখিয়াছিলাম—সেই চিঠি ধরিয়া তিনি ঠিকানা বাহির করিয়াছেন। যাহা হউক আর নিস্তার নাই। আমি ও আর একজন—ইংরেজের ছাউনি হইতে লক্ষ্ণৌ পলাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমাদের বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে আমরা নাবালক—আমরা যেখানে যাই সেইখান হইতেই আমাদের ধরিয়া আনা হইবে। অগত্যা আমাদের অল্প বয়সকে ধিকার দিয়া পলাইবার আয়োজন বন্ধ করিলাম। আর তিন-চারি দিনের মধ্যেই দেশে ফিরিয়া আসিলাম। বাড়িতে আমাকে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি করিয়া দিল।

তখন বিদ্যাসাগর কলেজে সুরেনবাবু প্রোফেসার। তাঁর ইংরেজি পড়ানো শুনিবার জন্য কেলাসে ছেলে আর ধরে না—সকলেই উদ্গ্রীব—আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। মন এমনি খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে খুব সিদ্ধি খাইতে শুরু করিলাম। এত সিদ্ধি খাইতাম যে কালেজেও নেশার ঝোঁক যাইত না। আমার বেশ মনে আছে—একদিন সুরেনবাবু পড়াইতেছিলেন আর আমি বহির গাদা আড়াল দিয়া নিদ্রা দিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের পাঠ্যপুস্তকের কোন বিশেষ সংস্করণ দেখিবার জন্য সুরেনবাবুর প্রয়োজন হয়। ঐ সংস্করণ আমার কাছে ছিল। কে একজন বলিয়া দিল যে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। তখন সুরেনবাবু বলিলেন, আমি মানুষটিকে চাহি না—মানুষটির বইখানি চাই।—

ইহাতেই বুঝা যাইবে—আমার মনের গতিক কি রকম ছিল। তারপরে সিদ্ধি ছাড়িয়া দিলাম। সেই যে ছাড়িলাম আর কখনও খাই নাই। মনটাকে স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—আবার গোয়ালিয়র যাইব, যোদ্ধা হইব—সুরেন বাঁড়ুজ্যের বৈধ আন্দোলন ছাড়িয়া, তরবারির চমকে দিগ্‌দিগন্ত ঝলসাইয়া তুলিব—ফিরিঙ্গিকে চমকাইয়া দিব।

অনেকে বলিতে পারেন—ইহা যে বিদ্রোহের কথা, বলিলে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তা কি করিব। সুকুমার বয়সে যাহা আপনা আপনি মনে হইত—তাহা বলিলে যদি ফিরিঙ্গি ভয় পায় ও ভয় পাইয়া মানব-হৃদয়ের ইতিহাসকে চাপিয়া দিতে চায় ত দিক, তাহাতে কি ক্ষতি। সত্য চাপা দিতে গেলে নিজেই চাপা পড়িবে।

যাহা হউক আবার এক বৎসরের মধ্যে কালেজের পড়াশুনা ছাড়িয়া পুনরায় গোয়ালিয়র যাই। এ কথা বারান্তরে বলিব—অনেক মজার কথা আছে।

দুই

আমি বিদ্যাসাগরের কালেজে এফ-এ কেলাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। পড়া খুব ভাল হয়। সুরেন বাঁড়ুজ্যে, প্রসন্ন লাহিড়ী, নবীন পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়ান। কালেজ খুব জমজমাট—আমার মন কেমন উধাও। সুরেন বাঁড়ুজ্যের লেকচার শুনিয়া—দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছি—নিজের ভাবনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা বড়ই মিষ্ট লাগে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে তাঁহার লেকচারে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—তোমাদের মধ্যে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি কে হবে?—আমরা উৎসাহে হাততালি দিয়া বলিতাম—সকলে সকলে (all all)। এমনি আমার প্রাণটা পুরিয়া উঠিয়াছিল যে আমি

মনে মনে স্থির করিলাম—বিবাহ করিব না—বি-এ, এম্-এ পাস করিব না—প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।

প্রাণের আবেগে কালেজ ছাড়িয়া আবার গোয়ালিয়রে গেলাম। এবার সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা ছিল। একেবারে আগ্রার টিকিট লইলাম। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর—উনিশে পড়ি পড়ি। চলিয়া যাইবার সময় একটু কষ্ট হইয়াছিল—চোখটা ভিজা ভিজা ঠেকিয়াছিল।

আগ্রায় পঁহুছিয়া তখনই ধোলপুরের টিকিট লইলাম। আগ্রায় আমার এক কাকা কাজ করিতেন—বড় ভয়, পাছে আমায় ধরিয়া ফেলেন। ধোলপুরে গিয়া উমাচরণবাবুর বাড়িতে নামিলাম। তিনি ধোলপুরে রাণার মাস্টার, সেখানে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি। তিনিই বুঝি পরে পণ্ডিতা রমাবাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, হাসিলেন—বোধ হয় পাগলাটে মনে করিলেন। যুদ্ধবিদ্যা শিখিব—দেশ স্বাধীন করিব—ও কি কথা! স্বাধীনতার কথা শুনিলে, আজ ত্রিশ বৎসর পরেও ভূপেন্দ্রবাবুর মত লোকেরা শুধু যে হাসেন তাহা নয়—ফিরিঙ্গিদের গাঁটছড়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাঁহারা বড়ই নারাজ। যাহা হউক পাগলাটে বলিয়া খাতির যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই। রাত্রিতে মটন রাঁধা হইল। তখন আমি মাছমাংস প্রায় পাঁচ বছর ছাড়িয়া দিয়াছি—মটন কি করিয়া খাই। কিন্তু খাইব না বলিতে বড়ই লজ্জা করিল। যুদ্ধ শিখিতে যাইতেছি—অথচ মাংস খাই না—সুরে যেন মিলে না। তাই লজ্জায় পড়িয়া পুরা বাটি পার করিলাম—আবার চাহিয়া লইলাম। খাইতে খাইতে পূর্বাস্বাদ জাগিয়া উঠিল—মন্দ লাগিল না। এই মাংস খাওয়ার পরে আর কখনও মাছমাংস খাই নাই। আর এখন বুড়া হইতে চলিলাম—বয়স সাতচল্লিশ হইয়াছে, মাংস খাবার লোভ আর নাই। সেই রাত্রিতে রাণার বাড়ি নাচ। উমাচরণবাবু আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আমি যাইলাম না।

মনে করিলাম— যে ভারত উদ্ধারের ভার লইয়াছে সে নাচ-তামাসা দেখে না।

ধোলপুর হইতে তখন গোয়ালিয়রে রেল হয় নাই। আঠার ক্রোশ রাস্তা—ঘোড়ার বা উটের গাড়িতে যাইতে হইত। ঘোড়ার গাড়ির অনেক ভাড়া—তাই আমি উটের গাড়িতে চড়িলাম। উটের গাড়িগুলি দোতলা। আমি উপর তলায় জায়গা লইলাম। রাত্রি দশটা আন্দাজ গাড়ি ছাড়িল। উটের জুড়ি ছুটিল,—গাড়িও বেগে চলিল—কিন্তু প্রাণ যায় যায়। এম্‌নি হেঁচকা টান যে দম বাহির হইয়া যায়। ভারত উদ্ধারের গোড়াতেই হেঁচ্‌কা টান। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সহিয়া গেল—উঠিয়া বসিলাম।

সেই উটের গাড়িতে বসিয়া বসিয়া আঠার বৎসরের বাঙালী যুবকের মনে কতই না আশার কল্পনা জাগিতে লাগিল। চম্বল নদী পার হইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য পড়িল। চারিদিকে বিজন প্রান্তর—মেটে মেটে পাহাড় ও গুল্মের ঝোপে পরিপূর্ণ। মনে হইতে লাগিল—কবে এই প্রান্তর মারাঠা অশ্বারোহীতে ছাইয়া পড়িবে, আর অশ্বারোহণে সেনাদল চালনা করিব। ঐ যে দূতেরা আসিয়া খবর দিল—শত্রুদল। তাদের বড় বড় কামান, তোপ লইয়া আসিতেছে। আমি অমনি পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে হুকুম দিলাম—রাস্তার এক মাইল দূরে লুকাইয়া থাকিয়া যেন পাহারা দেয়। শত্রুর চর দেখিলেই যেন তীরের দ্বারা তাহাকে ঘাল করে—বন্দুকের আওয়াজ না হয়। দুশমনেরা যেন মনে করে যে—প্রান্তরে জনপ্রাণীও নাই। আর এক হাজার সওয়ার লইয়া—পাঁচ শত পাঁচ শত করিয়া আগু-পিছু এক ক্রোশ ব্যবধানে ঘাঁটি বাঁধিলাম। আর আমি মাঝখানে এক সহস্র সেনা লইয়া আড্ডা গাড়িলাম। শত্রু আসিল—দুই হাজার বন্দুক, পাঁচ সাত শত সওয়ার ছয়টা বড় বড় কামান। প্রথম ঘাঁটি তাহারা পার হইল। মাঝের ঘাঁটির কাছে যাই তোপখানা আসিল—অমনি কামানের ঘোড়া আর গোলন্দাজগুলা ধরাশায়ী। একটিও বেশী গুলি ছাড়িতে হইল না, যে

কয়টি ঘোড়া, আর যে কয়জন গোলন্দাজ, ততগুলি আওয়াজ হইল। একটি অধিক নয়—একটি কম নয়। তারপরে এক মিনিটের মধ্যেই একবারে গুলিবৃষ্টি—আগু-পিছু মাঝখান হইতে—একেবারে আগুন ছুটিতে লাগিল। তীরন্দাজরাও খুব কাজ করিল। যত বড় বড় পালকওয়ালা টুপি-পরা জাঁদরেলদের টুপ্ টুপ্ করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপরে—একেবারে রণ্ রণ্ ব্যাপার। সে যে তলোয়ারের চক্‌মকানি—দুশমন একেবারে কচুকাটা হইয়া গেল। কল্পনায়—এই রকম কতই ছবি আঁকিতে লাগিলাম। এখনও উহা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এইরূপ মানস-সৃষ্টির আনন্দে উটের গাড়িতে বসিয়া চলিলাম; চোখে একটুও ঘুম নাই। তখন 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'বঙ্গবিজেতা'র কাহিনীতে মন ভরিয়াছিল। মনে হইতে লাগিল—যেন অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টিতে অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়া চলিতেছি—কত বিপদে পড়িতেছি, শত্রু নিপাত করিতেছি।—অনেক রকম ছবি দেখিলাম, তবে কোন তিলোত্তমা আবিষ্কার করি নাই বা কোন সরলাকে দেখিবার জন্য ঘাটে নৌকা লাগাই নাই। ঐটুকু কঠোরতা আমার ভারত উদ্ধারে আছে। ঐ নির্মমতা, এই বুড়া বয়সেও আমাকে ছাড়ে নাই।

শেষে প্রভাত হইল—নিদ্রা আসিল। একটু বেলা হইয়াছে আর চালক বলিল—উঠো, গোয়ালিয়র আগেয়া। ধড়মড়িয়া উঠিয়া আমি তল্পিতল্পা লইয়া নামিলাম—কোথায় যাইব ঠিক নাই। বাঙালী বাবুদের কাছে যাইব না—আগেই স্থির করিয়াছিলাম। গোয়ালিয়র শহরকে লস্কর বলে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। লস্করের বড় রাস্তা দিয়া আনমনে যাইতেছি, এমন সময় একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ—তাজা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি চাকুরি করিবেন কি?—একজন সর্দারের ছেলেকে পড়াইতে হইবে। আমি বলিলাম—আপনার ত আমার সঙ্গে পরিচয় নাই, হঠাৎ এই প্রস্তাব কেন করিলেন? তিনি বলিলেন, পরিচয়ের প্রয়োজন নাই—বাঙালী

বাবুরা ভারি ইংরেজী জানে। আমি ত হাতে চাঁদ পাইলাম। তিনি তখনি আমাকে সর্দারের বাড়িতে লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি ও বাগান। চাকরে একটি গভীর ইঁদারা (কূপ) হইতে সুশীতল জল তুলিতেছে। প্রাণ ভরিয়া স্নান করিলাম ও বাজারে গিয়া পুরী, তরকারী, মিঠাই খাইয়া আসিলাম। পরে সর্দারের সঙ্গে দেখা হইল। ত্রিশ টাকা মাইনা ঠিক হইল। ছেলেটি বড় ছোট। কিন্তু একটি বড় কঠিন শর্ত আমার স্কন্ধে চাপানো হইল। বাটির বাহিরে যাইবার হুকুম নাই—কেবল ছেলেকে লইয়া বৈকালে বেড়াইতে যাইতে হইবে। দিন পাঁচ সাত কাজ করিলাম—সর্দার খুব খুশি। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইল। ভাবগতিকে বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার সঙ্গে মহারাজের বড় প্রীতি নাই। একটি জিনিস দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহার বাড়িতে অনেকগুলি মুর্গী চরে। এদিকে সর্দার সাহেব শিবপূজা করেন ও খুব ফোঁটা কাটেন। আমি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমরা যে যোদ্ধা। আমি ত অবাক্। পরে জানিলাম—ব্রাহ্মণেতর মারাঠারা মুর্গী খায়। সর্দারের বাড়িতে বেশ সুখ শান্তি বটে, কিন্তু আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। বন্দীর মত থাকা আমার অসহ্য হইল। সর্দারের কাজ ছাড়িয়া দিলাম। আমার প্রথম পরিচিত মারাঠী ব্রাহ্মণের সাহায্যে—শহরের একঘর ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় পাইলাম। এই গৃহস্থের নাম বলবন্ত রাও। বলবন্ত রাও রাজসরকারে মুন্সীর কাজ করেন—বয়স আন্দাজ পঁচিশ বৎসর। বাটীতে মা ঠাকরুন আছেন ও তাঁহার স্ত্রী—ছেলেপিলে নাই। ইনি ইংরেজি অল্প অল্প জানেন—আমার কাছে ইংরেজি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি এগার বৎসর ইংরেজি পড়িয়াছি শুনিয়া ইঁহারা আমাকে ইংরেজি সাহিত্যে একজন দিগ্‌গজ মনে করিতে লাগিলেন। শহরে আমার নাম হইতে লাগিল। অনেক ব্রাহ্মণ ইংরেজি শিখিবার

জন্ত—তাঁহার বাটীতে রাত্রিবেলায় আসিয়া জুটিতেন। বেশ একটি জমাট বাঁধিল। ছোট ছোট ব্রাহ্মণের ছেলেদের জন্ত—পাড়ায় একটা স্কুল খুলিলাম। ব্রাহ্মণের ছেলেদের নিকট বেতন লইতাম না। একটি সদাগরের ছেলেকে পড়াইয়া টাকা দশেক রোজগার করিতাম। তাহাতেই আমার এক রকম চলিয়া যাইত। দুই বেলাই ময়রার দোকানে গিয়া পুরী, দই, বরফি খাইতাম। লস্কর শহরে একজন বাঙালীবাবু ছিলেন। তিনি একজন ঠিকাদার। তাঁর দুপয়সা বেশ উপার্জন ছিল। পুরী খাইয়া খাইয়া জিব আড়ষ্ট হইয়া গেলে—তাঁর বাড়িতে এক এক দিন ভাত খাইয়া আসিতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু যাহার জন্য গিয়াছিলাম, তখন পর্যন্ত তাহার কিছুই করিতে পারি নাই।

দিন পনরো কাটিয়া গেলে—আমি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দেখা হইল। আমি বলিলাম—আমাকে সৈনিক করিয়া লউন। তিনি বলিলেন যে, তিনি নামে সেনাপতি বটে কিন্তু তাঁহার একটুও ক্ষমতা নাই। সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার অগাধ ভক্তি জন্মিল। কী সৌম্য মূর্তি! সৌম্যতা শিষ্টতার ভিতরে এক অপূর্ব অগ্নিময় তেজ সঞ্চারিত হইতেছিল। চোখ দুটি যেন বহ্নিজ্বালা। সেনাপতির সরল বিনীত কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম—মর্মাহত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সেনাপতির কোন ক্ষমতা নাই কেন। একবার গোয়ালিয়রে দৃশ্য-যুদ্ধ (mock fight) হয়। জয়াজী রাও মহারাজ—বর্তমান মহারাজের পিতা এক পক্ষে—আর সেনাপতি আর এক পক্ষে। ঐ দৃশ্য-যুদ্ধের উপলক্ষে মহা সমারোহ হয়। বড় বড় ফিরিঙ্গি সেনাপতি—ঐ যুদ্ধ দেখিতে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের রঙ্গ চলিতে থাকে—দুইজনেই বীর—রণ-কৌশলী। অবশেষে সেনাপতি—মহারাজকে বেষ্টন করিয়া ফেলেন। মহারাজ ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল। তখন মহারাজ হুকুম

করিলেন যে, তাঁর খানা আসিবার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া হউক। সেনাপতি বলিয়া পাঠাইলেন, খানা যাইতে দিব না—মহারাজ যদি পরাজয় স্বীকার করেন ত খানা পাইবেন। মহারাজকে অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সেই অবধি মহারাজের ক্রোধ সেনাপতির উপর পড়িল—তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা কড়িয়া লওয়া হইল।

সেনাপতির বিষয়ে আর একটি কথা বলি। আমরা রাত্রিবেলায় ছাদে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় ভেরী বাজিয়া উঠিল। ভেরীর উপর ভেরী—কিছুই বুঝা গেল না। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক মশাল হাতে করিয়া আসিতে লাগিল। ব্যাপার কি? না, জয়াজী রাও মহারাজ স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে ছাউনিতে গিয়াই দেখেন যে, সেনাপতি তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত। মহারাজ ছাউনি পরিদর্শন করিলেন আর বলিলেন—আমার রাজ্যে একজন মানুষ আছে—ঐ আমার সেনাপতি। সেনাপতির ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যাঁহাকে সেনার ভার দেওয়া হইয়াছিল তাঁহার নাম—শামসের খাঁ। তিনি অল্পবয়স্ক—কিন্তু ঘোর বিলাসী। পরদিন ছাউনিতে ঢেঁট্‌রা দেওয়া হইল যে—সকলেই হাজির ছিল, কেবল শামসের খাঁ গরহাজির। সেনাপতির সম্মান করা হইল বটে কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না। রাজ-সরকারে তখন কুচক্রীদের প্রতাপ॥

বাংলার পাল-পার্বণ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব

বিংশতি কোটি হিন্দুসন্তান আজ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কৃষ্ণভাবের ভাবুক। আমাদের আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধন—সমস্তই কৃষ্ণপ্রচারিত নিবৃত্তিমার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণবদনকমল হইতে যে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইয়াছে উহাই এই ঘোর কলিযুগে হিন্দুজাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কত বিপদ কত বিপ্লব কত ঘাত কত প্রতিঘাত—কিন্তু হিন্দুজাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই—কৃষ্ণপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অমৃততত্ত্ব প্রচার করেন তাহা জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুজাতির জ্ঞান ভক্তি ধর্ম কর্ম ও সমাজকে নূতন তেজ নূতন শক্তি নূতন গৌরব প্রদান করিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া যত ধর্মান্দোলন হইয়াছে উহা সমস্তই সেই কৃষ্ণপাদপদ্মপ্রসূত জ্ঞানগঙ্গার বীচিবিক্ষোভ মাত্র। এইরূপ সুদূরব্যাপী যুগপ্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না।

পুরাতন যুগের অন্তে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্মসংস্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই আমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া অনেকে মানেন বটে, কিন্তু তিনি যে আমাদের নূতন জীবনের মূল—এ তথ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। হিন্দুর জীবন্ত, বহন্ত ইতিহাস তাঁহারই শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারই শিক্ষা তাঁহারই ধর্ম তাঁহারই আদর্শ হিন্দুর জ্ঞান ও সভ্যতাকে ক্রমবিকশিত করিয়া ভারতকে পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কি দুর্দশাগ্রস্তই না হইয়াছি। ক্ষুদ্র তড়াগের ন্যায় আজ আমরা অল্পপ্রাণ। তড়াগ অল্পতোয়া—সঙ্কীর্ণ গর্তে অবস্থিত নিদাঘজ্বালায় সহজে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু

আপূর্যমাণা ভাগীরথী হিমালয়ের সলিলগাম্ভীর্য হইতে প্রসূতা ও জীবন্ত স্রোতের দ্বারা অবিরত পরিপুষ্টা। প্রখর করমালা উহাকে নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায় আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংবিন্দুগুলিকে কৃষ্ণচরণবিনির্গত জাতীয়-জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। হিন্দুর ঐতিহাসিক পারম্পর্য শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে প্রসূত। আইস—এই জন্মাষ্টমীর দিনে সেই পারম্পর্য স্বীকার করিয়া সকলে কৃষ্ণপদকল্পতরুমূলে অভেদসূত্রে এক হই। সেই দিনে ভারতের জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতার অধীনতা স্বীকার করিব—যত ঋষি মুনি হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের আশীর্বাদ লাভ করিব—যত অদ্বৈতাচার্য ভারতকে অলংকৃত করিয়াছেন তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব—যত শূরবীর হিন্দুস্থানকে যশঃসৌরভে আমোদিত করিয়াছেন তাঁহাদের তেজে অনুপ্রাণিত হইব—সেই শুভদিনে সকল মহাজনের অমরপরম্পরায় আপনাদিগকে মিশাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে এক ভারতব্যাপী যুগব্যাপী নিবেদন অর্পণ করিব। শ্রীকৃষ্ণেই হিন্দুর নূতন জীবনের প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণ ছাড়িয়া দিলে ক্রমভঙ্গ হইবে—শুকাইয়া মরিয়া যাইতে হইবে। যাহারা মূলভ্রষ্ট—যাহারা পূর্ব-পুরুষদিগের সহিত পারম্পর্যসূত্রে মিলিত নহে তাহাদের মহানুভবতা মহাপ্রাণতা হইতে পারে না। আজকাল যে ইংরেজপ্রদত্ত অধিকার বা বিলাতি সাম্যবাদের বলে একতার আন্দোলন চলিতেছে উহার গভীরতা অতি অল্প। স্বজাতীয় ইতিহাসে যাহারা কোন আলোক বা শক্তি লাভ করে না তাহারা ভ্রষ্ট বা বিদ্রোহী।

আগামী কৃষ্ণজন্মমহোৎসব সারস্বত-আয়তন * নামে বিদ্যালয়ের

* সারস্বত আয়তন উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দির। স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পূর্ব হইতেই এই বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। দুঃখের বিষয় উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার এই আয়তনটি লোপ পাইয়াছে।

অধ্যাপক মহোদয়গণ ও ছাত্রবর্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের বালকেরা যাহাতে বুঝিতে পারে যে, হিন্দুজাতি ও সমাজ অতীতের সহিত অকাট্যভাবে গ্রথিত আছে—যে হিন্দুর জ্ঞান ধর্ম ও সামাজিকতা অটুট ও উদার—যে হিন্দুজাতি কৃষ্ণমন্ত্রপূত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে—তজ্জন্যই এই আয়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আয়তনের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ যে শুভ কৃষ্ণোৎসব সম্পাদন করিবেন ইহা তো স্বাভাবিক। ঐ শুভদিনে যাহাতে জনসাধারণ কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন তাহারই আয়োজন সারস্বত-আয়তনে করা হইবে। আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া একটি ছোট আমিকে নিবেদন করিলে চলিবে না। সমগ্র দেশের সহিত—অতীতের সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের অনুভূতির সহিত—স্বদেশানুরাগের মত্ততার সহিত এক বিরাট অভেদ-প্রাণ নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই মঙ্গল-দিবসে আমি নিজেকে নিবেদন করিব—আমার দেশকে নিবেদন করিব—ভারতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে নিবেদন করিব—স্বদেশীয় সমস্ত বস্তু নিবেদন করিব। এই উৎসর্গের পর নিবেদিত স্বদেশজাত দ্রব্যকে উপেক্ষা করিলে মহাপাতকে পড়িবে—পিতৃপিতামহদিগের অবমাননা করিবে ও মূলাধার শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী হইবে। এই আত্মনিবেদন করিয়া যদি কখনও হিন্দুর জ্ঞান ধর্ম সমাজ সভ্যতা ছাড়িয়া চলিয়া যাই—তাহা হইলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। কৃষ্ণ-বিদ্রোহীর গতি নাই। একটুকরা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া বিদেশীর প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিলে স্বদেশানুরাগ জন্মায় না। কৃষ্ণপাদপদ্মে ঋষিমুনি-দিগের সহিত এক হইয়া আপনাকে নিবেদন কর—স্বদেশকে নিবেদন কর—স্বদেশীয় দ্রব্যসকলও নিবেদন কর—দেখিবে যে কৃষ্ণপ্রভাবে স্বদেশপ্রেমবহ্নি তোমার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিবে।

জামাই-ষষ্ঠী

আগামী শুক্রবার জামাইষষ্ঠী। এই জামাইষষ্ঠীর কথা মনে হইলে আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

জামাই হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাতানোসম্পর্কেও কেহ কখন আমাকে জামাই বলিয়া ডাকে নাই। আর এ কাঠামোর যে জামাই হইব সে আশাও নাই। চুল সাদা হইয়া আসিয়াছে—গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে—দাঁতগুলি হল হল করিয়া নড়িতেছে। দেহটি রসবিহীন পল্লববিরহিত পাদপের ন্যায় কোন প্রকারে তিষ্টিয়া আছে। বসন্তের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিয়া উঠে না। বিহগকূজন আর প্রাণকে আলোড়িত করে না। এখন প্রাণে যা মাঝে মাঝে সাড় হয় তাহা কেবল কাঠঠোকরার ঠকঠকানির জ্বালা বই আর কিছু নয়।

এত রসহীন এত শুষ্ক তবুও ষষ্ঠীবাটার ঘটায় মন পুলকিত হইয়া উঠে। ল্যাংড়া বোম্বাই মধুফলে বা বাগবাজারের রসগোল্লায় বা কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ায় আমার মন উথলিয়া উঠে তাহা নহে। আমি ধ্যানবলে মাতৃরূপিণী শ্বশ্রূঠাকরুণদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারি। ঐ কোমল হৃদয় কি চুরুচুরু দুলিতেছে—কি সকরুণ উদ্বেলনে আলোড়িত হইতেছে। নব জামাতাকে আদর করিবার জন্য শাশুড়ী ঠাকরুন কতই না আয়োজন করিতেছেন। কত বকাবকি ঝকাঝকি ডাকাডাকি লইয়াই না ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি সদাই অচলা। এই প্রীতির কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার পুলকরোমাঞ্চ হয়। ঐ প্রীতি কি অপত্য স্নেহ? তাহা ত বটেই। কিন্তু উহাতে অন্য ভাবও সংমিশ্রিত আছে। আমার প্রাণপ্রতিম কন্যাকে সৎকুলে প্রদান করিয়াছি। আমার দুহিতা সেই কুলীন পরিবারের অলংকাররূপে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিবে। অবশেষে জননীরূপে সেই কুল রক্ষা করিবে। ইহা কি কম গর্বের

কথা। এইরূপ ধর্মসংগত সম্প্রদানের কথা মনে করিলে স্বাভাবিক ক্ষুদ্র স্নেহ বড়ই এক উদারভাব ধারণ করে। সেই উদার ভাব জামাইষষ্ঠীর দিন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

এই শুভদিনে কুলশীলসম্পন্ন সৎপাত্র আসিবেন। তিনি আত্মজার বর। আজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কত আমোদ। শ্যালিকারা ঠাট্টাতামাসা করিয়া জামাতার প্রাণকে মধুমাখা করিয়া তুলিবে। আর ব্রীড়াময়ী লতারূপিণী নববধূ আজ কি এক অজানিত আনন্দে বিবশা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যে শ্বশ্রূঠাকরুন উপবাসী থাকিবেন। তিনি ষষ্ঠীপূজা করিবেন, এ আনন্দের ভিতর আবার উপবাস কেন—পূজা কেন—বিধিনিষেধের বাধাবাধি কেন। ষষ্ঠীপূজা ও নারায়ণের উপাসনা না হইলে আমোদ-প্রমোদ সমস্তই বৃথা হইবে।

হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ। সংসাররক্ষার মহাব্রতে আমার ভোগসুখকে বলিদান দিতে হইবে। ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। তাই হিন্দুর গৃহে উদ্বেলযৌবন দম্পতির চাপল্যকে ধর্মবিধির দ্বারা সংযত করা হয়। দাম্পত্যের মধুর ভাববিলাস যাহাতে মঙ্গলময় জনকত্বের গাম্ভীর্যে পরিণত হয় তাহারই জন্য এই উপবাস—এই ষষ্ঠীপূজা। কন্যাসম্প্রদান যাহাতে সফল হয় তাহারই জন্য এই উৎসবের দিনে শ্বশুর শাশুড়ী নবদম্পতি শ্যালক-শ্যালিকা আত্মীয় কুটুম্বিনী সকলে ষষ্ঠীমাতার শরণাপন্ন হন ও তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া উৎসবের আনন্দ ভোগ করেন। বিবাহযজ্ঞে যে লোকরক্ষারূপ মঙ্গলকামনা করা হইয়াছিল তাহারই সিদ্ধির জন্য সুখময় ষষ্ঠীবাটা অনুষ্ঠিত হয়।

শাশুড়ী ঠাকরুন অত ভাবনা চিন্তা করিয়া তাঁহার ষষ্ঠীবাটার আয়োজন করেন না বটে, কিন্তু তিনি হিন্দুরমণী—তাঁহার ঐ মঙ্গল-সংস্কার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। স্বভাবতই ঐ উৎসবের দিনে তাঁহার এক অভূতপূর্ব উদারপ্রীতির সঞ্চার হয়। সেই প্রীতি যে বুঝিতে পারে সেই জানে যে হিন্দুর আদর্শ কি উচ্চ।

ষষ্ঠীবাটার অনুষ্ঠান আর কোথাও দেখা যায় না। হে সংস্কারক—একবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে হিন্দুর আচার-ব্যবহারগুলি দেখ। অনেক আবর্জনা আছে সত্য—আর আবর্জনা কোথায় বা নাই—কিন্তু দেখিবে হিন্দু আসলে খাঁটি সোনা।

স্নান-যাত্রা

যাত্রা বলিলে সচরাচর গমন বুঝায়। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অর্থ—উৎসব। তাই আমরা বলি রথযাত্রা দোলযাত্রা স্নানযাত্রা।

আজ স্নানযাত্রা। কাহার স্নান? আনন্দময় আপ্তকাম নির্গুণ পুরুষের আবার স্নান কিরূপে সম্ভব? মানুষের এত বড় স্পর্দ্ধা যে যিনি ভূমা যিনি অনন্ত তাঁহাকে কি না স্নান করাইয়া তুষ্ট করিতে চায়! মানুষ অতি ক্ষুদ্র—তাহার কোন দোষ নাই। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে মহৎকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। সে আকাঙ্ক্ষা স্পর্দ্ধা নহে—উহা দৈবী। মায়াময় শ্রীহরি এতই প্রেমের বশ যে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নিজেই ছোট হন। যে ছোট—যে দীন-দুঃখী—তাহার খাতিরে যদি মহান্ ছোট হন—তবেই মহত্তের মহত্ত্ব। প্রেমে ও বিনয়ে যত মহিমা—ঐশ্বর্য্যে তত নহে। যখন ভগবান্ স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্রভাব ধারণ করেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র প্রতিমা লইয়া ক্ষুদ্র ভক্তেরা যদি পূজা করে তাহা হইলে কোন দোষই স্পর্শে না, বরং ভগবানের প্রীতিই সাধিত হয়।

ভগবান্ প্রেমে ছোট হইয়া ধরা দেন কিন্তু তুমি যদি তাঁহাকে ছোট কর—তাঁহার অবমাননা হইবে। তুমি ধ্যানে তাঁহাকে ধরিতে পার না, তাই তিনি মাধুর্য্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া তোমার নিকট হইতে অভিষেক-লেপনাদি সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে তিনি স্নানশীল, চন্দনপ্রার্থী—তোমার ঘোর অপরাধ হইবে।

যিনি কোটি বিশ্বকে প্লাবিত করেন—যিনি অনন্ত আনন্দের আধার—তিনি কি স্নান বা চন্দনসুখের আকাঙ্ক্ষী। তুমি যাহাতে ক্ষুদ্রতার ভিতর দিয়া মহৎকে দেখিতে পার তাহারই জন্য তিনি ছোট হইয়া আসেন। আর তুমি যদি সেই প্রেমের বিকাশে কেবল ক্ষুদ্রতাই দেখ তাহা হইলে তুমি যে নীচ সেই নীচই থাকিবে—তোমার আর গতি হইবে না। সাবধান—আজ স্নানযাত্রার দিনে ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া দাও।

তুমি মনে করিতেছ যে ভারি ঘটা করিয়া বিগ্রহস্নান করাইতেছ। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ—যিনি বিশ্বরূপ তিনি কিরূপে স্নান করিতেছেন। আকাশ ঘননীরদনীল—দিঙ্‌মণ্ডল শ্যামায়মান—চতুর্দিকে ঘোর ঘটা। কখনও বা বজ্রের ভৈরব রোল, কখনও বা বিজলীর হাসি। তোমার চন্দ্রাতপ ঢাকঢোল আলোকমালা এই গম্ভীর শোভার কাছে কী তুচ্ছ! আর দেখ কী বিরাট স্নান! দরদর করিয়া মুষলধারে বর্ষা নামিল। আতপতাপিত বসুন্ধরা স্নিগ্ধ হইল—বিশ্বপ্রাণ জুড়াইল। ঐ দেখ, শ্যামসুন্দর বল্লরীবেষ্টন তরুবর স্নান করিয়া ফুল্লদোলে বিধূনিত হইতেছে। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে স্বয়ং সৎস্বরূপ মায়াময়ী শ্যামা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া স্নানবিলাস করিতেছেন। আরও উপরে উঠ। ঐ যে নীরদ নীলিমা—উহাও তোমার জীবিতেশের রূপ। আর ঐ যে বর্ষা উহাও সেই প্রেমিকের ছল। সবই একাকার। অরূপ আজ শ্যামরূপ ধরিয়াছেন-শ্যামঘন—শ্যামময়—শ্যামপ্রকৃতি।

আজ স্নানযাত্রার দিনে ভেদ তুলিয়া যাও। অসীম অম্বর হইতে ঝরঝর ধারা পড়িতেছে—বিপুল ভূমণ্ডল অভিষিক্ত হইতেছে। ভাল করিয়া বুঝিলে জানিতে পারিবে যে ইহা বিশ্বরূপের স্নানযাত্রা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি এত বড় বিরাট স্নান—যদি ভেদাভেদ নাই—তবে আর একটি ছোট বিগ্রহকে স্নান করান কেন। আমরা নাকি বড় ছোট

তাই ছোট না হলে প্রাণটা পূর্ণ হয় না—আর প্রাণটা না ভরিয়া উঠিলে অনন্তের পূর্ণতা ধরিতে পারি না—শূন্যতায় পড়িয়া মরিয়া যাই। কিন্তু ঐ ছোট বিগ্রহস্থানে যদি তুমি বিশ্বরূপের আনন্দবিলাস না দেখিতে পাও—তুমি প্রবৃত্তির দাস হইয়া চিরকালই কর্মের ভেদ-চক্রে ঘুরপাক খাইবে। যে মুহূর্তে ছোটর ভিতরে বড় দেখিবে সেই মুহূর্তে তোমার মুক্তির পথ খুলিবে।

হায় বঙ্গদেশ—তোমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তুমি আজ অভেদ মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া ভেদবাদের খুঁটিনাটিতে মজিয়া গিয়াছ। আজ স্নান-যাত্রার দিনে দেবাদিদেব জগন্নাথের অভেদলীলাবিলাস দেখিয়া তোমার প্রাণ যেন প্রেমে মাতিয়া উঠে।

রথ-যাত্রা

ইংরেজী পড়িয়া কি বিপদই হইয়াছে। সমস্ত রসকষ শুকাইয়া গিয়াছে। এখন আর রথদোল ভাল লাগে না। ফুটবল ব্যাটবল থিয়েটার—এই সব ভাল লাগে, আর পালপর্বমেলা সব অশিক্ষিত ছোটলোকের কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

কাল মঙ্গলবার রথ-যাত্রা। ছেলেমেয়েরা আনন্দে মাতিবে ও ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে সংসার-রথের সারথি জগন্নাথদেবের জয়ধ্বনি করিবে। কাল রথতলার আনন্দবাজারে কী ঘটা কী বাহার—কী সুখসমাগম! গ্রামান্তর হইতে অসংখ্য পুরুষনারী আসিয়া মায়াবাঁশকে দর্শন করিবে ও সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য কত কি জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সভ্যসম্প্রদায়ের এসব কিছুতেই মন ভিজে না। তাঁহারা কেবল বলেন—কে ওখানে লোকের ভিড় ঠেলে ধূলাকাদা খেয়ে রথ দেখিতে যাইবে। আর মেলায় যে শ্রী—কতকগুলো তেলেভাজা পাঁপর-কচুরি ও পেতে চুপড়ি মাদুর খোরা পাথরবাটি বিক্রি হয়। আর ভদ্রলোকে

কি ওখানে যেতে পারে—যত লম্পট ও গণিকার আড্ডা বই ত নয়! এই সভ্য বাবুদের ইংরেজি পড়িয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সহিত সব মর্মবন্ধন টুটিয়া গিয়াছে।

তাঁহারা এখন ইংরেজিভাবে উৎসব মেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন – বক্তৃতা ও করতল চটচটা ধ্বনির চোটে আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিদেশী বিদ্যা পড়িয়া স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। ঐ বিভ্রম সংশোধনের জন্যই দুই একটা কথা বলার প্রয়োজন।

আমাদের শরীর একটি জীবন্ত রথ। সর্বসাক্ষী সর্বান্তর্যামী সর্বনিয়ন্তা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই রথের রথী। কর্মচক্রে ইহা তাড়িত ঘূর্ণিত চালিত হইতেছে। হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যেরূপ নিয়োগ করিতেছেন সেইরূপই ইহা চলিতেছে। আবার একটি একটি করিয়া সকল শরীর গ্রহণ করিলে সমগ্র মানবসমাজ এক প্রকাণ্ড রথের ন্যায় প্রতীত হইবে। আরও যদি আয়তন বৃদ্ধি করিয়া জড়চেতন যক্ষরক্ষঃ কিন্নরগন্ধর্ব দেবগণকে লওয়া যায় তাহা হইলে চতুর্দশ-ভুবনব্যাপী এক অনির্বচনীয় সুবিশাল রথ বুদ্ধিগোচর হইবে। শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব জগন্নাথ এই বিশ্বরথের রথী। ঐ যে ভৈরব বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পাইতেছ—ঐ যে মলয়ানিলের মৃদুমন্দ ঝুর ঝুর শব্দ—ঐ যে মধুমাখা প্রেমালাপ—উহা সমস্তই ঐ রথচক্রের গতি নির্দেশ করিতেছে। ঐ যে করুণাময়ী জননী সুকুমার শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন—ঐ যে দস্যু সেই শিশুকেই কাঞ্চনলোভে হত্যা করিতেছে—ঐ যে রণডাকিনীরা নরশোণিত পান করিতেছে ও হুহুঙ্কার রবে তাণ্ডবনাচ নাচিতেছে—ঐ যে দাতা লক্ষ লক্ষ অনাথকে অন্নদান করিতেছে—এই সব ভালমন্দ পাপপুণ্য শুভঅশুভ জীবনমরণ সুখদুঃখ—সেই বিশ্বরথীর নিয়োগেই হইতেছে। তাঁহার হাতে রাশ—সাধ্য কি যে রথ বা কর্মচক্র তাঁহার রাশের টান না মানে। কোথাও কোন সময়ে একচুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই। ঠিক রাশমাফিক চলিতেই হইবে।

তবে কি ভাল মন্দ নাই? কেন—যাহা ভাল তাহা ভাল, যাহা মন্দ তাহা মন্দ। মানুষ যেই মনে করে যে সে কর্তা—অমনি সে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। দ্বন্দ্ব কি—ভালমন্দ পাপপুণ্য হাসিকান্না সুখদুঃখ। যে নিজেকে কর্তা মনে করে সে কর্ম উপার্জন করিবেই করিবে। আর কর্ম উপার্জন করিলে ফলভোগ করিতেই হইবে। এই ভোগ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া হয়। কর্তৃত্ববোধ থাকিতে এই দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া যায় না। কিন্তু মানুষ যদি একবার মায়াধীশকে দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে যে তিনিই একমাত্র কর্তা—তাহার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই—সে মুক্তির পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। রথের রথী মায়াধীশকে দেখিলে আর সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে হা-হতোস্মি করিতে হয় না। সকলকেই কর্মচক্রে পিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু যে জানে যে ঐ চাকা জগন্নাথের চাকা—সে 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া ঐ দ্বন্দ্ববিরোধ আনন্দের সহিত সহ্য করে, আর যে রথের রথী মায়াধীশকে জানে না—নিজেকেই কেবল কর্তা মনে করে—সে চাকার তলায় পড়িয়া গেলুম মলুম বলিয়া আর্তনাদ করে। এই সুগভীর তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্যই রথ-যাত্রা।

এস, আজ রথ দেখিতে যাই। আমাদের ছোট মন, ছোট বুদ্ধি। এস ঐ ছোটরথে বিশ্বরথ আরোপ করি, আর ঐ ছোট জগন্নাথটিকে দেখিয়া বিশ্বনাথের ধ্যান করি। ছোট রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া একবার সংসার রথ ও কর্মচক্রের কথা ভাবি। এই রথ দেখিয়া যেন বুঝিতে পারি যে যিনি বিশ্বনিয়ন্তা তিনি এই বিশ্বরথের চালক। প্রেমের চোখে রথ দেখ ও জগন্নাথদেবের দর্শন কর, আর বল—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

৺ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা

এস মা বরদে—এস আজ শারদীয় পূর্ণিমায় তোমায় বরণ করি। আজ কোজাগর। পুরাণে লিখিত আছে—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥

আজ মা নিশীথে ভক্তের গৃহে আসিয়া বলিবেন—কে জাগিয়া আছ—কে পাশা খেলিতেছ—তাহাকেই আমি বরদান করিব।

সংসারটা ঠিক পাশাখেলা। এই ঘুঁটি পাকে পাকে, আর অমনি মারা যায়। আর এক চাল, তাহা হইলেই জিত—ও মা! কোথা থেকে আমার টক্‌টকে পাকা ঘুঁটিটি গাদে পড়িল, আর খেলা কাঁচিয়া গেল। একেবারে মুখে কালি চুন। আবার ওদিকে কখন বা কেবল পোহাবারো আর আঠারো—দেখিতে না দেখিতে বাজিমাৎ।

সংসারে কেবল জিত হয় না—হার-জিত আছেই আছে। আবার বাড়া ভাতে ছাইও পড়ে! চঞ্চল আশা—সুখদুঃখের বাসা—সংসারটা যেন পাশার তামাশা।

মা কমলা বড়ই চঞ্চলা। এই পোয়া এই কচ—এই পূর্ণ এই শূন্য, এই পাকা এই কাঁচা, এই উঠ্‌তি এই পড়্‌তি। মায়ের এই চঞ্চলতার হেঁচকা টানে যে কাতর হয় না তাহাকেই মা লক্ষ্মী অক্ষয় বর প্রদান করেন। যে সম্পদে-বিপদে আশায়-নিরাশায় পুরুষকার ছাড়িয়া দেয় না—যে শোকমোহের নিশীথেও জাগ্রত থাকে—অবসন্ন হয় না—সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র। পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

পুরাণে আরও লেখা আছে—

নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৄন্ দেবান্ সমর্চয়েৎ।
বন্ধুংশ্চ প্রীণয়েত্তেন স্বয়ং তদশনো ভবেৎ॥

কোজাগর পূর্ণিমায় নারিকেল ও চিঁড়ার দ্বারা পিতৃপুরুষ ও দেবতাদিগের অর্চনা করিবে বন্ধুবান্ধবকে তৃপ্ত করিবে ও স্বয়ং উহা ভোজন করিবে।

ইহার কারণ কি ? শাস্ত্রকথা ছাড়িয়া সহজ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

অন্ন লক্ষ্মী। যদি চঞ্চলাকে স্থির করিয়া রাখিতে চাও তো অন্নের যে রূপটি অধিক দিন স্থায়ী তাহারই ভজনা কর। চিপিটকের (চিঁড়া) মত অন্নের স্থায়ী পরিণাম আর কি আছে। দূরগামী যাত্রীর চিঁড়াই প্রধান সম্বল। তাই কোজাগর পূর্ণিমায় অন্নের অন্য সব পাক ছাড়িয়া চিঁড়ার চলন। ফল—মানুষের ভাগ্যের নিদর্শন। আর যে সুমিষ্ট সুরসাল ফলের সার শ্বেতবর্ণ তাহা ত মূর্তিমান সৌভাগ্য। নারিকেলের মত অটুট ও স্থায়ী ফল তো দেখা যায় না। উহা আবার সহজে কেহ ভাঙিতে পারে না। আর কোনও ফল নারিকেলের মত অত দিন রাখা যায় না। সেইজন্যই কোজাগর রাত্রিতে নারিকেলের ব্যবহার।

যদি চঞ্চলাকে স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় বাঁধিয়া রাখিতে চাও, তাহা হইলে শারদীয় পূর্ণিমায় মা লক্ষ্মীর পূজা করিও—পাশা খেলিয়া রাত্রি জাগরণ করিও, সংসারের সুখদুঃখের খেলায় সজাগ থাকিও—অবসন্ন হইও না। আর যাহাতে অন্নের সংস্থান, সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় অটুট হয় তাহার জন্য নারিকেল চিঁড়া খাইয়া মা লক্ষ্মীর অর্চনা করিও।

শিব-চতুর্দ্দশী

যে পূজা বেদে নাই—সে পূজা পূজাই নয়। বেদে কি শিবপূজা আছে? বেদে যদি কোন পূজা থাকে তো শিবপূজাই আছে।

যজুর্বেদে লিখিত আছে—নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ। হে রুদ্র—তুমি বিরূপ—তুমি বিশ্বরূপ—তোমাকে আমাদের নমস্কার। বিরূপ বলিলে বিকৃত রূপ বোঝায়। অন্ধ খঞ্জ নগ্ন মুণ্ড—সকল রূপই শিব। আবার তিনি বিশ্বরূপ—স্থাবর জঙ্গম চরাচর রূপ তিনি স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছেন। পুরাণেও তাঁহার অষ্টমূর্ত্তির কথা আছে। তিনিই সূর্য চন্দ্র অগ্নি জল পৃথিবী বায়ু আকাশ ও দীক্ষিত ব্রাহ্মণ—তিনি বিশ্বময়। ইহাই চরম জ্ঞানের কথা।

আমরা কিন্তু অজ্ঞান—আমাদের নিকট তিনি দুই রূপে প্রকাশ পান। বেদেও তাঁহার দুই প্রকার তনুর কথা বর্ণিত আছে—ঘোরা ও অঘোরা। তাঁহার ঘোররূপ কোপময় উগ্র ভীম—ধনুর্বাণসমন্বিত। বিরোধীদিগকে তিনি বিনাশ করেন। যাহারা শিবনিন্দা করে—তাহাদের সকল পূজা—সকল যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম তিনি লণ্ডভণ্ড করিয়া দেন। সংসারে ঘোর শিবনিন্দা হইয়াছে। কিছুতেই রক্ষা নাই। সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। ভূতনাথ এখনই সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। তুমি মনে করিয়াছ—সুখের ঘর গড়িয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে—মহামায়ার পূজা করিয়া ঐশ্বর্যবান হইবে। কিন্তু তুমি একনাথ মহাদেবের সমাদর কর নাই। তোমাকে কোন দেবতাই রক্ষা করিতে পারিবে না। স্বয়ং মহামায়া তোমার গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন। তুমি গণনাথকে অবমাননা করিয়াছ। তাঁহার নন্দীভৃঙ্গী তালবেতালেরা তোমার সাধের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তুমি অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া আছ—তাই তাহাদের অট্টহাস্যরোল—তাহাদের ডমরু শিঙার ভীষণ ধ্বনি তুমি শুনিতে

পাইতেছ না। তুমি আনন্দ উৎসবে মাতিয়াছ বটে, মহাকাল তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন—তাঁহার কালভৈরবেরা এখনই তালে তালে প্রলয়ের নৃত্য নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুমি মনে করিয়াছ দক্ষযজ্ঞ কবে একবার হইয়া গিয়াছে। তাহা নহে। তুমিও দক্ষের ন্যায় শিবদ্রোহী। তোমার ঘরে আবার দক্ষযজ্ঞের পালা হইবে। তোমার ধারণা—দুর্গতিনাশিনী দুর্গার শক্তিতে তুমি শক্তিমান—তুমি অন্যান্য দেবতার পূজা কর। কিছুতেই রক্ষা নাই। একনাথ মহাদেবের অবমাননা করিলে স্বয়ং ব্রহ্মাও তোমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না। আর যে মায়াশক্তির আশ্রয় লইয়া তুমি অহঙ্কার করিতেছ—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসংহারিণী—তাঁহাকেই মহাদেব সংহার করিয়া ফেলেন। মহামায়া অসুরনাশিনী—কিন্তু মহাদেব সুরাসুর সকলকেই বিনাশ করেন। সেই আদ্যাশক্তি—যিনি সংসারভেদের মূল—তিনিও তাঁহার হস্তে রক্ষা পান না।

তুমি যখন শিবনিন্দা করিয়া ভেদচক্রে পড়িয়াছ—তখন মহাদেব তোমাকে সংহার করিবেনই করিবেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়—তিনি সংহার করেন—সংহরণ করিবার জন্য। তিনি ভেদবীজ ধ্বংস করিয়া অভেদ অদ্বৈত স্থাপন করেন। তাই সংহারকর্তা হইয়াও তিনি শিব। এই তত্ত্বই আমাদের একমাত্র আশাস্থল। এই আশাতেই বুক বাঁধিয়া আমরা ভূতনাথকে আশুতোষ বলিয়া পূজা করি। তাহা না হইলে কাহার সাধ্য যে ঐ ঘোর রুদ্ররূপের সম্মুখে কেহ দাঁড়ায়।

শিবচতুর্দশীর দিনে কালের কাল মহাদেবের পূজা করিতে হইবে। ঐ কালনিশায় সংসার-শ্মশানে তাঁহার ঘোররূপ দেখ। তাঁহার ঊর্ধ্বনয়ন হইতে কোটি সূর্যের তেজের ন্যায় সংহারকোপের জ্বালা বাহির হইতেছে। তাঁহার ভূতগণ অট্টরোল তুলিয়া ভীষণ রঙ্গভঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আর স্বয়ং মহামায়া নৃত্যকালী রূপ ধরিয়া অসিহস্তে নৃত্য করিতেছেন ও জয়া বিজয়া—আর কত ডাকিনী যোগিনী মুণ্ডমালিনীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ভয় পাইও না—ঐ যে

রুদ্রের ঘোররূপ দেখিতেছ—উহার অন্তরে শান্ত অঘোর অদ্বৈতরূপ লুক্কায়িত আছে।

এই শুভদিনে সংযম উপবাস কর—সংসারকে শ্মশান করিয়া দেখ—অমানিশাকে কালরাত্রি মনে কর—আর ভূতগণের সঙ্গে কালঘণ্টার নিনাদ রটাইয়া ববম্ ববম্ রোল তোল—আর শিবোঽহং শিবোঽহম্ মন্ত্রে মহাদেবের পূজা কর। দেখ—বেদের কথা ভুলিও না। মহাদেবের দুই রূপ—ঘোর ও অঘোর।

যা ত ইষু শিবতমা শিবং বভুব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো রুদ্র মৃড়য়॥

হে রুদ্র, তোমার বাণ শিবতম হউক—তোমার ধনু শান্ত হউক—তোমার তূণীর মঙ্গলপ্রদ হউক। এই ধনুর্বাণ ও তূণীরের দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।

এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ভোলানাথের পূজা কর। তিনি আশুতোষ, তিনি ঘোররূপ ছাড়িয়া শান্তরূপ ধরিবেন। তিনি ভেদবিনাশের ভিতরে অমৃতপথ দেখাইয়া দিবেন—তোমার শিবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

দোল-লীলা

জ্ঞান স্থির ও গম্ভীর—প্রেম চঞ্চল ও মধুর। যোগে হৃদয় স্পন্দনহীন হয় কিন্তু প্রেমের আবেগে হিয়া দুরু দুরু কাঁপে—মৃদু মৃদু দোলে। যোগের ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন কিন্তু ভক্তের ভগবান্ প্রেমাকর্ষণচঞ্চল, হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়া দোললীলা করেন। জ্ঞানবলে পরমভাবের ভাবুক হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করা যায়, আবার প্রেমডোরে শ্রীহরিকে বাঁধিয়া আনিয়া ভক্তভাবের ভাবুক করা যায়। আমি যদি কাঁদি তো আমার হরি কাঁদেন—আমি যদি হাসি তো তিনি হাসেন—আমি যদি রাগ করি তো তিনিও রাগ করেন। ভাবের হিল্লোলে আমার মন দোলে আর মনদোলায় বসিয়া আমার মনের মানুষ দোলেন।

যিনি অসঙ্গ তিনি আবার সঙ্গের সঙ্গী—যিনি মনের অগোচর তিনি আবার মানুষ—যিনি অচল অটল তিনি চঞ্চল—যাঁহার চরণে কোটি ব্রহ্মাণ্ড দোলে তিনি আজ প্রেমের টানে দোদুল্যমান। অদ্ভুত দোললীলা অদ্ভুত রহস্য।

শ্রীহরি যে কেবল ভাবের দোলায় খেলা করেন তাহা নহে—তিনি সোহাগের বিবিধ রঙে রঞ্জিত হন। বেদান্তে বলে যে সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি অরূপ অবর্ণ। কিন্তু আমার মন বুঝে না। অরূপের নিকটে যাইলে অরূপ হইয়া লীন হইতে হয়। তাই অরূপে রূপ দেখিতে প্রাণ বড়ই আকুল। যদ্রূপ বর্ণরহিত অনন্ত দিগন্ত নীলিমা-রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়—আবার সেই নীলিমা অরুণরাগে লোহিতরূপ ধারণ করে—তদ্রূপ অদৃশ্য অবর্ণ ঈশ্বর প্রেমকুঙ্কুম রঙীন হইয়া প্রকাশিত হন। সব লালে লাল—যিনি মহান্ তিনি আবার প্রেমদুলাল। শান্ত সমাহিত ভাব চলিয়া গিয়াছে—লাল রঙে প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে। ভক্তের ভালবাসা শ্রীহরিকে রক্তাভ করিয়া তুলিয়াছে—আর ভাবের উচ্ছ্বাসে আবার মুখশ্রীও রক্তিম হইয়াছে। রঙে রঙে মিশিয়া গিয়াছে। মনকে যে রঙে রঞ্জিত করিবে শ্রীহরিও সেই রঙে রঙীন হইবেন। তুমি যদি কালো হও—ঠাকুরও কালো হইবেন। তুমি যদি মঙ্গল-হরিদ্রা মাখ, তিনিও পীতবসন পরিয়া তোমার নিকটে আসিবেন—তোমার যদি নিবৃত্তির নীলিমা ভাল লাগে, তিনিও নীলকলেবর হইয়া উপস্থিত হইবেন।

এই দোললীলা বিশ্ব ব্যাপিয়া চলিতেছে। ধরাধামে নববসন্ত-সমাগমে এই লীলার বিশেষ ঘটা হয়। গ্রীষ্মের অসাড়তা নাই—বর্ষার ঝটিকা নাই—শীতের হিমপাত নাই। আবার দিক্ সকল নির্মল ও আনন্দময়। কোথা হইতে ধীর সমীরণ ঝুরু ঝুরু বহিয়া আসিতেছে আর প্রকৃতিকে দুরু দুরু বিধুনিত করিতেছে। ঐ যে সরসী লহরী তুলিয়া নাচিতেছে আর বিকশিত কমলদলকে নাচাইতেছে উহা শ্রীহরির দোলা। তিনি ঐ লহরীবিকম্পিত কমলদোলায়

শ্রীচরণকমল রাখিয়া দুলিতেছেন। ঐ যে বল্লরীবিজড়িত নবপল্লবিত কুসুমপরিপূরিত তরুবর অনিলস্পর্শে মৃদুমন্দ দুলিতেছে—উহাতে তিনিই দোলায়মান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃতি হাসে আর দোলে—প্রকৃতির ঠাকুরও হাসে আর দোলে। আবার এই বসন্তে মধুর শ্যামরক্তিমা স্বভাবকে আচ্ছাদন করিয়াছে। আমার ইষ্টদেবতাও নবপল্লবদল শ্যামরূপ ধরিয়া প্রেমিকের মনমোহন করিতেছেন। কুঞ্জে কুঞ্জে মালঞ্চে মালঞ্চে কতই না লালের খেলা—ও যে আমার ঠাকুরের রঙ্গলীলা।

এস, আমরাও প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতির ঈশ্বরের সঙ্গে দোল দেখি। যে ঈশ্বরকে দোলাইতে জানে না, যে তাঁহাকে রঙ মাখাইতে জানে না—সে ভক্ত নহে—সে প্রেমিক নহে। তাঁহার ভাবের ভাবুক হইলে সাগরের জল সাগরে মিশিয়া যাইবে। তাই তাঁহাকে আমার ভাবের ভাবুক করিয়া মনোদোলায় দোলাইতে হইবে। আমার হাসিকান্নায় তাঁহাকে চঞ্চল করিব। আর অরূপকেই বা কিরূপে ভালবাসি। তাই প্রেমের রঙে তাঁহাকে রঙ্গাইয়া মাতোয়ারা হইব।

দে দোল দে দোল—আজ প্রকৃতি তাহার দেবতাকে দোলাইতেছে। আমিও এই দোলপূর্ণিমায় আমার অচল অটল অরূপ ঠাকুরকে হৃদয়দোলায় বসাইয়া দোলাইব ও প্রেমের ফাগে—প্রকৃতির লাল রঙে—ভক্ত ভগবান্ দোহে লালে লাল হইয়া যাইব। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে যে যে রূপে চাহে তিনি সেই রূপ ধরিয়া দেখা দেন। প্রেমের অনুরোধে অপরূপ রূপবান্ হন—অচল চঞ্চল হইয়া দোলেন।

পদ্ম-পুরাণে বলিয়াছেন—

দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলায়নং সকৃন্নরাঃ।
দৃষ্ট্বাপরাধনিচয়ৈ মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ।

অর্থাৎ দোলে দোলায়মান দক্ষিণমুখ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে একবার দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে জনগণ সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হয়।

জৈমিনি বলিয়াছেন—

ফাল্গুনে মাসি কুর্বীত দোলারোহণমুত্তমং
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ।

অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে উত্তম দোলে আরোহণ করিবে, যেখানে ভগবান্ গোবিন্দ লোককে অনুগ্রহ করিবার জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

এই রূপে দোললীলার বিষয় কি পদ্মপুরাণে কি গরুড়পুরাণে, কি স্কন্দপুরাণে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

উদ্বোধন

সখা, বন্ধু, মিত্র, গুরু, দেবতা—আমাদের সর্বস্ব, যখন আসিয়াছে তখন যুগান্তরে যেমন পার্থ সারথি হইয়া—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি আজ আমাদের বড় সাধের মনোরথের সারথিরূপে আসীন হইয়া, সংসার-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উহাকে পরিচালিত কর। মাঝে মাঝে তোমার পাঞ্চজন্যের ভীমরোলে আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব—মহাহবে তোমার আশ্বাস পাইয়া মহাবীরের ন্যায় রিপুদমনে প্রবৃত্ত হইব। দ্বাপরের শেষে এক ধনঞ্জয়ের রথচালনা করিয়াছিলে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় এক তুমি বহু হইয়া, মহান্ তুমি অণুরূপে কোট্যাংশে বিভক্ত হইয়া আমাদের সকলের মনোরথ পরিচালিত কর। প্রতি রথে ছয়টি করিয়া অশ্ব জোড়া আছে—দুর্দমনীয় হয়-চয় কেবল তোমারই বল্গা-সঙ্কেতে নির্দিষ্ট পথে চলিবে। তাই দয়াময়, আজ বাঙলার তথা ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারী করজোড়ে, অবনত মস্তকে তোমায় আহ্বান করিতেছে। হে মধুমুর-

নরকবিনাশন, হে কেশিকালীয়মর্দন, হে মদনমথনমনোমোহন কংসারি, ভারত-দুঃখহারী—আজ তোমায় কাতরকণ্ঠে আমরা ডাকিতেছি—তুমি দেখা দাও—আমাদের শ্রদ্ধার আসনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। তুমি না রাখিলে আমাদের কে রাখিবে—তুমি দুর্বলের বল—পতিতের উদ্ধারকর্তা।

যে আবর্জনায় সমাজ-প্রাঙ্গণ অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে, যে মলিন ছায়ায় সমাজ-গৃহ অস্পৃশ্য—অব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে—আমরা সেই আবর্জনা দূর করিতে চাই—আমরা সেই ছায়া অপসারিত করিতে চাই—বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপানিধান, আমাদের বাসনা পূর্ণ কর। বিদেশী বর্জন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি--বিদেশীর ছায়া মাড়াইব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি--আমার আঙ্গিনায় মহালক্ষ্মীর পূজার উদ্দেশ্যে শুভ আলেপন দিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। দেবতা তুমি—সর্বস্ব তুমি—শক্তিময় তুমি--এমন শক্তি দাও যাহাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়; আমাদের সঙ্কল্প বজায় থাকে--আমাদের অঙ্গনে মায়ের চরণ-লেখা-মালা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

শুভ ত্রয়োদশী তিথিতে মঙ্গলের ঊষায় বুধোদয়ে সেই প্রতিজ্ঞার-সেই সঙ্কল্পের বার্ষিক মহোৎসব করিব। স্বয়ং ভগবান যে উৎসবের অধিষ্ঠাতা--স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে উৎসব-ক্ষেত্রে সারথি। উঠ ভাই বাঙালী-তোমার চিরকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মী, তোমার শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলি-ধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ গ্রামের গ্রাম্যদেবতাগণ-তোমাদের নিজ নিজ গ্রামে সদ্ভাবের-স্বদেশীয়তার পুণ্যপ্রবাহ আবার ছুটাইয়া দাও। দেখ, দেখ ভারতের ভাগ্যবিধাতা সবিতৃদেবতা-তোমার করুণার কোটি কিরণজাল বিস্তার করিয়া আমাদের উৎসব দেখ। ইহাই উদ্বোধন-মৃতসঞ্জীবন। অহল্যার পাষাণ-উদ্ধার এদেশে আর হয় নাই—একবার বিলাসমুগ্ধা অহল্যার পাষাণত্বের স্খালন হইয়াছিল-আর বিলাতী-বিলাস-মুগ্ধ পাষাণময়

আমাদেরও বুঝি বা এতদিনে ভগবচ্চরণসরোজ-সংস্পর্শে পাষাণত্বের অপচয় হয়। আয় বাঙালী ভাই-ভগ্নী পুত্র-কন্যা পিতা-মাতা—বৃদ্ধ-যুবা বালক-বালিকা আয় সবে আজ সকলে সম্মিলিত হইয়া সেই অপূর্ব স্পর্শ সুখ অনুভব করি, যাহাতে আর আমাদের পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে না। আমরা সজীব হইলে, পাষাণী ঈশানী মা আমাদের শক্তিধারিণী হইবেন, আমাদের দুঃখ দূর হইবে সকল জ্বালা জুড়াইবে।

দেশের আহ্বান—মায়ের আহ্বান মহামুহূর্তে মহাসম্মিলনে সকলেই সম্মিলিত হও, দয়াময়ের দয়া অবশ্যই আমাদের মাথায় বর্ষিত হইবে।

বন্দে মাতরম্

[এই ধরণের আরও কয়েকটি রচনা 'শ্রীপঞ্চমী', 'বসন্তোৎসব', 'দোলযাত্রা' ও 'ইতুপূজা' এই গ্রন্থের যথাক্রমে ১১৬, ১১৭, ১১৯ ও ১২১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে 'নবান্ন' রচনাটি—সম্পাদক।]

পরিশিষ্ট—১

নবান্ন

মা আসিয়াছেন! উঠানে-আঙিনায়, ক্ষেত্রে-খামারে তাঁর চরণের অলক্তরাগ দেখিতে পাইয়াছি। কত স্নেহ মায়ের আমার। তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছি, অথচ জননী আমার সন্তান-স্নেহে পাগলিনী। ঝাঁপি ভরিয়া অমৃত-কণিকা বাহিয়া আনিয়া আমাদের শীর্ণ ওষ্ঠে রস সঞ্চার করিতেছেন। কত ভালবাসা মায়ের আমার! আর এমন মাকে আমরা ঘরের বা'র করিয়া দিয়া উল্কামুখী অলক্ষ্মীর ভজনা করিতেছি।

যাহা হউক, নবান্ন-তত্ত্বটি কি, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব, আর সেই সঙ্গে অনুধাবন করিব হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যটি।

আদিম উষা হইতে হিন্দু জাতি যজ্ঞ-পরায়ণ। যজ্ঞ কি?—যজ্ঞ ত্যাগ, দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ। যাহা ভোগ্য, যাহা লালসার, যাহা কেবলমাত্র পাশব-প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার, তাহার ভোগে, তাহার গ্রহণে, তাহার ব্যবহারে, ব্রহ্ম-ভাবের বিলুপ্তি ঘটিয়া পশুত্ব বৃদ্ধি পায়। সেই জন্যই যজ্ঞের অনুষ্ঠান—ত্যাগের সাধনা। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই আদেশ। এই ত্যাগ আর কিছুই নহে—সান্তের সহিত অনন্তের সংযোগ—ক্ষুদ্রের সহিত বৃহতের সম্মিলন, পশুর অন্তরে দেবতার প্রতিষ্ঠা, সসীম অহং-বোধটিকে অসীম ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দিয়া—পশু-জীবনের শুদ্ধি এবং সার্থকতা-সম্পাদন।

হিন্দুর অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর ও ব্যাপক ছিল এই যজ্ঞেই তাঁহার প্রমাণ। হিন্দুর যে পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, তাহা যজ্ঞেরই প্রকার-ভেদ। দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, ইহাই পাল-পার্ব্বণের মূল রহস্য।

নূতন ধান্য হইয়াছে—আশায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। সম্পদ্-সৌভাগ্যে মাতোয়ারা কেবল এইটুকু ধারণায় মানুষকে পশু, লোভী ও সঙ্কীর্ণচিত্ত করে। কেবল এই ধারণাটি রহিলে পরস্ব-অপহরণের প্রবৃত্তি হয়, আসুরিক স্বেচ্ছাচার মনুষ্যত্বকে লোপ করিয়া দেয়, হিন্দু তাই অন্য দৃষ্টি দিয়া জীবনের বিচার করে।

ধান্য লক্ষ্মী, ভগবানের কৃপা। উহা আমার নহে। ভগবতীর বাৎসল্য-ধারা মূর্ত্তিমতী হইয়া ধান্য-সম্পদ-রূপে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে। লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী-রূপেই বরণ করিতে হয়, আর যাঁহার করুণা ধান্যের স্বর্ণাবরণের অন্তরালে শস্যরূপে প্রাণপ্রদ, তাঁহারও পূজা করিতে হয়। তবে ইহার মহিমা থাকে, আমার জীবনেরও সার্থকতা হয়। নবান্ন এই ভাবটিরই অভিব্যঞ্জনা।

তাই নবান্নের দিনে শুদ্ধ-স্নাত হইয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া আত্মীয়-স্বজন-পরিবারের সহিত এবং পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া নবান্ন-পার্ব্বণ পালন করিতে হয়। রসাল সুগন্ধি নূতন অন্ন যখন গ্রহণ করিব, তখন সেই বিশাল রস-সিন্ধুতে মিলিয়া যাইব, তবে তো অন্নের মহিমা রহিবে। কেবল শুধু ক্ষুধার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলে রসের হ্রাস হয়, মিষ্টত্ব লোপ পায়, অমৃত-আস্বাদ থাকে না। যেখানে উৎসর্গ নাই, দেবতার উদ্দেশে নিবেদন নাই সেখানে কেবল অনিবার্য্য অতৃপ্তি, জ্বালাময় ভোগ-লালসা।

নবান্নের অন্ন আমরা একা গ্রহণ করি না। আত্মীয়-স্বজনকে দিই, পাড়া-প্রতিবাসীকে বিলাই, গ্রামের সকলকে সাধিয়া বিতরণ করি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সকলকে অর্পণ করি। কেন? না করিলে আমি পশু হইয়া যাইব। ধারা-চ্যুত হইয়া পঙ্কিল পল্বলে পরিণত হইব। বিরাট্ত্বে ব্রহ্মত্বে আমার চরম পরিণতি। আমার অনুভূতিও বিরাট্ হওয়া চাই। তাই ঐ অন্নদানের ব্যাপকতা। আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা। ইহাই নবান্ন-তত্ত্ব।

('সন্ধ্যা' থেকে পুনর্মুদ্রিত)

পরিশিষ্ট—২

গান

আছিস কোন্ উল্লাসে ?
সদাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে।
জলে গেলে জলের জোঁকে
ধরে জীবের আশে পাশে ;
এ যে এমনি নচ্ছার জোঁক
জলে-স্থলে ধরলো ঠেসে।
জোঁকের ভয়ে হলি পোকা
জন্ম নিয়ে বীর-ঔরসে ;
তোদের কাণ্ড হেরি, জগৎ জুড়ি
হো হো রবে সবাই হাসে।
অস্থিচর্ম হোলো রে সার,
রক্ত নাহি রক্তকোষে ;
এখন বাঁচতে গেলে ফেল্ সে জোঁক
বয়কট-চুণা মুখে ঘসে।
খেতে নাই ঘরে অন্ন
শুইতে খাক্কা তক্তপোষে ;
তোরা ধনে প্রাণে গেলি মারা
বিলাসের চুলকানি দোষে।
করালীর পদাবলী
উড়াইও না উপহাসে,
(দেখছ না) সোনার ভারত হচ্ছে শ্মশান
দুষ্ট জোঁকের শ্বাস-প্রশ্বাসে।

(বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে লেখা 'করালী' ছদ্ম নামে রচি ব্রহ্মবান্ধবের গান। 'করালী' নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। গানটি নলিনীরঞ্জন সরকার-সংকলি 'বন্দনা' থেকে গৃহীত।)